তালেবানের সঙ্গে আমার জীবন
লেখক: মোল্লা আব্দুল সালাম জাইফ

মোল্লা আব্দুল সালাম জাইফ

তালেবানের সঙ্গে আমার জীবন

অনুবাদকের কথা

আমি কোনো অনুবাদক নই। এই বইটি চ্যাটজিপিটি দ্বারা অনুবাদ করা হয়েছে। আমি ইংলিশ কম বুঝি, পড়তে গেলে ধৈর্য ধরে রাখতে পারিনা তাই এই কাজ করেছি। **মোল্লা আব্দুল সালাম জাইফ (হাফিঃ)** কর্তৃক লিখিত Alex Strick van Linschoten and Felix Kuehn সম্পাদিত Columbia University Press কর্তৃক ২০১০ সালে প্রকাশিত My Life With The Taliban এর ইংরেজি সংস্করণ থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। এই বইটিতে মূল বইয়ের Kandahar: Portrait of a City, Editor's Acknowledgements, Editor's Notes, Character List, Foreword by Barnett R. Rubin, Notes, Bibliography, Chronology, Glossary, Suggestions for Further Reading, About the Author and Editors, Index অংশ অনুবাদ করা হয়নি, শুধুমাত্র মোল্লা আব্দুল সালাম জাইফ (হাফিঃ) এর লিখিত অংশটুকুই অনুবাদ করা হয়েছে। সূচিপত্র এবং পৃষ্ঠা নাম্বার ইংরেজিতেই রাখা হয়েছে।
এই বই পড়লে আফগান-সোভিয়েত যুদ্ধের কিছু ইতিহাস জানতে পারবেন, তালেবানের ইতিহাস, তাদের উদ্দেশ্য, আচরণ সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানতে পারবেন আশাকরি। আফগান ইতিহাস সম্পর্কে যারা জানতে আগ্রহী তারা পড়তে পারেন।
এই বই সম্পর্কে প্রথম জানতে পারি সম্ভবত ২০১৪ বা ২০১৫ এর দিকে খিলগাঁও রেইলগেটের রাস্তায় পত্রিকা বিক্রয়কারী দোকানে বিক্রি হওয়া “সাপ্তাহিক লিখনী” পত্রিকার মাধ্যমে। সেখানে ধারাবাহিকভাবে ছাপানো হচ্ছিল অল্প অল্প করে। পরবর্তীতে সেই পত্রিকা উধাও হয়ে যায়। বাংলাবাজারের ইসলামী টাওয়ারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য প্রকাশনী এই বইটির বাংলা অনুবাদ বাজারে আনলেও কিছুদিন পর বিক্রি বন্ধ করে দেয় যার কারনে তখন কিনতে পারিনি।
এই বইয়ে কিছু শব্দের বানান ভুল আছে, ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। মূল বইয়ের কোনো লাইন বাদ দেইনি, নিজে কোনো লাইন এড করিনি। পড়তে থাকেন।

--আল্লাহ হাফেজ --

২৫ জুন, ২০২৫

This "freedom" put a proud people in chains
And turned free men into slaves
"Independence" made us weak
And slaughtered us
In the name of kindness
This is democracy by the whip
And the fear of chains
With a whirlwind at its core

Mullah Abdul Salam Zaeef

(Written in Guantánamo)*

এই "স্বাধীনতা" এক গর্বিত জাতিকে শৃঙ্খলে বাঁধলো
আর স্বাধীন মানুষকে করে তুললো দাস।
"স্বাধীনতা" আমাদের দুর্বল করলো
আর হত্যা করলো
উদারতার নামে।
এটাই সেই গণতন্ত্র, যা চাবুক দিয়ে শাসন করে।
আর শৃঙ্খলের ভয়ের রাজত্ব।
যার কেন্দ্রে এক প্রলয়কর ঘূর্ণিঝড়।

– মোল্লা আবদুস সালাম জাইফ
(লিখিত: গুয়ান্তানামো বন্দিশিবিরে*)

CONTENTS

পূর্বকথন (Preface)

কান্দাহার: আমার জন্মভূমি। আমার বাড়ির জন্য যে ভালোবাসা আমি অনুভব করি, তার জন্য কোনো শব্দই যথেষ্ট নয়; পৃথিবীর আর কোনো স্থান আমার কাছে এতটা মূল্যবান হবে না। এর পাহাড় এবং প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে আমার মন উদ্দীপ্ত হয়। কোনো সম্পদ, কোনো রাজপ্রাসাদই আমার হৃদয়ে এর স্থান নিতে পারে না। আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, যখন আমার প্রস্থানের সময় আসবে, তিনি যেন আমার আত্মাকে সেখানে নেন এবং আমি আমার বীর, ভাই ও বন্ধুদের পাশে তালেবান কবরস্থানে দাফন হই।

২০০১ সালের শেষ দিনগুলোতে, যখন আমেরিকা আহমদ শাহ বাবা এবং মিরওয়াইস খানের পবিত্র ভূমিতে আগুন ও ধ্বংস নিয়ে আক্রমণ চালায়, ঠিক তেমনই যেমন তার আগের অনেক ঔপনিবেশিক শক্তি করেছিল, আমি কান্দাহারে ফিরে আসি।

আমি যখন পৌঁছলাম, মানুষের মুখে শোক দেখা যাচ্ছিল। কেউই জানত না সামনে কী আসছে। অনেকেই ভয় পাচ্ছিলেন যে ওয়ার-লর্ডরা ফিরে আসবে; কেউ কেউ মুঠোফোনে সোভিয়েত আগ্রাসনের স্মৃতি ফিরে পাচ্ছিলেন প্রায় ত্রিশ বছর আগের কথা। আবার কেউ কেউ আমেরিকানদের কায়দা-কলায় মুগ্ধ হয়ে আনন্দ করছিলেন; তারা বুঝতে পারেনি ভবিষ্যতে তাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে।

আমেরিকান জেট বিমানগুলো শহর এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করছিল যখন আমি আমার জন্মভূমিকে বিদায় জানাচ্ছিলাম, এবং জানতাম ফিরে আসতে অনেক সময় লাগবে। শহর থেকে কালো ধোঁয়া আকাশের দিকে উঠছিল। মানুষ চলাফেরা করছিল, নিজেদের এবং তাদের সন্তানদের নিষ্ঠুর আমেরিকান বোমা থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করছিল।

ছয় বছর পেরিয়ে গেলো আমার আবার কান্দাহার দেখার জন্য। ২০০৭ সালের শেষ দিকে আমি কাবুল থেকে আরিয়ানা বিমানে এসে পৌঁছলাম। বিমান যখন অবতরণ করল, আমি দেখতে পেলাম কান্দাহার বিমানবন্দর এখন কেমন অবস্থা। বিদেশি সৈন্যদের ভিড়ে বদ্ধ থাকা এই বিমানবন্দরের চারদিকে ছিল আমেরিকান সৈন্যদের লাল মুখ, তাদের ট্যাংক এবং আর্মার্ড যানবাহন, তাদের হেলিকপ্টার ও বিমান, তাদের খাঁড়ি ও স্থাপনা। তবুও আমি চিনতে পারলাম কাদামাটির প্রাচীর দিয়ে ঘেরা সেই কারাগার, যেখানে আমেরিকানরা আমাকে বন্দি করেছিল, যেখানে তারা আমাকে অপমানিত ও নিম্নতর স্থানে নামিয়েছিল। তখন আমি তাদের দ্বারা একটি বহিষ্কৃত ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হতাম, যাঁরাও নিজেদেরই বহিষ্কৃত ছিল।

কান্দাহারের এই চিত্র আমার অনেক খারাপ স্মৃতি আবার জীবন্ত করে তুলল, আমাকে দুঃখিত, এমনকি নিরাশ করল। সেই মুহূর্তে আমি যেন অন্য কোনো দেশে ছিলাম। আফগানিস্তান আর আমার জন্মভূমি মনে হচ্ছিল না; যেন একটি আহত পাখি, আমি অপরিচিত এক ভূমিতে আছড়ে পড়েছিলাম।

আমি একদিকে ভীত ও অন্যদিকে স্তম্ভিত ছিলাম। অধিকাংশ অন্যান্য যাত্রীও ঠিক আমার মতোই মনে হচ্ছিল।

কান্দাহার বিমানবন্দর পুরোপুরি বদলে গিয়েছিল। এটা যেন যুদ্ধের সামনের সারির মতো লাগছিল। আফগানদের শুধু একটি রাস্তায় চলাচল করার অনুমতি ছিল, যা বিমানবন্দর থেকে সরাসরি স্পিন বোলদক-কান্দাহার রাস্তায় নিয়ে যায়। পাহারাদার টাওয়ারগুলোতে সন্দেহজনক আমেরিকান সৈন্যরা বসে ছিল, যারা তোমার প্রতিটি চলাফেরার উপর নজর রাখছিল।

একটি সরকারি গাড়ি আমাকে বিমানবন্দর থেকে নিয়ে গেল এবং আমরা কান্দাহারের দিকে রওনা দিলাম। আমি জানতে চেয়েছিলাম কী কী পরিবর্তন হয়েছে; আমার আমেরিকান তদন্তকারী যারা গুয়ান্তানামোতে ছিল, তারা প্রায়ই বলত যে শহর "এখন দুবাইয়ের মতো" । কিন্তু পাকা রাস্তা ছাড়া আমি কিছুই আলাদা দেখলাম না।

কান্দাহারে কিছু নতুন বিল্ডিং তৈরি হয়েছে এবং ব্যক্তিগত বিনিয়োগের লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। শহর বড় হয়েছে, তবে সরকারী প্রকল্প বা বিদেশি সাহায্যের কোনো বিশেষ প্রভাব চোখে পড়েনি। স্পিন বোলদক, আর্গানডাব, দান্দ এবং পাঞ্জওয়াইয়ের দিকে পাকা রাস্তা গেছে, যেগুলো থেকে আমি কান্দাহার থেকে সফর করেছিলাম, কিন্তু তার বাইরে অনেক কিছুই বদলায়নি। অনেকেই বিশ্বাস করত যে আমেরিকানরা কেবল নিজেদের নিরাপত্তার জন্য রাস্তা পাকা করছে, যেন দ্রুত সামনের লাইনগুলোতে পৌঁছানো যায় এবং রাস্তার পাশে পেতে থাকা বোমা থেকে বাঁচা যায়।

অনেক কান্দাহারি কষ্ট পাচ্ছিল। চাকরির অভাব এবং বেকারত্ব বড় সমস্যা, তারা অভিযোগ করত। আমেরিকানরা এখানে কেবল দাতাদের টাকা নিজেদের ব্যয় করার জন্য এসেছে, এবং যারা আফগানরা এই প্রক্রিয়ায় সাহায্য করেছে শুধু তারাই লাভ করছে। বিদেশি সাহায্য আফগানদের ধ্বংস করছে, তারা বলেছিল।

অনেকে গুল আঘা শেরজাইয়ের কথা বলত এবং তাকে তখনকার নতুন গভর্নর আসাদুল্লাহ খালেদ এবং অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে তুলনা করত। মত ছিল যে শেরজাই কান্দাহারের জন্য ভাল ছিলেন। যদিও তিনি সঙ্গীত পার্টি পছন্দ করতেন এবং অন্যান্য কিছু খারাপ অভ্যাসও ছিল, তিনি মানুষের জন্য অনেক কাজ করেছেন। অন্য রাজনীতিবিদরা যেখানে সব টাকা নিজেদের জন্য রেখেছিল, সেখানে তিনি কমপক্ষে অর্ধেক টাকা পুনর্গঠনে দিয়েছিলেন। কান্দাহারিরা তাকে চলে যেতে দেখে খুব দুঃখ করেছিল।

কান্দাহারের মানুষের জন্য নিরাপত্তাই সবচেয়ে বড় উদ্বেগ হিসেবে রয়ে গেছে। আমার স্বল্প সময়ের অবস্থানকালে অনেকেই আমাকে এই পরিস্থিতি নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে বিদেশি সৈন্যরা নিরাপত্তা আনতে ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি শহর নিজেই বেড়ে চলা অপরাধী ও চোরের কারণে সংকটময় হয়ে উঠছে। বিদেশি বাহিনী ঘর-ঘর তল্লাশি চালাতো, মানুষ রাতে ঘুমাতে পারত না।

জেলার তৃতীয় অংশে একটি কসাইয়ের বাড়িতে ঘটে যাওয়া ঘটনা কান্দাহার জুড়ে ভয় ছড়িয়ে দিয়েছিল। সবাই সেই ঘটনাটি নিয়ে কথা বলছিল, কসাইয়ের সন্তানরা যে বর্ণনা দিয়েছিল তা সবাই মনে করেছিল। তাদের কথায়, "বিদেশিরা আমাদের বাড়ির সামনের গেট উড়িয়ে দিয়েছিল, সবাই বিছানা থেকে উঠে পড়েছিল। আমার বড় দুই ভাই জেগে 'হে আল্লাহ!' বলে চিৎকার করেছিল। প্রথমে বড় ভাই বাগানে দৌড়ে গিয়েছিল দেখে কী হয়েছে। সে বুঝতেই পারেনি যে আমেরিকান সৈন্যরা ছাদের উপর এবং বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় অপেক্ষা করছিল, কাউকে

বেরোতে দেখার জন্য। আমেরিকানরা তাকে গুলিতে ভেসে দিয়েছিল; তারা তাকে কোনো প্রশ্ন করলো না বা সে কোনো অপরাধে জড়িত কিনা দেখলো না। তারা নির্মমভাবে গুলি চালিয়েছিল।"

দ্বিতীয় ভাইও গুলির শব্দ শুনে বাগানে দৌড়ে গিয়েছিল; তারও একই পরিণতি হলো। এরপর আমেরিকানরা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করল। নারীরা ও শিশুরা তখনও সেখানে ছিল। সৈন্যরা বন্যপ্রাণীর মতো আচরণ করছিল, বাড়ির জিনিসপত্র সবাইকে বাগানে ফেলে দিচ্ছিল, তালা ভেঙে দিচ্ছিল, বাক্স ভেঙে দিচ্ছিল এবং ঘরের প্রতিটি কোণা খুঁজছিল। তারা কিছুই পেল না, শুধু জামা কাপড় ও গৃহস্থালি সামগ্রী।

পুরুষেরা বাগানে শুয়ে ছিল, তাদের স্ত্রী ও শিশুরা ভয়ে কাঁপছিল। কেউ তাদের সাহায্য করতে পারত না, কারণ সেদিনের আমেরিকান সৈন্যরা অত্যন্ত নির্মম ছিল। সরকারও তাদের কাছে পৌঁছাতে পারেনি।

যখন তারা চলে গেল, আমেরিকানরা পরিবারের সদস্যদের "শোক প্রকাশ" করল। তারা বলল, "ফিরে ঘুমাও, কোনো সমস্যা নেই।" কিন্তু মাত্র কয়েক মিটার দূরে শুয়ে ছিল তাদের হত্যাকৃত পুরুষদের লাশ, নিজেদের রক্তে সাঁতার কাটছিল।

লোকেরা বিদেশি সৈন্যদের অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ করেছিল। যখন তালিবান যোদ্ধারা তাদের মধ্যে কিছু মানুষ হত্যা করত, তখন তারা সাধারণ মানুষদের উপর প্রতিশোধ নিত। আমি দেখেছি প্রতিদিন মানুষের ঘৃণা বাড়ছে।

আমি নিজেও এমন দৃশ্যের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম, যখন আমি আরেকজন কান্দাহারির সঙ্গে আরঘিস্তান যাওয়ার পথে নতুন পাকা রাস্তা দেখতে যাচ্ছিলাম। ফিরে আসার পথে, শুরানদামের কাছে হঠাৎ করে সমস্ত গাড়ি রাস্তার পাশে থামল। অন্য গাড়ির যাত্রীরা চিন্তিত দেখাচ্ছিল এবং আমার চালকও গাড়ি থামিয়ে দিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সমস্যা কী, সে হেসে বলল, "কিছুই না। এটা বিদেশি কনভয়। যখন তারা কান্দাহারে চলাফেরা করে, তখন সব গাড়ি রাস্তা ছেড়ে থামতে হয়। তোমাকে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকতে হবে, নাহলে তারা রেগে যাবে"

আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলাম তখনই আমি ট্যাঙ্কগুলোকে দেখলাম, তারা আকাশে সিগন্যাল ফ্লেয়ার ছুঁড়ছিল। চারপাশে জ্বলন্ত ধ্বংসাবশেষ পড়ছিল, গাড়িগুলোর উপর ও পাশে আঘাত হেনেছিল। তারা রাস্তার ধারে থাকা গাড়িগুলোর দিকে গুলি তাক করছিল, আর মানুষদের প্রাণি হিসেবে চিৎকার করছিল।

এটাই আমার প্রথমবার কান্দাহারে কোনো কনভয় দেখার ঘটনা। এটা খুবই অদ্ভুত এবং উদ্বেগজনক ছিল। আমি আমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, কি সবসময়ই এ রকম হয়? "আজকের দিন ভালো ছিল" , সে বলল। "এটাই আমাদের দৈনন্দিন রুটিন, আর অনেক সময় শহরের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় জীবনও হারিয়ে যায়।"

বিদেশিদের এমন আচরণ দেখে আমি খুবই কষ্ট পেলাম। তাদের এখানে আসার কোন প্রয়োজন নেই; তারা প্রতিটি মানুষ, গাধা, গাছ, পাথর ও বাড়িকে শত্রু মনে করে। তারা সবকিছু থেকে ভয় পায়, এবং তারা কিছুই করতে পারে না, শুধু রক্ত ঝরানো, মানুষ হত্যাই পারে এবং নিজেদের ও সরকারের বিরুদ্ধে আরও ঘৃণা সৃষ্টি করতে পারে।

আমি আফগানিস্তানের মানুষের, বিশেষ করে কান্দাহারের মানুষের জন্য উদ্বিগ্ন: তারা আর কত দিন ভোগাতে থাকবে? গ্রামীণ অঞ্চলে পরিস্থিতি অনেক খারাপ ছিল। হেরাত-কান্দাহার মহাসড়কে প্রতিদিন যুদ্ধ হচ্ছিল। পাঞ্চওয়াই, মাইওয়ান্ড, খাকরেজ, শাহ ওয়ালি কোট, মিয়া নিশিন, মারুফ, আরঘিস্তান, শোরাবাক, দান্দ এবং দামানের কিছু এলাকাও সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল না, শুধু জেলা কেন্দ্রগুলো ছাড়া। প্রতিদিন সংঘর্ষ, বোমা বিস্ফোরণ, ধ্বংসস্তুপ আর হত্যাকাণ্ড হচ্ছিল। অধিকাংশ শিকার সাধারণ বেসামরিক মানুষ।

স্পেরওয়ানের একজন বাসিন্দা আমাকে বলেছিল, ঈদের আগের রাতে আমেরিকান বিমানগুলো শরণার্থী একটি গ্রুপকে বোমা মেরেছিল, যারা গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছিল, তারা রেজিস্তানের দিকে যাচ্ছিল। এক ঘণ্টার মধ্যে তারা দুই শতাধিক নারী ও শিশুকে হত্যা করেছিল।

সে বলেছিল, “পরের দিন আমরা মৃতদেহ সংগ্রহ করতে গিয়েছিলাম, তখন তাদের হাত ঈদের জন্য মেহেদীতে লাল করা ছিল।” তাদের ঈদের আশা মরুভূমির বুকে তাদের লাশের সাথে ছড়িয়ে পড়েছিল।

প্রতিদিনই একই ঘটনা — আরও হত্যা এবং আরও মৃত্যু।

জনতা এবং সরকারের মধ্যকার দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছিল, প্রধানত বিদেশি সৈন্যদের নির্বিচার বোমাবর্ষণের কারণে। স্থানীয়রা গভর্নর ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে অভিযুক্ত করছিল যে তারা বিদেশিদের কাজ দেখে চোখ বন্ধ করে রেখেছে। অন্যদিকে, বিদেশিরা বেসামরিক লোকের মৃত্যুর সংখ্যা কম দেখানোর চেষ্টা করছিল।

তারা মানুষকে হত্যা করছে কারণ তাদের কাছে ভুল তথ্য পৌঁছানো হচ্ছে, আর কখনো কখনো এই বিশ্বাসঘাতক তথ্যদাতারা টাকার জন্য কাজ করছে।

তারা আমেরিকানদের কাছে মিথ্যা তথ্য দিচ্ছে, আর তারপর সেই টাকাগুলো নিজেদের ঝুলিতে ফেলে নিচ্ছে। তারা নির্মাণ প্রকল্পের জন্য তহবিল গ্রহণ করে, কিন্তু কখনো কিছুই নির্মাণ করে না। এমনকি প্রকল্পগুলোর কাজ করার জন্য লোক নিয়োগও দিতে চায় না।

কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতিতে যদিও আমি কান্দাহারে গিয়েছিলাম, তবুও তালেবানদের সঙ্গে আমার কোনো সমস্যা হয়নি, এবং আমার বন্ধুরা আমাকে দেখার জন্য খুবই আগ্রহী ছিল। কিন্তু দ্রুত বুঝতে পারলাম, বেশিরভাগ আমার আতিথেয়রা তাদের গ্রামে আমাকে থাকার সময় অস্বস্তি বোধ করছিল। তারা তাদের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল।

কেউ গ্যারান্টি দিতে পারত না যে তাদের বোমাবর্ষণ হবে না বা কোনো অভিযান চালানো হবে না; তারা সবসময় সঙ্কটের মধ্যে ছিল। কখনও কখনও এই চাপ আমার কারণে, আবার কখনও তা পরিস্থিতির স্বাভাবিকভাবেই ছিল। যখন আমি বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে জিজ্ঞাসা করতাম, তারা শুধুই বলতেন, "আল্লাহ রহমত করেন।" কিন্তু বাকি সবাই হতাশায় ভরা ছিল।

৮ দিনের সফরের পর আমি একজন তরুণ লোকের সঙ্গে কান্দাহার বিমানবন্দরে ফিরলাম, যার কাছে আইএসএএফ আইডি কার্ড ছিল, যা তাকে বিমানবন্দরে প্রবেশের অনুমতি দিত। বিমানবন্দর প্রবেশদ্বার থেকে টার্মিনাল পর্যন্ত আমি অনেক যাত্রী দেখলাম, যারা অনেক চেকপয়েন্ট পেরিয়ে হাঁটছিল। টার্মিনালে পৌঁছে কিছু

মানুষ আমার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করল। আমি আমার পাটু মাটিতে বিছিয়ে বসে পড়লাম; অনেক যাত্রী আমার চারপাশে জমা হতে লাগল। পরিস্থিতি ভীড়পূর্ণ হচ্ছিল, আর আমি জানতাম আমেরিকানরা এটা পছন্দ করবে না। অ্যারিয়ানা এবং কাম এয়ার-এর দুইটি ফ্লাইটের যাত্রীরা একত্রে ছিল। আমি তাদের সরিয়ে দিতে পারিনি, কিন্তু ভয় পাচ্ছিলাম যে আমেরিকানরা এত বড় ভিড় দেখে আতঙ্কিত হতে পারে।

কিছু মিনিট পর আমি আমেরিকানদের মাথা টার্মিনালের বাম পাশে জানালার পিছনে দেখলাম। অন্যরা ছাদের ওপর অস্ত্র নিয়ে উপস্থিত হল। দুই দিক থেকে সৈন্যরা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল। আমার চারপাশের লোকজন কী হচ্ছে দেখার জন্য মুখ ঘুরাল, আমি তাদের সবাইকে চলে যেতে বললাম। তারা ছেড়ে চলে গেল, আর আমেরিকানরা আমার দিকে এগিয়ে এলো। তারা কয়েক মিটার দূরে থেমে আলাপ করতে লাগল।

"হ্যাঁ, এই সে," এক জন বলল। "সে একজন ভালো মানুষ। হ্যাঁ, সে খুব সৎ মানুষ।" তারপর তারা চলে গেল। ছাদের সৈন্যরাও অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফ্লাইটটি দুপুর একটায় ছাড়ার কথা ছিল, কিন্তু আমরা ছয়টার মধ্যে বোর্ড করলাম। এরপর আধা ঘণ্টা অপেক্ষা করলাম বিমানটির ভিতরে। রানওয়ে আমেরিকান ট্যাঙ্ক দ্বারা ব্লক ছিল। পাইলট প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর মাইকে বিলম্বের জন্য ক্ষমা চাইল এবং শেষ পর্যন্ত আইএসএএফ আমাদের যাত্রার অনুমতি দিল।

আলহামদুলিল্লাহ, সেই আল্লাহর জন্য যাঁর কাছে ফেরেশতারা এবং পুরো সৃষ্টি ইবাদত করে। প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তাদের জীবন দিয়েছেন। প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সৃষ্টির নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তাঁর জীবন্ত সৃষ্টিজগতকে জীবন, খাদ্য এবং চেতনা দান করেছেন। প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি মানব জাতিকে তাঁর নবীদের মাধ্যমে পথপ্রদর্শন করেছেন, এবং আদেশ দিয়েছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে সম্মান করার জন্য। তাঁকে, তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহাবাদের, পরিবার ও অনুসারীদের প্রতি অগাধ সম্মান রইল আজীবন এবং কিয়ামত পর্যন্ত।

এই বিশ্বে জীবন আমাদের উপলব্ধির বাইরে অনেক বড় গুরুত্ব বহন করে, কারণ জীবনই আমাদের শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছে। জীবনই আমাদের বাঁচার শক্তি দিয়েছে। এই পৃথিবীতে অপরূপ সৌন্দর্য জীবন দিয়েছে। জীবনই সেই মাধ্যম যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর নবীদের কিতাবগুলোর মাধ্যমে মানুষকে পথ দেখিয়েছেন।

জীবন মানব জাতির জন্য আল্লাহর এক প্রাকৃতিক দান। মানুষের জীবন আল্লাহর উপহার। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত গোনা হচ্ছে এবং তা সোনার মতো মূল্যবান। জীবন এমন একটি উপহার যা কেউ অন্য কাউকে নিতে পারে না, কোনো মূল্যে নয়। আপনাদের উচিত জীবনের যত্ন নেওয়া, এটিকে সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু হিসেবে দেখা এবং সাবধানে সঠিক পথে ব্যবহার করা।

যে কোনো নেতা, রাজা, মন্ত্রী বা গভর্নরের জীবন যতটা গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি বুশ, ওবামা বা ব্লেয়ারের জীবন যতটা গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি ওসামা, জাওয়াহিরি বা মোল্লা মোহাম্মদ ওমারের জীবন ততটাই গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনি প্রতিটি নারী, শিশু এবং পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের জীবনও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

প্রত্যেক মানুষের দায়িত্ব অপর মানুষের রক্তপাত এড়ানো, শুধুমাত্র বৈধ কারণ ছাড়া। প্রত্যেক মানুষকে অন্য ব্যক্তির জীবনকে নিজের মতোই মূল্যায়ন করতে হবে। প্রত্যেককে প্রতিটি বোন, মা, বাবা, ভাই এবং প্রাণীর জীবনকে নিজের পরিবারের সদস্যদের মতো সম্মান করতে হবে। এবং সর্বশেষে, প্রতিটি মানুষের জীবনকে নিজের ভাই বা আত্মীয়ের জীবনের মতো মূল্যায়ন করা উচিত; এই আল্লাহর উপহারকে সম্মান ও সংরক্ষণ করতে হবে।

আমরা সবাইকে প্রশ্ন করা উচিত, এই জগতেও এবং পরকালে, কেন তার জীবন বা তার সন্তানের জীবন অন্য কারও জীবন থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ? কেন তিনি শুধু নিজের নিরাপত্তার জন্য সবকিছু করবেন, কিন্তু অন্য মানুষের মূল্যবান জীবন নিয়ে খেলবেন?

৯/১১ এর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আক্রমণের পর, রাষ্ট্রপতি বুশ নিজের জীবন রক্ষার জন্য আকাশে ছিলেন। তিনি মাত্র কিছুক্ষণ জন্যই জমিতে নামতেন, কোনো প্রেস কনফারেন্স বা গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টের জন্য, এবং হোয়াইট হাউসে ফ্লাক জ্যাকেট পরতেন। কিন্তু তিনি আফগানিস্তানে কতজনের জীবন নিয়ে খেলেছেন? কতজনকে হত্যা করেছেন? কতগুলো বাড়ি ও গ্রাম ধ্বংস করেছেন? এগুলো কখনোই ভুলা যাবে না!

যেমনভাবে, যখন প্রেসিডেন্ট ওবামা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করেন এবং ক্যাপিটল হিলে তাঁর স্ত্রী ও কন্যাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে অভিষেক ভাষণ দেন, তখন তিনি বুলেটপ্রুফ কাচের পেছনে ছিলেন। কিন্তু এখন, আগ্রাসীদের তীব্র আক্রমণের সময়, তিনি বহু আফগানদের জীবন নেবেন। প্রেসিডেন্ট ওবামা! আপনার জানা উচিত, আমাদের শিশুদের জীবন আপনার কন্যাদের জীবনের মতোই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

আপনার জীবন আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, এবং সেই দুর্বৃত্ত বুশের জীবন তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যই আমি এই স্মৃতিকথা লিখেছি, যাতে মানুষ বুঝতে পারে অন্যদের জীবনও গুরুত্বপূর্ণ।

এই বই লেখার মাধ্যমে আমি চারটি প্রধান বিষয় তুলে ধরতে চাই:

১. প্রত্যেকের দায়িত্ব হলো বুঝতে পারা যে তার জীবন কোনো রাজা কিংবা গরিব, ছোট কিংবা বড়, পুরুষ বা নারী, কালো বা সাদা যেকোনো মানুষের জীবনের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়।

২. যে কেউ নিজেকে, তার এলাকা ও সম্মান রক্ষা করার অধিকার ভেবে, তাকে জানতে হবে পৃথিবীর অন্য স্থানেও মানুষের জীবন, তাদের এলাকা ও সম্মানের রক্ষা করার অধিকার রয়েছে।

৩. যারা আফগানদের প্রকৃত সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত নয়, তারা তাদের সম্পর্কে আরও জ্ঞান ও বোঝাপড়া বাড়ালে ভালো হবে।

৪. বিশ্বকে বুঝতে হবে আফগানদের অবস্থা কতটা ভয়াবহ এবং তারা কতটা দমিত। মানুষের উচিত তাদের প্রতি দয়ালু ও সহানুভূতিশীল হওয়া।

আমি আফগান সমাজেরই একজন অংশ, এবং এর সাম্প্রতিক ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বের স্বাক্ষী। আমি এই সমাজকে চিনি। আমি প্রতিটি দশক থেকে, প্রতিটি মানুষের সঙ্গে কথা বলে ইতিবাচক ও নেতিবাচক অনেক স্মৃতি পেয়েছি। আমার জীবন ছিল সমৃদ্ধ, এবং আশা করি অন্যরাও আমার অভিজ্ঞতা থেকে কিছু শিখতে পারবে।

আল্লাহ কবুল করুন, এই বই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপকারে আসুক।

****মোল্লাহ আব্দুল সালাম জাইফ**** — **কাবুল, মার্চ ২০০৯**

DEATH AT HOME

আমি ১৯৬৮ সালে ছোট্ট জংগিয়াবাদ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করি। তখনো জহির শাহ, যিনি ১৯৩৩ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত শাসন করেছিলেন, পাস্খতু শাসক হিসেবে রাজ্যাভিষেকে ছিলেন এবং দেশ শান্তিপূর্ণ ছিল। তাঁর শাসনামলে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় করত এবং বিদেশী পর্যটকরা দেশজুড়ে ঘুরে বেড়াত। ভাগ্য বিচার স্থগিত রেখেছিল: সরকার শক্তিশালী ছিল এবং মানুষ সন্তুষ্ট ছিল।

আমার পরিবার মূলত কন্দাহার থেকে নয়। জন্মের কয়েক বছর আগে আমরা কন্দাহারের পশ্চিমাঞ্চল পাঞ্জওয়াইয়ে এসেছি। আমাদের নিজ গ্রাম জালদাকে (কন্দাহার ও কাবুলের মাঝামাঝি) ভূমি নিয়ে গোষ্ঠী সংঘর্ষ ছড়িয়েছিল, এবং সংঘর্ষে অনেকেই নিহত হয়েছিল। আমার এক চাচা, মোল্লা নিজাম, ষোলোজন হত্যা করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। সরকার তাঁকে ধরতে জালদাক এলাকায় সৈন্য পাঠায়, এবং তিনি গোপনে লুকিয়ে পড়েন।

রক্তপাত হলে পাস্খতু গোষ্ঠী সম্মানের কোড অনুযায়ী প্রতিশোধ নেওয়া হয়। আমার পরিবার ভয় পেয়েছিল; সরকার মোল্লা নিজামকে খুঁজছিল এবং গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে লড়াই চলতে থাকার সম্ভাবনা ছিল। আমার পিতার সঙ্গে তাঁর দুই ভাই এবং পরিবারের বাকি সদস্যরা সিদ্ধান্ত নিলেন আমাদের জন্মভূমি জালদাক থেকে চলে যেতে, যাতে আরও রক্তপাত এড়ানো যায়। এভাবেই আমার পরিবার জংগিয়াবাদ গ্রামে এসে বসবাস করতে শুরু করে, যেখানে আমি জন্মগ্রহণ করি।

মোল্লা নিজামের জন্য জন্য জালদাকের ঘটনাগুলো প্রাণঘাতী প্রমাণিত হয় যখন ১৯৬২ সালে সরকারী বাহিনী তাকে ধরে ফেলে। তিনি ঝেরাই মরুভূমির একটি ছোট গ্রামে লুকিয়ে ছিলেন, যাঁরা সংঘর্ষে জড়িত ছিলেন তাদের সঙ্গে। সরকারী বাহিনী রাতে তাঁদের ওপর আক্রমণ করে। কিছুজন পালিয়ে যায়, কিন্তু মোল্লা নিজাম তিন-চারজনের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিহত হন।

গোষ্ঠীগত সংঘর্ষ ও প্রতিশোধ, বড় হোক বা ছোট, বহু আফগানের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। প্রতিটি পশতুনই একটি গোত্রের সদস্য, এবং আমার চাচা ও পিতার মতো আমিও ঘিলজাই গোত্রে জন্মগ্রহণ করেছি। পশতুনদের বসবাসের অঞ্চলটি উত্তর-পূর্ব কাবুল থেকে দক্ষিণে এবং পূর্বদিকে পাকিস্তানের ভেতরে পর্যন্ত বিস্তৃত। একজন আফগান হিসেবে, আপনি কখনো একমাত্র একটি পরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নন–আপনার আত্মীয়, গোত্র, জাতিগোষ্ঠী ও জন্মস্থান–সবকিছুই আপনার পরিচয়ের অংশ। বহু পশতুন বহু বছর আগে আফগানিস্তান, পাকিস্তান বা বিদেশের বড় শহরে চলে গেলেও তাদের প্রকৃত পরিচয় রয়ে গেছে তাদের গোত্র, পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে। একজন বিদেশি হিসেবে আপনি কখনোই পুরোপুরি বুঝতে পারবেন না আফগান হওয়ার অর্থ কী।

আমার মা ও বাবা একই পরিবারের সদস্য ছিলেন, যেমনটি দক্ষিণ আফগানিস্তানের গ্রামীণ অঞ্চলে প্রথাগত। তিনি আমার বাবার সঙ্গে চারটি সন্তান জন্ম দেন–দুই মেয়ে ও দুই ছেলে। আমি ছিলাম দ্বিতীয় ছেলে এবং মায়ের তৃতীয় সন্তান। অন্যান্য অনেকের মতো আমিও আমার শৈশবকাল তেমন স্মরণ করতে পারি না। আমরা জংগিয়াবাদে কিছুদিন ছিলাম, কিন্তু কতদিন ছিলাম তা আমি নিশ্চিত নই।

আমার মা খুব বেশি বয়সে মারা যাননি, কিন্তু কী কারণে মারা যান তা আমি জানি না। তাঁর মৃত্যুর সময় আমি খুব ছোট ছিলাম—হয়তো এক বা দুই বছর বয়স—তাই তাঁর কোনো স্মৃতি নেই আমার। আমার বড় বোন পরে আমাকে তাঁর ও তাঁর মৃত্যুর কথা বলেছে। তবে এই সময় থেকে আমার মনে থাকা একটি স্মৃতি আছে—আমার পিতাকে নিয়ে। তিনি আমাদের কাছে এসে কোলে তুলে নিয়ে নিঃশব্দে কেঁদেছিলেন। যদিও এটা অসম্ভব মনে হতে পারে, আমি এখনো বিশ্বাস করি, এটা ঘটেছিল যেদিন আমার মা মারা যান।

আমার পিতা ছিলেন একজন সহানুভূতিশীল মানুষ। তিনি আমাদের কখনো মারতেন না বা চিৎকার করতেন না। তিনি একজন ধর্মীয় পণ্ডিত ছিলেন যিনি তাঁর জীবন ইসলামী শিক্ষায় উৎসর্গ করেছিলেন, এবং দানশীলতা ও সদয়তার জন্য তিনি পরিচিত ছিলেন। আমার দাদা অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন যাতে আমার বাবা ভালো ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়তে পারেন, ইসলাম জানতে পারেন এবং একজন প্রকৃত আলেম ও আল্লাহভক্ত মানুষ হতে পারেন। আমার পিতাও আমাদের জন্য একই চেষ্টাই করেছিলেন। যদিও আমার মায়ের মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়ে খুব বেশি আলোচনা হতো না, তবুও আমি জানি তিনি শিক্ষিত একজন নারী ছিলেন। তিনি এমন এক পরিবারে বড় হয়েছিলেন যারা তাদের সব সন্তানকে কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা দেওয়ার গুরুত্ব দিতেন এবং চেয়েছিলেন তারা তা শিখুক। আমাদের দুজন অভিভাবকই শিক্ষাকে অত্যন্ত মূল্য দিতেন এবং আমাদের যতটা সম্ভব সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করতেন।

আমাদের মা মারা যাওয়ার পর আমরা প্রথমে আমার আরেক চাচা, মুসা জানের সঙ্গে থাকতে শুরু করি। তাঁর স্ত্রী আমাদের দেখাশোনা করতেন। আমার পিতা তখন একটি স্থানীয় মাদরাসায় শিক্ষকতা করতেন এবং খুব ব্যস্ত থাকতেন, তাই তাঁকে আমরা তেমন দেখতে পেতাম না। যদিও তখন ইতিহাসের অবিন্যস্ত সুতো ধীরে ধীরে খুলে আসছিল, আমাদের চাচার বাড়িতে জীবন ভালোই কাটছিল।

আমার পিতা, আমার বোনেরা আর আমি, জাঙ্গিয়াবাদ এবং আমার চাচার বাড়ি ছেড়ে অন্য একটি গ্রামে—মুশান-এ চলে যাই, তখন আমার বয়স ছিল দুই বছর। আমার ভাই রহমতুল্লাহ, যিনি আমার চেয়ে কয়েক বছর বড় ছিলেন, এর আগেই পড়াশোনার জন্য পেশমল চলে গিয়েছিলেন।

আমার পিতা ওই গ্রামে একটি মসজিদের ইমাম হয়েছিলেন এবং দিনরাত পড়ানো ও অধ্যয়নে ব্যস্ত থাকতেন। গ্রামের মহিলারা আমাদের ভালোভাবে দেখাশোনা করতেন, কিন্তু রাতে আমরা প্রায়ই নিঃসঙ্গতা ও ভয়ে কুঁকড়ে থাকতাম আমাদের কাঁচা মাটির ঘরে, যার ছিল ছোট্ট একটি উঠোন। গ্রামের চারপাশে বাগান ও ক্ষেতের ভেতর দিয়ে নেকড়ে বাঘগুলো রাতভর হুঙ্কার দিত। সেখানে বিদ্যুৎ ছিল না, ছিল না কোনো পানির ব্যবস্থাও। অন্ধকার খুব দ্রুত নেমে আসত আর জমিকে ঢেকে ফেলত এক অদৃশ্য কালো পর্দার মতো। কুকুরের পালগুলো ঘরের বাইরের অন্ধকার গলিগুলোতে ঘুরে বেড়াত—বাঁচার জন্য খাবারের খোঁজে ঘেউ ঘেউ করত আর একে অপরের সঙ্গে লড়াই করত।

একবার, গভীর রাতে, যখন আমার পিতা এখনো মসজিদ থেকে ফিরে আসেননি, আমি আমার বোনের সঙ্গে উঠোনে কুঁকড়ে বসেছিলাম। সন্ধ্যা থেকেই নেকড়েরা গ্রামের কাছাকাছি হুঙ্কার দিচ্ছিল, আর এখন রাত হয়ে গেছে। প্রতি বার তাদের ডাক শুনলেই মনে হতো তারা আগের চেয়ে আরও কাছাকাছি চলে এসেছে। আমরা আতঙ্কে চিৎকার করে উঠতাম, প্রতিটি শব্দেই কেঁপে উঠতাম। একে অপরকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছিলাম,

আর অন্ধকারে কান পেতে থাকতাম। মনে হতো, নেকড়েগুলো যেন আমাদের বাড়ির ফটকের গা ঘেঁষে ঘুরছে, এক কোণা থেকে আরেক কোণায় ঘুরে বেড়াচ্ছে মাটির দেয়াল ঘেঁষে। আমরা দিশেহারা হয়ে চিৎকার করছিলাম, এমন সময় এক প্রতিবেশী মহিলা ছুটে এসে উঠোনে ঢুকে পড়েন। তিনি আমাদের ঘরের ভেতরে নিয়ে যান, আর আমরা তাঁর গায়ে জড়িয়ে বসে পড়ি। তিনি আমাদের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করছিলেন এবং রাজার, রাজপুত্রের ও রাজকন্যার গল্প শোনাতে লাগলেন। আমি এখনো সেই রাতের একটি গল্প মনে রাখতে পেরেছি। তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন যতক্ষণ না আমার পিতা বাড়িতে ফিরে আসেন।

আমার ছোট বোন মুশানে মারা যায়, যদিও সে কী কারণে মারা গিয়েছিল, আমি নিশ্চিত নই। ১৯৭১ ও ১৯৭২ সালে খরার পর গ্রামগুলোতে বহু মৃত্যু ঘটেছিল, এবং কিছু পরিবার তাদের পুরো ফসল হারিয়েছিল। দুর্ভিক্ষটি ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ আফগানিস্তানের মধ্য ও উত্তরাঞ্চলে, যেখানে হাজার হাজার মানুষ অনাহারে মারা গিয়েছিল এবং আরও অনেকেই খাদ্য ও পানির সন্ধানে তাদের গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

আমার পিতা তাঁর স্ত্রী ও কন্যার মৃত্যুতে গভীরভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। আমরা রংরেজানে চলে যাই, যেখানে তিনি একটি ছোট মসজিদের ইমাম হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

******

রংরেজান ছিল—এবং এখনও আছে—একটি ছোট গ্রাম, মুশানের চেয়েও ছোট। সেখানে পাকা রাস্তা ছিল না, ছিল না পানির সরবরাহ বা বিদ্যুৎ, এমনকি কোনো জেনারেটরও না। কয়েকটি কাঁচা মাটির প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ঘর পাশাপাশি গুচ্ছবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল—এই ছিল রংরেজান।

গ্রামটির আশপাশের শুষ্ক জমি এবং বাগানগুলো সেচ দেওয়া হতো ছোট ছোট নদী ও ঝরনার পানি দিয়ে, যেগুলো উত্তর ও পূর্ব দিকের পাহাড় থেকে নেমে আসত। ডালিম ও আঙুর ছিল এখানকার প্রধান ফসল। শত শত বছর আগে মধ্যযুগীয় আরব ইতিহাসকারেরা এগুলোর গুণগান করেছিলেন, পৃথিবীর সেরা বলে।

আমরা সেখানে চলে যাই জহির শাহর শাসনের শেষ দিকে, কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় আসার আগে এবং আফগানিস্তান এক বিশাল যন্ত্রণার স্রোতে ডুবে যেতে থাকে—যা সেচের খাল ও জলাধার ধ্বংস করে দেয়, মাঠ ও বাগানগুলোকে শুকিয়ে ফেলে।

যদিও আমার বাবা একজন শিক্ষিত মানুষ এবং ইসলামের পণ্ডিত ছিলেন, তবুও আমাদের পরিবার অন্য যেকোনো গ্রামীণ পরিবারের মতোই ছিল। আমার নিজের অবস্থাও ছিল অন্য যেকোনো ছেলের মতোই। জীবন ছিল কঠিন; আমরা দরিদ্র ছিলাম এবং আমার বাবা খাবার জোগাড় করতে হিমশিম খেতেন। একজন স্থানীয় ইমাম হিসেবে, জনগণের ধর্মীয় শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা দেওয়াই ছিল তাঁর প্রধান দায়িত্ব। তিনি দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে পড়াতেন, ফজরের নামাজ পড়াতে ভোরেই বেরিয়ে যেতেন।

প্রায় প্রতিদিন সকালে তিনি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসতেন। সকালের নাশতা একসাথে খাওয়ার পর, আমি ও আমার বোন তাকে সঙ্গে করে মসজিদে যেতাম, বাকি সকালটা লেখাপড়ায় কাটানোর জন্য। প্রতিটি আফগান শিশুর মতো আমরাও আল কায়েদা পাঠ্যবই দিয়ে পড়াশোনা শুরু করেছিলাম, যাতে লেখা পড়া শেখানো হতো।

দুপুরে আমরা বাড়ি ফিরে দুপুরের খাবার খেতাম। বাবা তখন কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতেন, তারপর আবার সবাই মসজিদে ফিরে যেতাম। তখন বাবা অনেক বয়স্ক হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু এখনও আশায় থাকতেন আবার বিয়ে করবেন এবং আমাদের জন্য নতুন মা আনবেন। তিনি বলতেন, "অপেক্ষা করো! খুব শিগগিরই তোমাদের নতুন মা হবে আর আমার নতুন স্ত্রী। হয়তো নতুন ভাইবোনও আসবে।" কিন্তু তিনি আর কখনও বিয়ে করেননি।

বিকেলে আমরা লেখাপড়া চালিয়ে যেতাম। যখন বাবা নিজে পড়াতে পারতেন না, তখন তাঁর কোনো একজন ছাত্র আমাদের সাহায্য করত। ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় শিক্ষায় প্রথমে মৌলিক পড়া ও লেখা শেখানো হতো, এরপর ধাপে ধাপে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বাক্য ও পাঠ মুখস্থ করতে হতো। তখন আমি পশতু বর্ণমালা ও কিছু প্রাথমিক অঙ্ক শিখছিলাম পাঠ্যবই থেকে।

মুশানে শীতকাল ছিল হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা। আমাদের উপযুক্ত শীতের পোশাক ছিল না, এমনকি অনেক সময় যথেষ্ট জ্বালানি কাঠও জোটাতে পারতাম না, সেই ছোট ঘরটি গরম রাখতে যা আমরা সবাই শীতকালে ভাগাভাগি করে থাকতাম। একবার ঠাণ্ডায় আমি আগুনের খুব কাছাকাছি বসে ছিলাম, এবং আমার আল কায়েদা পাঠ্যবইটি আগুনে পড়ে গিয়ে পুড়ে যায়। আমি অসহায়ভাবে বসে বসে দেখি কীভাবে পৃষ্ঠাগুলো পুড়ে পুড়ে কুঁচকে যায়, ধূসর আর কালো হয়ে যায় প্রান্তগুলো।

আমার বাবা ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ ইমাম, এবং দূরদূরান্তের গ্রাম থেকেও লোকজন তাঁর কাছে সাহায্য ও দিকনির্দেশনার জন্য আসত। তিনি প্রায়ই অসুস্থ কিংবা জিনে ধরা লোকদের বাসায় নিয়ে আসতেন এবং তাদের জন্য দোয়া-দরুদ পড়তেন, কুরআনের সূরা পাঠ করতেন অথবা তাবিজ লিখে দিতেন। এমন অনেক সময় হয়েছে যখন বিশ্বাস সেখানে কাজ করেছে, যেখানে ওষুধও ব্যর্থ।

তিনি খুব অল্প রোজগার করতেন, কিন্তু আমাদের কাছে যা কিছুই থাকত, তিনি কখনোই লোকজনের কাছ থেকে টাকা নিতেন না, এমনকি জাকাত-ও না। তারপরও লোকেরা গোপনে তাঁর কোমরের জামার পকেটে টাকা ঢুকিয়ে দিত বা বালিশের নিচে, কম্বলের ভাঁজে কিংবা খালি খাবারের পাত্রে রেখে যেত। প্রতিদিন রাতে তিনি যখন বাসায় ফিরতেন, অথবা কোনো মেহমান চলে যেতেন, আমরা ছুটে যেতাম তাঁর পকেট ঘাঁটতে, প্রতিটি বালিশ উল্টাতাম, প্রতিটি গদি নিচে তাকাতাম। বেশিরভাগ সময় কিছু রুপি পেতাম, আর আমরা দৌড়ে বাবার চারপাশে ঘুরতে থাকতাম, টাকাগুলো মাথার ওপর তুলে ধরে আনন্দে চিৎকার করতাম।

কখনো কখনো আমাদের কোনো চাচা তাদের সন্তানদের নিয়ে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসতেন। আমার অনেক কাজিন ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে মোহাম্মদ আসলাম ও আবদুল বারী-কে আমি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতাম। আমরা সবাই সমবয়সী ছিলাম এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা একসাথে খেলতাম—কখনো উঠোনে, কখনো বা বাড়ির সামনের ছোট নালার পাশে রাস্তায়।

আমরা আমাদের বাহিনীকে নিয়ে যুদ্ধে নামতাম, শত্রুদের পরাজিত করে নিজেদের রাজ্য রক্ষা করতাম। মন্ত্রী আর রাজাদের মতো আমাদের রাজত্ব চালাতাম—মাঝে মাঝে পথচারীদের কাছ থেকে কর আদায় করতাম, আবার কখনো শান্তি চুক্তি বা লেনদেনের জন্য দরকষাকষি করতাম। আমি মনে করি, পৃথিবীর সব শিশু-ই এমন রকম খেলা খেলে।

এখন, প্রায় চল্লিশ বছর পর ফিরে তাকিয়ে, যখন সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে, আমার মনে একধরনের বিষণ্ণ হাসি চলে আসে। কখনো ভাবিনি–মুশানের ডাস্টি গলিতে, ডালিম গাছের ছায়ায়, আমরা যে খেলা খেলতাম, সেই যুদ্ধ-সাজা একদিন সত্যি হয়ে উঠবে। সেই কাল্পনিক যুদ্ধ এক সময় বাস্তবে আমাদের উপর নেমে আসবে এবং আমাদের দেশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবে।

যতটা খুশি হতাম কোনো চাচা আমাদের বাড়িতে এলে, ততটাই কষ্ট পেতাম যখন তাদের চলে যেতে হতো। আমরা তাদের কাছে অনুরোধ করতাম থেকে যাওয়ার জন্য, আর বাবার কাছে কাকুতি-মিনতি করতাম যেন আমাদের তাদের সঙ্গে যেতে দেন। আমরা মাটিতে পা ঠুকতাম, দরজায় লাথি মারতাম, কাঁদতাম ও চিৎকার করতাম। অবশ্য এসব কোনো কাজেই আসত না।

*****

১৯৭৫ সালের গ্রীষ্মকালে, আমার বাবা রংরেজানে ইন্তেকাল করেন। সেদিন রাতে তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠেছিলেন, যেমনটা তিনি সাধারণত করতেন, তার চেয়েও অনেক আগে। পরে, যখন রাতের নামাজের সময় হলো, আমি জেগে উঠলাম এবং চুপচাপ শুয়ে রইলাম, চাঁদের আলোয় আলোকিত অন্ধকারে বাবার কণ্ঠ শুনছিলাম। আমি তার ফিসফিস করে বলা সব কথা পরিষ্কার বুঝতে পারিনি, কিন্তু দেখতে পেলাম–তার চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

তিনি আমাদের জন্য দোয়া করছিলেন–আমাদের নিরাপত্তা, ভবিষ্যৎ এবং সুস্থতার জন্য। এর আগে কখনো তাকে এমন করে দোয়া করতে শুনিনি, তবে তখনও বিষয়টি নিয়ে আমি খুব একটা চিন্তা করিনি। তিনি খুব সকালে ঘর ছেড়ে মসজিদে চলে গেলেন ইশরাক নামাজ পড়ার জন্য।

যখন ফিরে এলেন, তাকে অসুস্থ দেখাচ্ছিল। তার চোখে জল ছিল, আমাদের দিকে তাকিয়ে যেন কষ্ট চেপে রেখেছিলেন, কিন্তু কিছুই বললেন না। শুধু মুখ ফিরিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন। আমি ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিলাম। এক ঘণ্টা পর তিনি আমার বোনকে ডাকলেন। বললেন, প্রতিবেশীদের ডেকে আনতে। আমরা কেউই বুঝতে পারিনি, আসলে কী ঘটছে।

আমি তাকিয়ে দেখছিলাম–আমার বাবা বিছানায় শুয়ে আছেন, তার মুখ অশ্রুসিক্ত, আর যন্ত্রণায় কুঁচকে গেছে। কিছুক্ষণ পর প্রতিবেশীরা এলেন–এক বৃদ্ধা আর একজন পুরুষ। আমরা তাদের ভালো করেই চিনতাম, প্রায়ই তাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলতাম।

পুরুষ প্রতিবেশীটি সোজা গিয়ে বাবার কব্জির নাড়ি দেখলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তিলাওয়াত শুরু করলেন–সূরা ইয়াসিন শরীফ-

“আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্যান্যদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করব? করুণাময় যদি আমাকে কষ্টে নিপতিত করতে চান, তবে তাদের সুপারিশ আমার কোনই কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে রক্ষাও করতে পারবে না। [সূরা ইয়াসীন: 23]”

তারপর তিনি আমাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, "তোমরা এখন ঘর থেকে বের হয়ে যাও।" কিছুক্ষণ পর বৃদ্ধা বেরিয়ে এলেন বাবার ঘর থেকে। তার মুখ ছিল ফ্যাকাশে। আমাদের কাছে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে তিনি হঠাৎ করেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন, চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ করেই জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন।

আমরা হতভম্ব হয়ে পড়লাম। দৌঁড়ে গেলাম বাবার ঘরে, তাকে বলতে:

"আব্বা! আব্বা! তাড়াতাড়ি আসুন, খালা কি হয়ে গেছে দেখুন!"

কিন্তু বাবা কোনো উত্তর দিলেন না।

তখন আমরা লক্ষ্য করলাম–পাশের লোকটি বাবার মুখ বাঁধছেন। তার চিবুক থেকে মাথা পর্যন্ত একটি সাদা কাপড় জড়ানো ছিল, যেমনটা মৃতদেহের ক্ষেত্রে রেওয়াজ। আমরা আবার চিৎকার করে উঠলাম:

"আব্বা! আব্বা!"

কিন্তু এখন আর কিছুই ছিল না–শুধু বাবার নিথর দেহ বিছানায় পড়ে ছিল। কিছুক্ষণ আগেই তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন।

লোকটি আমাদের ঘর থেকে বের করে দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু আমরা কান্নায় ভেঙে পড়লাম, ধুলায় গড়াগড়ি খেতে থাকলাম। একপর্যায়ে তিনিও কাঁদতে লাগলেন।

আমাদের পাশে সান্ত্বনা দেবার মতো কেউ ছিল না। না কোনো চাচা, না ফুফু, এমনকি বড় ভাইও না। আমরা একেবারে একা ছিলাম।

আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন। আমি তখন সাত বছরের শিশু।

শীঘ্রই ঘরটি ভরে উঠল–পুরুষ, মহিলা, প্রতিবেশী, দূর দূরান্তের লোকজন।

এক মহিলা আমাদের নিয়ে গেলেন তার নিজ ঘরে, দূরে এক কোণে। তিনি কোমলভাবে কথা বললেন, আমাদের প্রতি দয়া দেখালেন।

তিনি বললেন:

"তোমাদের বাবা বেঁচে আছেন। তিনি শুধু একটু অসুস্থ। শিগগিরই ঠিক হয়ে যাবেন।"

তিনি আমাদের কাঁদতে নিষেধ করলেন, ধৈর্য ধরতে বললেন।

তার কাপড়ের ভাঁজ থেকে কিছু মিষ্টি বের করে এনে আমাদের মন ভালো করার চেষ্টা করলেন।

আমার ভাই তখন মুশানে ছিলেন, আর কিছু চাচাতো ভাই ছিল পাশমল আর চারশাখায়। আমাদের মামা ছিলেন জাঙ্গিয়াবাদে। আজও জানি না তারা কীভাবে বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিল, কিন্তু দুপুরের নামাজের আগেই তারা সবাই রংরেজানে এসে পৌঁছেছিলেন।

আমরা তখন ঘরে ফিরে এসেছি, এক কোণে বসে আছি–ঘরটি তখন আত্মীয়স্বজন, পরিচিতজনদের ভিড়ে পরিপূর্ণ।

আমার ভাই, চাচাতো ভাই আর চাচারা একেক সময়ে আমাদের কাছে এসে কিছু টাকা বা মিষ্টি দিচ্ছেন, যেন আমরা দুঃখ ভুলে যাই।

বিকেলে আমাদের এক চাচাতো ভাই আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন তার বাড়িতে–চারশাখায়।
সেই সকালটাই ছিল আমার বাবাকে শেষবারের মতো দেখা।
তার দাফন হয়েছে নদীর ধারে কবরস্থানে–সেখানে আমাদের আরও কিছু আত্মীয়ও সমাধিস্থ আছেন।
দাফন অনুষ্ঠান হয়েছিল আমাদের চাচাতো ভাইয়ের বাড়িতে। কিছুদিন পর সবাই যার যার বাড়িতে ফিরে গেল। আমার ভাই আবার পড়াশোনায় ফিরে গেলেন। আর আমি আর আমার বোন, চারশাখায় আমাদের চাচাতো ভাইয়ের বাড়িতে একা রয়ে গেলাম।
আমরা সেখানে এক বছর ছয় মাস ছিলাম। সকালে আমি মসজিদে পড়তে যেতাম, আর বিকেলে ঘরের কাজে সাহায্য করতাম। ছাগল, ভেড়া আর গরুর দেখাশোনা করতাম–গোয়ালঘর পরিষ্কার করতাম, তাদের খাওয়াতাম। ঘরটা ছোট হলেও আমাদের সবার থাকার মতো জায়গা ছিল। আমি আমার চাচির সঙ্গে এক ঘরে ঘুমাতাম, আর আমার চাচাতো ভাইরা অন্য ঘরে থাকত।

আমার বাবা আমার বোনকে খুব অল্প বয়সে আমাদের এক আত্মীয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তার মৃত্যুর পর, পাত্রপক্ষ ভাবল বিয়েটা আগেই দেওয়াই ভালো–যাতে আমার বোন স্বামীর ঘরে গিয়ে ওঠে এবং নতুন পরিবারে জায়গা পায়। পাত্রের বাড়িতে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান হলো।

সেই দিন আমি খুব কষ্ট পেয়েছিলাম আর অনেক কেঁদেছিলাম। আমার বোনই ছিল একমাত্র ব্যক্তি, যিনি আমাকে সত্যিকারের ভালোবাসতেন, যার সঙ্গে আমি বড় হয়েছিলাম।

বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হলে আমরা আবার চাচাতো ভাইয়ের বাড়িতে ফিরে এলাম। আমি নিজেকে খুব একা মনে করছিলাম। বুঝতে পারছিলাম না আমার কী হবে। আমি খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিলাম, পড়াশোনা ছেড়ে দিলাম। সবকিছুই যেন অর্থহীন হয়ে পড়েছিল। আমি জানতাম না কী করব, বা সামনে কী আসছে।

প্রতিবার আমার বড় ভাই রহমতুল্লাহ দেখা করতে আসত, আমি তাকে অনুরোধ করতাম যেন সে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। কিন্তু প্রতিবারই সে না করে দিত। সে তখনও পড়াশোনা করছিল এবং আত্মীয়স্বজনের কাছে থাকত। তখন আমি তাকে বুঝতে পারিনি।

কিছুদিন পর আমার চাচাতো ভাই আমাকে আমার মামার কাছে রেখে এলেন যেন আমি পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারি। কতদিন সেখানে ছিলাম মনে নেই। কিন্তু আমার মামা ছিলেন অত্যন্ত রূঢ় একজন মানুষ। প্রায়ই আমাকে মারতেন বা পিঠে লাঠি চালাতেন। তবে তার স্ত্রী ছিলেন কোমল মনের মানুষ, তিনি আমার যত্ন নিতেন।

আমি সাঙ্গিসার নামে একটি গ্রামে একটি স্থানীয় মাদ্রাসায় পড়াশোনা করছিলাম এবং মোল্লা নিয়ামতুল্লাহর ক্লাসে ভর্তি ছিলাম। তিনি ছিলেন আমার বাবার প্রাক্তন একজন শাগরেদ–মুশানেই তিনি আমার বাবার কাছেই শিক্ষা নিয়েছিলেন এবং আমার প্রতি তার বিশেষ স্নেহ ছিল।

মাদ্রাসার প্রধান ধর্মীয় শিক্ষক ছিলেন মৌলভি নিয়াজ মোহাম্মদ। তিনিও আমার বাবাকে চিনতেন এবং আমার জন্য কাপড় এবং প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক কিনে দিতেন যাতে আমি পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারি।

মৌলভি নিয়াজ মোহাম্মদ ছিলেন প্রাদেশিক পর্যায়ের একজন সুপরিচিত সমর্থক নূর মোহাম্মদ তারাকির, যিনি কমিউনিস্ট খালক (Khalq) গোষ্ঠীর একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। ১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে আফগান পিপল'স ডেমোক্রেটিক পার্টি ভেঙে গিয়ে খালক গোষ্ঠী গঠিত হয়।

১৯৭৮ সালের বসন্তে যখন তারাকি ক্ষমতায় এলেন, নিয়াজ মোহাম্মদ তার অবস্থান বদলে কমিউনিস্টদের প্রকাশ্য সমর্থক হয়ে উঠলেন। তিনি এমনকি বলতেন, তারাকি হচ্ছেন ইমাম মাহদীর একজন দূত ও সহযোগী।

তিনি এসব বলা শুরু করার পরপরই তার সব ছাত্র মাদ্রাসা ছেড়ে চলে যায়। কেউ কেউ পাকিস্তানে চলে যায়, আবার অনেকে অন্য কোনো মৌলভির কাছে পড়াশোনায় চলে যায়।

আমার আত্মীয়রা মনে করলেন, আমার ধর্মীয় পড়ালেখার পাশাপাশি আমাকে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা দেওয়াও প্রয়োজন। তাই আমি কান্দাহার শহরে স্কুলে ভর্তি হলাম।

আমি চতুর্থ শ্রেণির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি এবং কান্দাহারে প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হয়েছি, এক বছর সেখানে ক্লাসে অংশগ্রহণ করলাম। তখন শহরটা প্রাণবন্ত ছিল–আলু ভাণ্ডার ভরা, প্রদেশ জুড়ে পানি ছিল প্রচুর, আর আমার মনে আছে মানুষগুলো ভলিবল খেলতে ভালোবাসত (কান্দাহারে আমরা ফুটবল খেলতে শুরু করেছিলাম অনেক পরে)।

একদিন আমি সাঙ্গিসারে গিয়ে মৌলভি নিয়াজ মোহাম্মদকে দেখতে গেলাম। মৌলভি সাহেব বদলে গিয়েছিলেন। তারাকি প্রতি তার সমর্থন আরও দৃঢ় হয়েছিল। আমরা বসে চা খাচ্ছিলাম, তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন:

"পুত্র! তুমি কি ফরম পূরণ করেছ?"

ক্যু-এর পর, তারাকি দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন এবং ভূমি সংস্কারের জন্য একটি আইন প্রণয়ন করেছিলেন, যা ছিল তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। তিনি চান ভূমি মানুষের মাঝে পুনর্বন্টন করা হোক। প্রত্যেকে আবেদন করতে পারবে এবং একজন প্রতি সর্বোচ্চ দশ জেরিব জমি পাবে। মোল্লা নিয়ামতুল্লাহ কান্দাহারে আমাদের এ সম্পর্কে বলেছিলেন। তিনি আমাদের সতর্ক করেছিলেন–এটা ইসলাম বিরুদ্ধ, অন্যের জমি নিতে না, এবং সম্পদ লোভ থেকে বিরত থাকতে।

তাই আমি বলেছিলাম:

"মৌলভি সাহেব! অন্য কর্তৃপক্ষ আমাদের বলেছেন জমি অন্য কারো। অন্যদের সম্পদ নেওয়া পাপ। আমি কীভাবে এই জমি নিতে পারি?"

তিনি বললেন:

"এটা পৃথিবীর শেষ ভাগ্য, ছেলে। যারা এখন অংশ নেবে না তারা চিরকাল জমিহীন থাকবে।"

আমি তখন ছোট ছিলাম, তাই তিনি বললেন, তিনি আমাকে সাহায্য করবেন।

"তোমাকে অবশ্যই এটা করতে হবে!" তিনি জোর দিয়েছিলেন।

“রাজা এখানে নিয়ন্ত্রণে আছেন। যদি তিনি কিছু ঠিক করেন, আমাদের তা সন্দেহ করা উচিত নয়। আমাদের আজ্ঞাবহ হতে হবে।”

আমি সেখানে এক রাত থাকলাম, এবং পরের দিন মৌলভি সাহেবকে বিদায় না দিয়ে শহরে ফিরে এলাম।

আমার শিক্ষক মোল্লা নিয়ামতুল্লাহ আখুন্দ এবং অন্যান্য পণ্ডিতরা সবাই পাকিস্তানে পালিয়ে গিয়েছিলেন। আমার পরিচিত কেউ বাকি ছিল না। সায়েদ, খান, মালিক আর মোল্লারা সবাই সরকারের অত্যাচারের শিকার হচ্ছিলেন।

শিক্ষিত লোকেরা যারা জেলার বাইরে বাস করতেন, তারা কমিউনিস্টদের পরামর্শ দিয়েছিলেন গ্রামাঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য স্থানীয় ক্ষমতাধারীদের কারাগারে রাখা উচিত। অনেকেই জেলে পড়েছিল, কিন্তু বেশির ভাগের সাথে আর কেউ দেখা পায়নি।

*****

১৯৭৮ সালে, আমি মাত্র দশ বছর বয়সী ছিলাম যখন কমিউনিস্টরা — তারাকী এবং হাফিজুল্লাহ আমিনের নেতৃত্বে — একটি ক্যু এর মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে। তারা দ্রুত কমিউনিস্ট ভাবধারা ও নীতিমালা প্রবর্তন শুরু করে এবং সংস্কারের গতি খুব ত্বরান্বিত ছিল। তাদের প্রথম সিদ্ধান্তগুলোর একটি ছিল ভূমি সংস্কার নিয়ে, যা মৌলভী নিয়াজ মোহাম্মদ আমাকে গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

দেশজুড়ে ইতোমধ্যেই লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছিল। সরকার উর্ধ্বতন কমান্ডারদের ধরে ফেলার চেষ্টা করছিল এবং তালেবানদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছিল।

সাধারণ একটা ভুল ধারণা আছে যে “তালেবান” শুধু ১৯৯৪ সালে গঠিত হয়েছিল। কিন্তু আসলে, ‘তালেবান’ শব্দটি ‘তালিব’ এর বহুবচন, যার অর্থ ‘ছাত্র’ বা ‘শিক্ষার্থী’। অর্থাৎ যতদিন মাদ্রাসা ছিল, ততদিন ধর্মীয় ছাত্র বা তালেবানও ছিল। তালেবানরা মূলত রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করত না, কিন্তু সরকার তাদেরকে ভূমি সংস্কারে জড়িয়ে পড়তে চাপ দিত বা অন্য নানা উপায়ে ভয়ভীতি দেখাত।

এর জবাবে, তালেবানরা সরকার সমর্থকদের লক্ষ্য করে হামলা শুরু করে। মৌলভী নিয়াজ মোহাম্মদ এবং মৌলভী মীর হাতেমও এভাবেই নিহত হন। তখন আমি পড়াশোনায় ব্যস্ত ছিলাম এবং এসব বিষয় তেমন নজর দিতাম না, তবে শুনতাম মানুষ এ সময়কে ‘কুফর’ অর্থাৎ অবিশ্বাসের সময় বলে ডাকে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন খালক গোষ্ঠীর নতুন সরকারকে সমর্থন জানায় এবং একটি বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও শুভ প্রতিবেশীতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বুড়োদের মধ্যে এবং আমার কজিনদের মধ্যে ভয় ছিল। গুপ্তচরবৃত্তির গুজব ছড়িয়ে পড়ে এবং লোকেরা অদৃশ্য হয়ে যায়। সরকার নির্মমভাবে বিরোধিতা দমন করছিল।

মুজাহিদীনরা সরকার বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা অভিযান শুরু করে। তারাকী ও আমিন মুজাহিদীনদের ঘাঁটি নিয়ন্ত্রণের জন্য দক্ষিণ কান্দাহারের রেজিস্তান মরুভূমি ও পাঞ্জওয়াইয়ের উর্বর মাঠে যুদ্ধবিমান পাঠায়। প্রতিদিন বিমানগুলি শব্দ শোনা যেত, এবং লড়াই ছড়িয়ে পড়ত। হাজার হাজার মানুষ আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তান,

ইরান এবং অন্যত্র আশ্রয় নিতে শুরু করে। মুজাহিদীনদের প্রচেষ্টা পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলো থেকে সংগঠিত হত। অভিযান শুরুতে কঠিন ছিল, কারণ কমিউনিস্টরা ব্যাপক শক্তি নিয়ে লড়াই করছিল।

যখন লড়াই গ্রাম থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল, তখন আমি ও আমার বোন সানজারিতে চলে গেলাম, যা শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার পশ্চিমে মুজাহিদীনদের একটি আড়ালস্থল ছিল। নতুন সরকারের সমর্থকরা মুজাহিদীনদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ল, এবং তারাকীর লোকেরা গ্রাম ও ছোট মিলিশিয়াদের অস্ত্র সরবরাহ করছিল, বাজারে অস্ত্র বিতরণ করছিল। মুজাহিদীন ও তালেবান যারা যাচ্ছিলেন, তারা প্রায়ই গ্রামেই একটি এম্বুসের ফাঁদে পড়ে মারা যেত।

যোদ্ধারা কখনো কখনো সারারাত লড়াই চালাত। আমি আমার বিছানায় চোখ বন্ধ না করে শুয়ে থাকতাম, মেশিনগান ফায়ার এবং গোলাবর্ষণ ও বোমার বিস্ফোরণের শব্দ শুনে। পশতু জাতিরা কাবুল এবং তারাকীর পুতুল সরকারের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছিল। দক্ষিণ আফগানিস্তান যুদ্ধের অগ্নিগর্ভ ছিল।

আমার কাছে খবর এলো যে আমাকে আমার কজিনের বাড়ি, জঙ্গিয়াবাদে ফিরে যেতে হবে। আফগানিস্তানে এখনও যাঁরা বেঁচে আছেন, সকল আত্মীয়-স্বজন একত্রিত হয়েছেন এবং পাকিস্তানের পাহাড় পার হয়ে পালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তারা বলছিলেন, পরিস্থিতি দিন দিন আরও খারাপ হচ্ছে এবং শিগগিরই দক্ষিণের সমস্ত জায়গায় লড়াই ব্যাপকভাবে তীব্র হয়ে উঠবে। আমরা যত দ্রুত সম্ভব চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার দুই চাচাও মুজাহিদীনদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ল এবং রক্তের নদী এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে, এক জেলার থেকে আরেক জেলায়, এক প্রদেশ থেকে আরেক অঞ্চলে প্রবাহিত হয়ে আফগানিস্তানকে পুরোপুরি নিমজ্জিত করে দিল।

THE CAMPS

১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসের কমিউনিস্ট অভ্যুত্থানের পর, আরও বেশি মানুষ পাকিস্তান, ইরান এবং অন্যান্য দেশে পালাতে শুরু করল। কিছু আফগান রাজনীতিবিদও আফগান সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার করার জন্য সেখানে আশ্রয় নেয়, যার জন্য পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ সক্রিয় সহযোগিতা করেছিল। নির্দেশিকা নং ৮ — যা অন্যদের জমি এবং সম্পত্তি জব্দ এবং ভাগ করে নেওয়ার বৈধতা দিয়েছিল — এবং নির্দেশিকা নং ৭ — যা মহিলাদের শিক্ষার আদেশ দেয় এবং বিয়েতে যৌতুক হিসেবে সর্বোচ্চ তিনশ আফগানি ধার্য করেন।— জনসাধারণের কাছে অপ্রত্যাশিত এবং হারাম হিসেবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

আফগান শরণার্থীরা পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকাসহ বালুচিস্তানে বিভিন্ন শিবিরে বসবাস করত। পরে যে রাজনৈতিক দলগুলো গড়ে উঠল, তারা দলের সদস্যদের জন্য পরিচয়পত্র জারি করেছিল যা তাদের দেশজুড়ে যাতায়াতের স্বাধীনতা প্রদান করত। বসবাসকারীদের ব্যবসা-বাণিজ্যে কোনো সমস্যা হত না। শরণার্থীদের মাধ্যমে পাকিস্তান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল।

জাতিসংঘ এবং এনজিওগুলোর মতো দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলো দ্রুত পাকিস্তানে পৌঁছে অনেক অফিস খুলেছিল। আমেরিকা বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল, কারণ সে এই খেলায় প্রধান খেলোয়াড় ছিল। তার প্রতিদ্বন্দ্বী সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাস্ত করার জন্য, যা কাবুলের কমিউনিস্ট শাসনকে সমর্থন করছিল, আমেরিকা পাকিস্তানের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে। তবে রেড আর্মি যখন আফগানিস্তানে তাদের অবস্থান হারাতে শুরু করে, তখন পশ্চিমা সাহায্য এবং মনোযোগও কমতে থাকে।

পশ্চিমা সাহায্যের হ্রাসের সাথে সাথে পাকিস্তানের শরণার্থী নীতিও কঠোর হয়ে ওঠে। ইসলামাবাদ সরকারের সাথে আমাদের সমস্যা বাড়তে থাকে; কিছু শরণার্থীকে নির্দিষ্ট অঞ্চলে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়নি, তাদের জোরপূর্বক আফগানিস্তানে ফেরত পাঠানো হয় অথবা নির্জন এলাকায় স্থানান্তরিত করে নিজেদের জন্য নতুন বাড়ি তৈরি করতে বাধ্য করা হয়।

আমাদের পাকিস্তানে পালানোর এবং জন্মভূমি ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমার খুব কমই স্মৃতি আছে। আমি শুধু কঠোর শীত এবং ক্ষুধার কথা মনে রাখতে পারি, যাত্রাটি কঠিন ছিল এবং আমি ভীত ছিলাম। আমরা ১৯৭৯ সালের জানুয়ারিতে রওনা দিয়েছিলাম, যখন দক্ষিণ আফগানিস্তানে সংঘর্ষ তীব্রতর হয়েছিল। শরণার্থীদের প্রথম ঢেউ চলে যেতে শুরু করেছিল, এবং মনে হচ্ছিল না যে পরিস্থিতি নিকট ভবিষ্যতে ভালো হবে। এক মাস আগে জমি সংস্কারের আইন পাশ হয়েছিল, এবং আমার দুই চাচা মুজাহিদিনে যোগ দিয়েছিলেন। এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে আমরা আর আফগানিস্তানে থাকতে পারব না।

আমাদের সাতটি গাড়ির কনভয় মধ্যরাতে জঙ্গিয়াবাদ থেকে পাকিস্তানের দক্ষিণ দিকে রওনা দেয়। আমরা কিছু জিনিসপত্র প্যাক করেছিলাম, কিন্তু বাবার বই নেবার জন্য জায়গা ছিল না। আমাদের যাত্রা রেগ মরুভূমির মধ্য

দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তারপর আমরা সরে ছাহান পৌঁছেছিলাম। এটা ছিল আমার প্রথমবারের মতো অন্য দেশের সীমান্ত পাড়ি দেওয়া।

রাস্তায় চলাচল ইতিমধ্যেই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল, তাই আমাদের ছোট কনভয় শুধু রাতে চলত, আলো নিভিয়ে রেখেছিল যেন কেউ আমাদের দেখতে না পারে। ছোট রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে আমরা প্রধান সড়কগুলো থেকে দূরে থাকতাম। পাহাড়ের ঢালুতে পৌঁছালে আমরা গাড়ি থেকে নামতাম এবং পায়ে হাঁটতাম, এমনকি কিছু সময় গাড়িগুলো ফেলে দিয়ে হেঁটে যেতাম। কখনো কখনো মোটরসাইকেল চালকরা আমাদের একসাথে চারজন করে নিয়ে যেত। আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যকার প্রাচীন কাস্টমস চোরাচালানের পথগুলো দিয়ে আমরা অল্প অল্প করে এগিয়ে যেতাম। গন্তব্যে পৌঁছাতে আমাদের তিন দিন তিন রাত সময় লেগেছিল।

সীমান্তের ওপারে, চামান এর বাইরে একটি শিবির গড়ে তোলা হয়েছিল। পাকিস্তানি সরকার এই শিবিরটিকে আগত লাখ লাখ আফগান শরণার্থীদের জন্য একটি হাব হিসেবে ব্যবহার করত। শরণার্থীদের কোথায় যেতে হবে সে বিষয়ে আরও নির্দেশনা দেওয়া হতো বা তাদের অন্যান্য শিবিরে পাঠানো হতো। আমরা ভোরে পৌঁছেছিলাম এবং কয়েক ঘণ্টা শিবিরে থাকলাম, তারপর বেশ কিছু পরিবারের সঙ্গে ট্রাকের পিছনে উঠলাম। গরুর মতো পাশে পাশে দাঁড়িয়ে আমরা পুরো রাস্তা কুয়েটা পর্যন্ত যাত্রা করলাম। সেখান থেকে আমাদের নুশকিতে নিয়ে যাওয়া হয়।

পাকিস্তান বুঝতে পেরেছিল যে তাদের সামনে একটি বড় আফগান শরণার্থী ঢেউ আসছে এবং তারা নুশকির মতো এলাকা বরাদ্দ করেছিল যেখানে তারা বসবাস করতে পারবে। আমাদের অন্য আত্মীয়রা কয়েক দিন আগে শিবিরে পৌঁছেছিল, আর আমরা তাদের কাছাকাছি তাঁবু গড়লাম। শিবিরটি নতুন হলেও বেশ কয়েকটি স্বতন্ত্র সেকশন ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছিল। পাকিস্তানি সরকারের তত্ত্বাবধানে থাকলেও শরণার্থীদের নিজেদের একটি প্রশাসন ছিল; শিবির ও সেকশনের নেতারা নির্বাচন ও নিয়োগপ্রাপ্ত হতো – যাদের মধ্যে একজন আমার কাকা ছিলেন – বয়স ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। তারা শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করত এবং আমাদের পক্ষে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলত।

আমরা যখন পৌঁছলাম তখন শিবিরে সবচেয়ে মৌলিক সুবিধাগুলোও অনুপস্থিত ছিল, এবং পাকিস্তানি সরকারি এজেন্সিগুলো সেগুলো সরবরাহ করতে দেরি করছিল। শিবিরে সুষ্ঠু পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ছিল না, স্বাস্থ্যসেবা বা ক্লিনিক ছিল না। শিবিরটি মরুভূমির মাঝখানে ছিল এবং সূর্য আমাদের মাথার উপর জ্বলজ্বল করছিল। গরম অতি দমবন্ধকর এবং কখনও কখনও অসহনীয় ছিল। আমাদের তাঁবুগুলো ওভেনের মতো হয়ে গিয়েছিল; কেউ কেউ তাঁবুর ক্যানভাস দেয়ালে ছোঁয়াতে হাত পুড়েছিল।

পানির জন্য একটি রেশনিং ব্যবস্থা চালু ছিল। কখনো কখনো সরকার ট্রাকে করে খাবারযোগ্য পানি আনত, কিন্তু সেটা কখনোই যথেষ্ট হতো না, ফলে আমাদের কাছাকাছি গ্রাম থেকে পানি আনতে হতো। স্থানীয় বেলুচদের সংস্কৃতি আমাদের থেকে ভিন্ন ছিল, এবং শিবির প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরই আফগানদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক চরম উত্তেজনার মধ্যে পড়ে।

ক্রমবর্ধমান সংখ্যক শরণার্থী আশেপাশের এলাকা থেকে পানি ও জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে থাকলে বেলুচরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা মনে করত, শিবির যত বড় হচ্ছে, ততই তাদের জীবনের ওপর হুমকি তৈরি হচ্ছে। ধীরে ধীরে এই উত্তেজনা সহিংসতায় রূপ নেয়, এবং আফগান শরণার্থী ও স্থানীয় গ্রামবাসীদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হয়। এই সংঘর্ষে দুইজন শরণার্থী ও চারজন স্থানীয় বাসিন্দা নিহত হয়।

পাকিস্তানি সরকার শিবির ঘিরে ফেলে এবং সমস্ত প্রবেশ ও প্রস্থান পথ বন্ধ করে দেয়। তারা বেলুচ গ্রামবাসী ও শরণার্থীদের মধ্যে মধ্যস্থতার চেষ্টা করে এবং ট্যাংকারে করে শিবিরে প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেয়। দুর্ভাগ্যবশত, সরবরাহকৃত পানির মান এতটাই খারাপ ছিল যে তা পান করা যেত না।

শিবিরের পরিবেশ–যেটা তখনও ঘেরা অবস্থায় ছিল–ক্রমশ খারাপ হতে থাকে এবং আস্তে আস্তে বোঝা যায় যে এই সমস্যার কোনও স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। আসলেই এই শত্রুতার প্রকৃত কারণ কী ছিল বলা কঠিন। আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি, শুরু থেকেই বেলুচরা মেনে নেয়নি যে তাদের এলাকায় একটি শরণার্থী শিবির স্থাপন করা হবে। শেষ পর্যন্ত তারাই বিজয়ী হয়, কারণ কর্তৃপক্ষ শিবিরটি বন্ধ করে দেয় এবং সমস্ত শরণার্থীদের কয়েক কিলোমিটার দূরে একটি নতুন এলাকায় স্থানান্তরিত করে।

সরকারি ট্রাকগুলো মধ্যরাতে শিবিরে এসে পৌঁছায়। আমাদের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে বলা হয়, এরপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় শের জান আঘা নামক একটি ছোট মরূদ্যান ও জিয়ারতের স্থানে। সেখানে আমরা দুই দিন ছিলাম, যতক্ষণ না পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ আমাদের জন্য একটি নতুন শরণার্থী শিবির প্রস্তুত করে।

আমি শের জান আঘার কথা ভালোভাবে মনে করি; আমি সেখানে সাঁতার কাটতাম এবং বালির মধ্যে দশ রুপির একটি কয়েনও খুঁজে পেয়েছিলাম। তৃতীয় দিনে আমাদের নতুন শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়, যার নাম ছিল পাঞ্জপাই।

আমরা যখন সেখানে পৌঁছালাম, কোয়েটা শহরের প্রায় ৭৫ কিলোমিটার পশ্চিমে, তখন চারপাশে শুধু নির্জন প্রান্তর দেখা যাচ্ছিল। সূর্য ডুবে যাচ্ছিল যখন আমাদের ট্রাকটি একটি ছোট কাঁচা রাস্তার শেষে এসে থামল। আমরা রাতটা কাটানোর জন্য যা সম্ভব তা করার চেষ্টা করলাম।

প্রথম কয়েক দিনে সবাই গাছ কেটে জমি পরিষ্কার করতে, কাঠ দিয়ে ছোট কুঁড়েঘর এবং একটি মসজিদ বানাতে ব্যস্ত ছিল। আমরা নিজেদের সঙ্গে আনা তাঁবুগুলো গেড়ে স্থির হওয়ার চেষ্টা করলাম। আমাদের অস্থায়ী ঘরগুলোর চারপাশে আমরা “ওশ মুরগাই” নামে কাঁটাঝোপ দিয়ে বেড়া তৈরি করেছিলাম।

জমিটা ছিল শুষ্ক আর আবহাওয়াটা ছিল নুশকির মতোই গরম। সর্বত্র বিচ্ছু, সাপ আর ট্যারান্টুলার বাসা দেখা যেত। প্রতি রাতে যখন আমরা আমাদের ছোট কেরোসিন বাতিটা জ্বালাতাম, তখন তিন বা চারটা বিচ্ছু অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের দিকে এগিয়ে আসত। পানির কোনও ব্যবস্থা ছিল না, আর প্রথম কয়েক দিন আমরা আমাদের সঙ্গে আনা বালতি আর ক্যানিস্টারে রাখা পানি রেশন করে খেতাম। এমনকি আমরা ওজু করার জন্য মাটি আর বালিও ব্যবহার করতাম। নিকটবর্তী কূপগুলো শিবির থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরের একটি গ্রামে ছিল। আমাকে অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পানি আনতে পাঠানো হতো। প্রতিদিন সকালে আমরা আমাদের

বালতি নিয়ে কূপে যেতাম। ফিরে আসতে আসতে দুপুরের নামাজের সময় হয়ে যেত। পথটা অনেক দূর ছিল এবং বালতিগুলো ভারী ছিল। যখন আমরা শিবিরে ফিরতাম, তখন প্রায়শই ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়তাম।

*****

আমার আত্মীয়স্বজন, চাচা ও চাচাতো ভাইদের অন্তত পনেরোটি পরিবার একসঙ্গে ওই শিবিরে বসবাস করছিল। আমরা ঝোপঝাড় দিয়ে বানানো মসজিদে জামাতে নামাজ আদায় করতাম। প্রতিদিন নতুন নতুন শরণার্থী আসত; এ যেন এক অন্তহীন স্রোত, আর শিবিরটা দ্রুত বড় হতে লাগল। অল্প দিনের মধ্যেই পাঞ্জপায়ী কয়েকশো শরণার্থী থেকে কয়েক লক্ষে পরিণত হলো, যেখানে অনেকগুলো অস্থায়ী মসজিদও গড়ে উঠল। শিবিরটি এক অনুর্বর ভূমির মাঝে আফগান শহরে পরিণত হয়, এবং শরণার্থীদের এই বিশাল সংখ্যা সামাল দিতে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে।

যদিও খাদ্য ও মৌলিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী–যেমন আটা, সাবান, চা, দেশলাই ও দুধের গুঁড়া–উপলব্ধ ছিল এবং বিতরণ করা হতো, তবুও পানির সংকট ছিল প্রকট। আশেপাশে পানির কোনও উৎস ছিল না এবং পানির ট্যাংকার খুব সীমিত ছিল। কূপগুলো অনেক দূরে ছিল, আর কেউ কেউ তাদের গাধা সঙ্গে এনেছিল বটে, কিন্তু তারপরেও সবার জন্য যথেষ্ট পানি আনা সম্ভব হতো না। শিবিরজুড়ে মানুষ কূপ খনন শুরু করল, মরিয়া হয়ে পানির খোঁজে।

৩১ মিটার গভীরে আমরা শেষমেশ পানি পেয়ে যাই। খবরটা পুরো শিবিরে ছড়িয়ে পড়ে এবং সবাই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়; যেন ঈদের দিন এসে গেছে। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুরা একে অপরকে শুভেচ্ছা জানাতে শুরু করে কূপের সফলতার জন্য। পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে আনতে কয়েকদিন সময় লেগেছিল, কিন্তু এরপর সবাই সেই কূপ থেকে পানি নিতে পারত।

আফগানিস্তান থেকে যারা আসছিল, তারা ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে সোভিয়েত আক্রমণের খবর আনছিল। রাজধানী কাবুলের বাইরে বিদ্রোহ ক্রমশ বেড়ে চলেছিল। প্রথমে তা উত্তর-পূর্বের কুনারে, এরপর পশ্চিমাঞ্চলের হেরাতে এবং পরে কান্দাহারে ছড়িয়ে পড়ে–প্রাথমিকভাবে পাঞ্জওয়াইয়ে। যদিও এসব প্রতিবাদ শান্তিপূর্ণ ছিল, তবুও রুশরা প্রকাশ্য বিরোধিতা সহ্য করত না এবং তারা বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে গুলি চালায় এবং বোমা ফেলে। এ সময় মুজাহিদিনরা রেগিস্তান মরুভূমি থেকে রাতের বেলা অভিযান চালাত এবং দিনের বেলায় নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরে যেত।

শরণার্থীদের মধ্যে অনেক মোল্লা ছিলেন এবং আমরা প্রতিদিন দুইবার মসজিদে পড়াশোনা করতাম। পরবর্তীতে শের মোহাম্মদ খান একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, যার নাম ছিল ইমাম আবু হানিফা মাদ্রাসা। এটি একটি স্কুল হিসেবেও কাজ করত এবং দশম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস নিত।

আমাদের শিবির থেকে কিছু ছেলেমেয়ে সেখানে পড়াশোনা করত এবং আমিও ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হই। আমরা প্রতিদিন সকালবেলা পড়তে যেতাম। স্কুলটি অনেক দূরে ছিল এবং সেখানে পৌঁছাতে আমাদের ভোর ছয়টায় উঠতে হতো ও এক ঘণ্টারও বেশি হাঁটতে হতো। দুপুরে আমরা মৌলভী হানিফা সাহেবের সাথে একটি ছোট সভায় একত্রিত হতাম, যিনি আমাদের ধর্মীয় পড়াশোনায় মনোযোগ দিতেন।

আমি পাঞ্জপায়ী শিবির থেকে সেই সাতজন ছাত্রের একজন ছিলাম যারা ওই মাদ্রাসায় পড়ত। আমি স্কুলে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতাম এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণি পাস করি। আমি এখনো মনে রেখেছি, সপ্তম শ্রেণির চূড়ান্ত পরীক্ষায় আমি ৪৮০ নম্বর পেয়েছিলাম, যা পুরো শ্রেণির মধ্যে সর্বোচ্চ ছিল। অষ্টম শ্রেণিতে আমি শ্রেণি নেতা নিযুক্ত হই।

স্কুলে সময় কাটানো আমার ভালো লাগত এবং পড়াশোনাও উপভোগ করতাম। আমার শিক্ষকেরাও আমার ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন, আর আমিও তাদের প্রতি খুশি ছিলাম। আমি তাদের উপদেশ ও নির্দেশনা অনুসরণ করতাম এবং শ্রেণিকক্ষে ভালো আচরণ করতাম। জ্ঞান লাভের প্রতি আমার ভালোবাসা কখনোই হারিয়ে যায়নি—এমনকি যখন আমি রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলাম তখনও।

*****

মাদ্রাসার পথে অনেক ছোট ছোট গ্রাম বা বসতি পড়ত। এর মধ্যে সবচেয়ে বড়টি ছিল মুশওয়ানু, যেখান থেকে আরও প্রায় ত্রিশজন বিভিন্ন বয়সের ছাত্র আমাদের সঙ্গে পড়ত। তাদের মধ্যে একজন নবম শ্রেণির দলনেতা ছিল, যার বয়স আনুমানিক ষোলো বা সতেরো বছর। তারা আমাদের পছন্দ করত না, আমরাও তাদের পছন্দ করতাম না। প্রতিদিনই ছোটখাটো ঝগড়া বা ধাক্কাধাক্কি হতো, কারণ কেউ একজন কাউকে অপমান করত।

একদিন আমরা যখন শিবিরে ফিরে যাচ্ছিলাম, তখন দেখলাম মুশওয়ানু গ্রামের ছেলেরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, মারামারির জন্য প্রস্তুত হয়ে। আমাদের কাছে ছিল শুধু কাঠের ফলক, যেগুলোর ওপর আমরা নোট নেওয়ার সময় বই রাখতাম। আর ওদের হাতে ছিল লাঠি ও চেইন। তারা অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করছিল এবং একে অপরকে উসকে দিচ্ছিল, যদিও সেটার প্রয়োজনই ছিল না কারণ সংখ্যায় তারা আমাদের চেয়ে চারগুণ বেশি ছিল। আমরা যখন ওদের কাছে পৌঁছাতে থাকি, আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে কথা বললাম। আমরা সবাই একমত হলাম—আমাদের পিছু হটলে চলবে না। আমি ওদের সবচেয়ে বড় ছেলেটাকে আঘাত করব, আর বাকিরা একযোগে তাদের প্রতিপক্ষকে। আমরা জানতাম, প্রথম আঘাতটাই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দুর্বল হলে তোমাকে প্রস্তুত থাকতে হয়, তোমার যা আছে তাই দিয়ে রক্ষা করতে হয়। সেদিন আমাদের লক্ষ্য ছিল মুশওয়ানু ছেলেদের কয়েকজনকে জোরে আঘাত করে ওদের ভয় পাইয়ে তাড়িয়ে দেওয়া।

আমরা যখন ওদের আরও কাছে পৌঁছাই, ওরা গালাগাল দিতে শুরু করে ও আমাদের নামে চিৎকার করে। আমরা ওদের বোঝানোর চেষ্টা করলাম, বললাম গালাগাল ও অভিশাপ পাপ। কিন্তু ওদের সবচেয়ে বড় ছেলেটা যখন আমার নাগালের মধ্যে এলো, আমি কোনো পূর্বাভাস বা কথা না বলেই আমার কাঠের ফলকটি তুলে একেবারে ধারালো প্রান্ত দিয়ে তার মাথায় জোরে আঘাত করলাম। সে পিছনে পড়ে গেল; আমার আঘাতে তার মাথা মারাত্মকভাবে ফেটে যায়, আর রক্ত ছুটে বের হতে থাকে। মাটিতে পড়ে সে চিৎকার করে কাঁদছিল: "সে আমাকে মেরে ফেলেছে! সে আমাকে মেরে ফেলেছে!"

আমি আমার পাশে থাকা ছেলেটির দিকে ফিরলাম। চোখের কোণ দিয়ে দেখলাম, আমার সব বন্ধুই সাহস ধরে রেখেছে এবং প্রতিপক্ষের ওপর হামলা চালিয়েছে। মুশওয়ানুর ছেলেরা পালিয়ে গেল তাদের গ্রামে। আমাদের কেউ আহত হয়নি, আর আমরা উচ্ছ্বসিত হয়ে শিবিরে ফিরে এলাম—বারবার সেই লড়াইয়ের দৃশ্য অভিনয় করে

দেখাচ্ছিলাম। আমরা আমাদের সব বন্ধুদের কাছে ঘটনার কথা বললাম, কিন্তু খুব শিগগিরই মুশওয়ানু গ্রামের বড়রা এসে অভিযোগ করল।

তাদের সাতজন ছেলে আহত হয়েছিল। যাকে আমি মাথায় মেরেছিলাম, সে হাসপাতালে ভর্তি ছিল। বয়োজ্যেষ্ঠদের মাধ্যমে বিষয়টি মীমাংসা হলেও, আমাদের আর স্কুলে বা মাদ্রাসায় যেতে দেওয়া হয়নি। আমরা কেবল শিবিরের স্থানীয় মসজিদেই আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা চালিয়ে যেতে পারতাম।

*****

পাঞ্জপাই শিবিরটি শিগগিরই বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। আমাদের এলাকায় সবাই ছিল কান্দাহার থেকে, আর ক্যাম্প ২-তে ছিল দক্ষিণ-পূর্ব প্রদেশ গজনির লোকজন এবং এভাবে অন্যান্য অঞ্চলের লোকেরা ভাগ হয়ে থাকত। এ সময় পাকিস্তান সরকার পুরো শিবির দেখভালের জন্য একজন কমিশনার নিয়োগ করে।

আমি প্রায়ই মুজাহিদিনদের আফগানিস্তানের দিকে যুদ্ধে যেতে দেখতাম, বা কখনো তাদের আহত অবস্থায় ফিরে আসতেও দেখতাম। আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তাদের পুতুল সরকার এবং অপরদিকে মুজাহিদিনদের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল ইতোমধ্যে চার বছর ধরে। যারা শিবির ছেড়ে সীমান্ত পেরিয়ে যুদ্ধে গিয়েছিল, তাদের অনেকেই আর ফিরে আসেনি। প্রতিটি পরিবারই তাদের কোনো না কোনো আত্মীয়কে হারিয়েছিল—দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল তারা। আমার অনেক আত্মীয় পালাক্রমে মুজাহিদিনদের ফ্রন্টে যোগ দিত।

মসজিদে মোল্লারা আমাদের জিহাদের পবিত্রতা, সকল মুসলমানের ওপর এর দায়িত্ব, বেহেশতের প্রতিশ্রুতি এবং আমাদের মাতৃভূমি নিয়ে বয়ান দিতেন।

মৌলভী উবায়দুল্লাহ, যিনি সায়াফ পার্টির একজন সদস্য ছিলেন, আমাদের শিবিরের একজন প্রবীণ ছিলেন। তিনি অনেক মুজাহিদদের নেতৃত্ব দিতেন, যাদের অনেকে আবার বিভিন্ন দল ও সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কেউ কেউ তালেবানদের ফ্রন্টে যোগ দিত, কেউ অন্য গ্রুপে।

আমাদের গ্রামের একজন সুপরিচিত মুজাহিদ ছিলেন মোল্লা শাহজাদা, যিনি পরে ফ্রন্টলাইনে শহীদ হন। তিনি প্রয়াত কারি শাহজাদার সঙ্গে জিহাদে অংশ নিয়েছিলেন, যিনি মোল্লা মোহাম্মদ সাদিক আখুন্দের নেতৃত্বাধীন নেলঘাম ফ্রন্টে সক্রিয় ছিলেন।

তৎকালীন অধিকাংশ তরুণের মতো আমিও রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিতে ব্যাকুল ছিলাম। আমরা প্রায়ই বন্ধুদের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করতাম, যখনই মুজাহিদিনদের যেতে দেখতাম। আমি আল্লাহর পথে আমার দায়িত্ব পালন করতে এবং আমার দেশকে নাস্তিক সোভিয়েত সৈন্যদের হাত থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার কাছে সেখানে যাওয়ার মতো টাকা ছিল না, আর মাদ্রাসার আমার আত্মীয় ও শিক্ষকেরা আমাকে যুদ্ধে যেতে দিতেন না। তারা জিহাদের আদর্শে বিশ্বাস করলেও, তাদের পরিবারের ছেলেকে জীবন বিপন্ন করতে রাজি ছিলেন না।

আমার এক কাজিন আমাকে বলেছিলেন, “এখন পড়াশোনার ওপর মনোযোগ দাও, পরে হয়তো আমরা একসঙ্গে জিহাদে যোগ দিতে পারব। তুমি দেখবে, পড়াশোনা তোমার জন্য ভালো, এটা তোমাকে ভবিষ্যৎ দেবে।’ ’

আমি তখন যত টাকা পারতাম জমাতে শুরু করলাম। সব মিলিয়ে আমি প্রায় একশো পাকিস্তানি রুপি জমিয়েছিলাম, যা জমাতে আমার প্রায় তিন মাস লেগেছিল। তখন আমার বয়স ছিল পনেরো বছর।

আমি আফগানিস্তানের উদ্দেশে রওনা দিই। না আত্মীয় না বন্ধু—কাউকে কিছু বলিনি।

আমার জিহাদ শুরু করেছিলাম।

THE JIHAD

আমি কেবল গায়ে থাকা কাপড় আর পকেটে একশো রুপি নিয়ে চামানগামী একটি বাসে চেপে যাত্রা শুরু করি। তখন ১৯৮৩ সালের গ্রীষ্মকাল, এবং পার্বত্য গিরিপথগুলো খোলা ছিল, তাই অনেক মুজাহিদিন শিবির থেকে আফগানিস্তানে যেত এবং ফিরে আসত। আমি কান্দাহারগামী একটি ছোট দলের সঙ্গে যোগ দিই। আমার একজন ধর্মীয় শিক্ষক সালাম আঘা তখন সেখানে ছিলেন, তিনিই আমাকে সীমান্ত পার করে নিয়ে যান। আমরা রাতের অন্ধকারে চোরাপথ ধরে হেঁটে যাই।

সীমান্তটি চিহ্নিত ছিল না, তাই আমরা কখন ঠিক আফগানিস্তানে প্রবেশ করেছি তা আমি জানি না। তবে মনে আছে আমি খুশি ছিলাম। আমরা রেগিস্তানের মরুভূমি পেরিয়ে বলাক নেকায় পৌঁছাই এবং সেখান থেকে উটের পিঠে চড়ে নায়েব ওয়ালি ও টাঙ্গি হয়ে যাত্রা করি। তিন দিন ও দুই রাতের পথ পেরিয়ে আমরা পেশমল উপত্যকায় পৌঁছি, যেখানে গমের ক্ষেত আর আঙুরলতা ঘেরা সবুজ এলাকা ছিল।

ততদিনে জিহাদ অন্তত তিন বছরের পুরোনো, এবং মুজাহিদিনরা কান্দাহারের বিভিন্ন জেলায় নিজেদের যুদ্ধক্ষেত্র গড়ে তুলেছিল। সোভিয়েত সৈন্য ও মুজাহিদিন যোদ্ধারা নিয়মিত লড়াই করত, এক জেলা থেকে আরেক জেলায় যেত। আমরা আমাদের গতিশীলতা ও স্থানীয় ভৌগোলিক জ্ঞানকে কাজে লাগাতাম, আর রুশরা নির্ভর করত তাদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও আকাশ থেকে সমর্থনের ওপর। পরে আমি জানতে পারি, এই সময়ে রুশরা অতিরিক্ত সৈন্য পাঠিয়েছিল, যারা আমাদের গেরিলা যুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত ছিল। তবে এতে আদৌ কোনো পার্থক্য হয়েছিল কি না, আমি নিশ্চিত নই।

আমি শুনেছিলাম যে কমান্ডার আব্দুর রাজ্জাক পেশমলে একটি ফ্রন্ট পরিচালনা করছেন, তাই আমি তার ও তার লোকদের সঙ্গে যোগ দিই। শুরুতে মনে হয়েছিল তিনি একজন ভালো কমান্ডার এবং ভালো মানুষ, কিন্তু খুব বেশিদিন লাগেনি বুঝতে যে তার প্রধান চিন্তা ছিল নিজের জমি ও সম্পত্তি রক্ষা করা।

আমি রাজ্জাকের সঙ্গে প্রায় দুই মাস ছিলাম এবং তার লোকজনের সঙ্গে দু'টি অভিযানে অংশ নিয়েছিলাম। বাকি সময়টা আমি তার ব্যক্তিগত কাজকর্ম এবং অন্যান্য মুজাহিদিনদের কাজে সাহায্য করে কাটাতাম। আমরা প্রতি সপ্তাহে একবার করে আমাদের অস্ত্র পরিষ্কার করতাম এবং কখনো কখনো টার্গেট প্র্যাকটিস করতাম। যদিও রাজ্জাক ও তার যোদ্ধাদের সঙ্গে আমার জিহাদের প্রথম স্বাদ পাওয়া হয়েছিল, অস্ত্র ব্যবহারে ও গুলির মুখে কিভাবে আচরণ করতে হয় তা শিখেছিলাম, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি আমি হতাশ হয়ে পড়ি। আমি জিহাদে অংশ নিতে আফগানিস্তানে এসেছিলাম, কিন্তু এখানে এসে দেখি, আমি কেবল অন্যদের সাধারণ ও গৃহস্থালী কাজ করছি। তখনই সিদ্ধান্ত নিই, রাজ্জাকের দল ছাড়ব। তার উপর, তার দলে কোনো আলেম বা শিক্ষক ছিলেন না, আর আমি চিন্তিত ছিলাম যে অস্ত্রচালনা ছাড়া কিছুই শিখছি না।

আমি জানতাম, তালেবানরা নেলঘামে মোল্লা মোহাম্মদ সাদিক আখুন্দের নেতৃত্বে লড়াই করছিলেন, কিন্তু তাদের সঙ্গে যোগ দিতে ভয় লাগছিল। ওই এলাকাতেই আমার কিছু আত্মীয় ছিলেন, কেউ কেউ তো মোল্লা মোহাম্মদ সাদিকের সঙ্গেও লড়াই করছিলেন। যদি আমি সেখানে যেতাম, তারা আমার অবস্থান আমার পরিবারকে জানিয়ে দিত। আর পরিবার তা জানলে নিশ্চয়ই আমাকে পাকিস্তানের শিবিরে টেনে নিয়ে যেত। তখনও অনেকে তালেবানদের নিয়ে আলোচনা করত। অন্যান্য মুজাহিদিনরাও তাদের সম্মান করত। কেউ কেউ বিচার-বিবাদ মীমাংসার জন্য তালেবানদের আদালতে যেত অথবা পরামর্শ নিতে আসত।

আমাদের দৃষ্টিতে, জিহাদ শুধু যুদ্ধ নয়–এর সঙ্গে থাকতে হবে শিক্ষার শক্ত ভিত এবং ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা। মানুষ তালেবানদের কাছে যেত নিজেদের বিবাদ মেটানোর জন্য। মৌলভী নেজার মোহাম্মদ প্রথমে ছিলেন প্রধান বিচারপতি, কিন্তু তিনি শহিদ হওয়ার পর মৌলভী সাইয়্যেদ মোহাম্মদ পাশানাই সাহেব দায়িত্ব নেন। পেশমলে একটি তালেবান কারাগার স্থাপন করা হয়, যার পাশাপাশি আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন জেলাগুলোতেও আরও কিছু আটককক্ষ তৈরি করা হয়।

বেশিরভাগ মুজাহিদিন ফ্রন্ট ছিল একই গোষ্ঠী, পরিবার বা এলাকার লোকদের নিয়ে গঠিত। তালেবানরা ছিল আলাদা। তারা ছিল বিভিন্ন পটভূমির ধর্মীয় ছাত্র ও আলেমদের একটি দল, যারা প্রচলিত দলীয় বা গোত্রভিত্তিক বিভাজন অতিক্রম করে চলত। তারা যুদ্ধ করত ঈমানের ভিত্তিতে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আল্লাহই ছিল তাদের এখানে থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য, বিপরীতে অনেক মুজাহিদিন যুদ্ধে যোগ দিত টাকা বা জমির লোভে।

গ্রীষ্ম যখন চূড়ায় এবং বাগানগুলো সবুজে ভরে উঠেছে, তখন আমি নেলঘামে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই তালেবানদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য। অন্তত ওখানে যুদ্ধ করার পাশাপাশি শিক্ষাও পাবো এটা নিশ্চিত ছিল। আমি আশপাশে খোঁজ নিয়ে পথ জেনে নেই এবং হেঁটে নেলঘামে যাই। সেখানে পৌঁছেই আমি হাজি মোহাম্মদ গুল আকা-র সঙ্গে দেখা করি, যিনি আমাদের পাঁজপাইয়ের পুরোনো প্রতিবেশী ছিলেন। আমার আরও কিছু আত্মীয় তখন মোল্লা মোহাম্মদ সাদিকের পক্ষে যুদ্ধ করছিলেন। আমরা একে অপরকে দেখে খুশি হই, যদিও তখনও ভয় ছিল যে তারা আমার পরিবারের কাছে খবর পাঠিয়ে দেবে।

*****

আমি নেলঘামে মাত্র কয়েকদিন ছিলাম, তখনই সোভিয়েত বাহিনী ও আফগান সেনাবাহিনী আমাদের অবস্থান ঘিরে ফেলে। তাদের গোলাবর্ষণ আর বিমান হামলায় রাত দিন হয়ে উঠেছিল; বোমা ও গোলার আঘাতে পুরো এলাকা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, কেবল ধ্বংসস্তূপ পড়ে ছিল চারপাশে। চারদিকে শুধু কবর আর কবর। আমি এখনো মনে করতে পারি–পুরুষ আর নারীদের মুখমণ্ডলে ছিল বিকৃত যন্ত্রণার ছাপ, অসংখ্য জানাজায় তারা আর্তনাদ করছিল। ওই এলাকায় যারা বেঁচে ছিল, তারা সবাই বাড়ি-ঘর, জমিজমা ছেড়ে পালিয়ে গেল, আর রুশ বিমানগুলো যেন পানির মতো বোমা ফেলছিল।

এটা মনে হচ্ছিল যেন রুশ ট্যাংক আর আর্টিলারি কখনোই হামলা থামাবে না, আর আমরা কেবল পড়ে ছিলাম। দশ দিন ধরে মাটি কেঁপে উঠছিল। তখন পর্যন্ত আমাদের কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না, কেবল হাতে ছিল কয়েকটা গুলি আর একটা গ্রেনেড। রাশান বাহিনী তাদের অবস্থানে অনড় ছিল। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে পিছু

হটব এবং জঙ্গিয়াবাদে পালিয়ে যাব। এটা ছিল খুবই কষ্টকর একটি কাজ এবং পালানোর সময় চারজন মুজাহিদ শহীদ হয়।

জঙ্গিয়াবাদে তখন প্রায় সত্তর জন মুজাহিদ ছিল, যাদের কাছে ছিল মাত্র তিনটি কালাশনিকভ, একটি রাইফেল, একটি বালাযান, একটি জাঘুরি এবং একটি আরপিজি–যেটা আসলও ছিল না। আমার ভাগ্যে পড়েছিল একটি কালাশনিকভ, আর আমি আল্লাহকে এজন্য শুকরিয়া আদায় করেছিলাম। সোভিয়েত বাহিনী ইতোমধ্যে পুরো অঞ্চল ঘিরে ফেলেছিল এবং জঙ্গিয়াবাদে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল।

রেগিস্তান, রুদের পাঞ্জপায়ী, চারশাখা ও মুশান থেকে রাশান এবং আফগান সরকারি বাহিনী তাদের অবস্থান শক্ত করে ঘিরে ফেলেছিল। সারাদিন বিমানগুলো মিশনে থাকত। একসঙ্গে চার থেকে ছয়টি রুশ বিমান আমাদের অবস্থানে হামলা চালাত। একবার তো আমরা গুনে দেখেছিলাম–চৌদ্দটা বিমান একসঙ্গে আকাশ থেকে বোমা বর্ষণ করছিল এই ছোট্ট অঞ্চলের ওপর। ট্যাংকের শব্দ চারদিকে শোনা যাচ্ছিল, আর পাহাড়গুলো কালো হয়ে গিয়েছিল বিস্ফোরণ আর গানপাউডারে। যারা পারত, পালিয়ে যেত। স্পারওয়ান গ্রামের মানুষ আর পাঞ্জপায়ী জেলা কেন্দ্র ছিল শরণার্থীদের ভরে। এক একটি ঘরে অনেকগুলো পরিবার একসঙ্গে থাকত, এক ঘরে বিশের বেশি মানুষ ঠাসাঠাসি করে।

প্রায় দশ দিন পর রাশান বাহিনী পাঞ্জপায়ী ছেড়ে পেশমল অভিমুখে এগিয়ে যায়। জঙ্গিয়াবাদ যুদ্ধের সময় শত শত মুজাহিদ ও সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছিল এবং বহু ঘরবাড়ি ও বাগান ধ্বংস হয়ে যায়। কিছু মুজাহিদ রাশান বাহিনীকে অনুসরণ করে পেশমলের ফ্রন্টে যোগ দেয়। আমরা সেখানে শক্ত প্রতিরোধ গড়েছিলাম এবং যুদ্ধ চলেছিল প্রায় দুই সপ্তাহ। উভয়পক্ষই ভয়ানক ক্ষয়ক্ষতি বরণ করে, অনেক মুজাহিদ শহীদ হন। ডজনখানেক ট্যাংকে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মুজাহিদরা আবারও অঞ্চল থেকে হটিয়ে দেওয়া হয়।

পেশমলের যুদ্ধের সময় নিহতদের মধ্যে ছিলেন দুইজন সিনিয়র মুজাহিদ কমান্ডার– কাজি মৌলভী নেজার মোহাম্মদ (যিনি মৌলভী সাইয়্যেদ মোহাম্মদ পাশানাই সাহেবের আগে প্রথম তালেবান বিচারক ছিলেন) এবং আরেক সাহসী মুজাহিদ মোল্লা খাওয়াস আখুন্দ। কিন্তু তার মুজাহিদরা লড়াই চালিয়ে যায়, এক ইঞ্চি মাটিও রুশ বাহিনীর হাতে ছেড়ে না দিয়ে, গ্রাম থেকে গ্রাম, অঞ্চল থেকে অঞ্চলে লড়তে থাকে।

পেশমল ও জঙ্গিয়াবাদের যুদ্ধগুলো ছিল সোভিয়েত বাহিনী ও মুজাহিদদের মধ্যকার যুদ্ধের এক একটি চিত্র। মুজাহিদদের জনবল কম ছিল, প্রশিক্ষণ কম ছিল এবং অস্ত্রও ছিল পুরনো ধরনের, তবুও আমরা গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলাম–যেখানে বিশাল, চলাচলে ধীর রাশান ৪০তম সেনাবাহিনীর দুর্বলতা কাজে লাগানো হতো। আমরা রসদ সরবরাহ ও পিছু হটার পথ নির্ধারণ করেছিলাম। রাশান বাহিনী যদি বেশি কাছাকাছি চলে আসত বা মুজাহিদদের বেশি ক্ষতি হতো, তারা তখন আরঘান্দাব, সাঙ্গিসার বা জঙ্গিয়াবাদের দিকে সরে যেত। আর যদি আরঘান্দাবে চাপ বাড়ত, তাহলে তারা মাহালাজাত, শাহ ওয়ালি কোট আর পাঞ্জপায়ী অঞ্চলে ফিরে যেত। পরে, যখন রাশান বাহিনী সরে যেত, তখন মুজাহিদরা আবার তাদের আগের অবস্থানে ফিরে যেত। আমরা বহুবার স্থান পরিবর্তন করেছি, যুদ্ধ করেছি, পিছু হটেছি এবং আবার সংগঠিত হয়েছি–ঠিক যেভাবে আজকাল তালেবানরা করে।

আফগানিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় মুজাহিদদের জন্য বিশেষ শহীদ-কবরস্থান ছিল। তবে যুদ্ধে আহত অনেক যোদ্ধাকে সঠিক চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হত না, কারণ কখনও কখনও ডাক্তার বা মেডিককে আহতদের চিকিৎসা করার জন্য দশ থেকে পনেরো দিন পর্যন্ত সময় লাগত। রুশদের কৌশল ছিল মুজাহিদদের অবস্থান ঘিরে ফেলা, যা আহতদের এলাকায় থেকে বের করে নেওয়া কঠিন করে তুলত। ছোটখাটো ক্ষতও সংক্রমিত হয়ে অনেক যোদ্ধার প্রাণ নিত। আমি স্মরণ করতে পারি, ছোট ও ভীড়যুক্ত একটি ঘরে দশ থেকে বারো জন আহত মুজাহিদকে দেখেছি। যারা মেডিক্যাল প্রশিক্ষণ নিয়েছিল, তারা তাঁদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করত আহতদের চিকিৎসা করার জন্য।

রুশরা অবশেষে পেশমল থেকে সরে গেলে মুজাহিদ এবং গ্রামবাসীরা তাঁদের বাড়িতে ফিরে আসেন এবং তখন তারা একটি ধ্বংসস্তূপের মত অবস্থার সম্মুখীন হন। রুশ অপারেশনগুলো নির্মম ছিল, এবং সেখানে এমন দৃশ্য ছিল যা মানবতার কোনও চিহ্নই রাখে না।

যদিও মুজাহিদরা পেশমল ছাড়ে গেছে, কিছু সাধারণ মানুষ তাদের গবাদি পশু রক্ষার জন্য বাড়িতে থাকত। রুশরা যা পেতো সবকিছু ধ্বংস করে দেয়। বাতাস ছিল মৃতদেহের দুর্গন্ধে ভারাক্রান্ত, আর মৃত পুরুষ, নারী ও শিশুর দেহগুলি গরু, ভেড়া ও মুরগির অবশিষ্টাংশের মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। গ্রামবাসীরা ফিরে এসে বহুদিন ধরে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু ও পশুর মৃতদেহ দাফনের কাজে ব্যস্ত ছিল।

*****

রুশরা জারাই মরুভূমিতে একটি বিশাল সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছিল, যেখানে ছিল ডিসি গান, বিএম৪০, বিএম১৬, ওরাগান এবং অন্যান্য ভারী অস্ত্র ও গোলাবারুদ। তারা দিনরাত নদীর ধারে থাকা গ্রামগুলো এবং ঘরবাড়িতে উদ্দেশ্যহীনভাবে হামলা চালাত। যখন তারা সামরিক অভিযান চালাত, তখন পুরো জমিকে যেন আগুনে পরিণত করে ফেলত—গ্রাম আর বাড়ির ওপর আর্টিলারি শেল বর্ষিত হতো, আর আকাশ থেকে বোমা পড়ত। তারা আর্গানদাব, মাহালাজাত, জালাখান ভেঙে পেরিয়ে নাখুনায় পর্যন্ত অভিযান চালিয়েছিল।

তাদের এই আক্রমণের সময় বহু মুজাহিদিন দল একত্র হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। প্রতিটি দল অন্যকে সহযোগিতা ও শক্তি জুগিয়েছিল। এটি ছিল আমাদের ঐক্যের চিত্র: দক্ষিণে যেখানেই যুদ্ধ শুরু হতো, পার্শ্ববর্তী এলাকার মুজাহিদিনরা ছুটে আসত সহযোগিতার জন্য।

আমরা পায়ে হেঁটে চলাফেরা করতাম, নিজেরাই নিজেদের গুলাবারুদ বহন করতাম। পরে মাঝে মাঝে আমরা ট্র্যাক্টর কিংবা গাড়ি পেতাম পরিবহনের জন্য। উপত্যকা ও পাহাড়ি গোপন পথ ব্যবহার করে আমরা সোভিয়েত বা আফগান কমিউনিস্ট চেকপোস্ট এড়িয়ে চলতাম। দীর্ঘপথে আমরা মোটরসাইকেল কিংবা ঘোড়ায় চড়তাম। মুজাহিদিনরা খুবই চলনসই ছিল এবং তারা প্রতিদিন তাদের নিজের অঞ্চলের ভৌগোলিক জ্ঞান কাজে লাগাত। আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলের ভালো মানচিত্র খুবই কম। এমনকি স্যাটেলাইট ছবিও বলতে পারে না কোন পাহাড়ি পথ রয়েছে বা কোন পথটা দ্রুতগামী। এই কারণেই স্থানীয় মুজাহিদ গাইডরা সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখত। তারা সাধারণত আপনার দলের কেউ না হলেও, পারস্পরিক সহযোগিতার মানসিকতা মুজাহিদদের মাঝে দৃঢ়ভাবে বিদ্যমান ছিল। দিকনির্দেশনা বা স্থানীয় তথ্য পাওয়াটা খুব একটা কঠিন ছিল না।

আমরা ক্লান্তি, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা উপেক্ষা করে লড়াই চালিয়ে যেতাম—মেওয়ান্ড থেকে ডান্ড, শাহ ওয়ালি কোট ও আর্গানদাব থেকে পাঞ্জওয়াই এবং অন্যান্য অঞ্চলে হেঁটে যেতাম। এমনকি প্রায় একশ কিলোমিটার হেঁটে নেলঘাম থেকে হেলমান্দ বা উরুজগানের তিরিন কোট পর্যন্ত যেতাম। আমরা মাসের পর মাস একই পোশাক পরতাম, প্রতিদিন হয়তো এক টুকরো রুটি বা কয়েকটি খেজুর খেয়ে বেঁচে থাকতাম। অনেকে লড়াই করতে চাইত, মরতে চাইত, বিশেষ করে আমাদের মতো তরুণ মুজাহিদিনরা।

আমরা যা পেতাম তা দিয়েই বেঁচে থাকতাম এবং যারা খাবার বা অর্থ দান করত, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতাম। মানুষ আমাদের সাহায্য করতে চাইত, যেমন আমরা যুদ্ধ করতে চাইতাম। যদি কোনো কমান্ডার কাউকে কোনো অভিযানে না নিত, সে যোদ্ধা রাগ করত ও হতাশ হত। যেভাবে সাধারণ মানুষ বিয়ের জন্য আগ্রহী থাকে, ঠিক সেভাবেই আমরা শাহাদতের জন্য আগ্রহী ছিলাম। মাঝে মাঝে যুদ্ধের মধ্যে মুজাহিদিনদের চিৎকার শোনা যেত, কিন্তু সেটা ভয় থেকে নয়। আমাদের বহু বন্ধু একে একে শহীদ হয়ে যেত, তবুও আমরা ভয় পাইনি। যুদ্ধের সময় সুযোগ পেলেই আমরা গুলির মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তাম—যদি না আমাদের কমান্ডার আমাদের থামিয়ে দিতেন। হয়তো বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু আমরা খুশি ছিলাম। মাঝে মাঝে আমরা আতান নাচতাম আনন্দে। যদিও কখনো কখনো আমরা প্রবল দুঃখ-কষ্টে ভুগেছি, তবুও এটিই ছিল সঠিক পথ। যদি কেউ মারা যেত, সেটাই আল্লাহর ইচ্ছা ছিল। কী আনন্দের জীবন ছিল আমাদের! একটি অভিযান শেষ হলে আমরা আবার আমাদের অবস্থানে ও আশ্রয়ে ফিরে যেতাম; ঘরে বসে আমরা স্বস্তি ও তৃপ্তি পেতাম এই ভেবে যে শত্রুর সামরিক শক্তির ক্ষতি করতে পেরেছি—যতক্ষণ না পরবর্তী অভিযান শুরু হতো।

তালেবানদের সাথে যুদ্ধ করা মানে শুধুমাত্র একজন মুজাহিদ হওয়া নয়—এর চেয়েও বেশি কিছু। তালেবানরা একটি কঠোর নিয়মতান্ত্রিক জীবন অনুসরণ করত, যেখানে আমাদের সাথে যারা যুদ্ধ করত, তাদের সবাইকে ব্যতিক্রমহীনভাবে এই নিয়ম মেনে চলতে হতো। আমরা ফজরের আজানের আগেই ঘুম থেকে উঠতাম এবং মসজিদে গিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করতাম। এরপর আমরা সবাই একসাথে বসে কিছুক্ষণ কাটিয়ে ক্যাম্পে ফিরে যেতাম।

প্রতিদিন সকালে আমরা সূরা ইয়াসিন শরীফ পাঠ করতাম—এই ভেবে যে, যদি আজ শহীদ হই, তাহলে যেন কুরআনের এই পবিত্র সূরা আমাদের সাথে থাকে। এরপর কেউ কেউ কোনো ফ্রন্টকে শক্তিশালী করতে বেরিয়ে যেত, কেউ অভিযান চালাতে যেত, আবার কেউ বন্দীদের দেখাশোনা করত, আহতদের সেবা করত, বা কিছু সময় পড়াশোনায় ব্যয় করত।

যদিও সাধারণ জনগণের অনেকেই তালেবান ফ্রন্টে জিহাদে অংশ নিয়েছিল, সবাইকে তালেবানের মৌলিক নীতিমালার অনুসরণ করতে হতো। অভিযান বা শত্রুর আকস্মিক হামলার সময় ছাড়া, মুজাহিদিনরা সাধারণত পড়াশোনায় নিয়োজিত থাকত। সিনিয়র তালেবান সদস্যরা নবীন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিত, আর সিনিয়র মৌলভীরা বয়োজ্যেষ্ঠ তালেবানদের ইসলামী জ্ঞান দিতেন। এইভাবে একজন সাধারণ, অশিক্ষিত মুজাহিদও দুই-তিন বছরের মধ্যে তালিব (ধর্মশিক্ষার্থী) হয়ে উঠতে পারত।

আমি নিজেও ফ্রন্টে এই দুই দায়িত্ব পালন করতাম–নিজে একজন শিক্ষক থেকে শিখতাম এবং অন্যদের পড়া-লেখার প্রাথমিক জ্ঞান দিতাম। আমরা সবাই পড়াশোনা করতাম, ফলে আমি আমার দ্বীনি শিক্ষা চালিয়ে যেতে পেরেছিলাম।

যারা পড়াশোনা করতে চাইত না, তারা অন্য কমান্ডারদের অধীনে গিয়ে শুধু যুদ্ধ করত। সব ফ্রন্টেই এভাবে চলত না, তবে আমরা ছিলাম তালেবান এবং এটাই ছিল আমাদের পথ। আমরা চাইতাম পবিত্র থাকা, পাপ এড়িয়ে চলা, এবং আমাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণে রাখা।

*****

আমি প্রায় এক বছর তালেবান ফ্রন্টে মোল্লা মোহাম্মদ সাদিক আখুন্দের অধীনে কাটিয়েছিলাম, যখন আমাকে পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো। মোল্লা বুর মোহাম্মদ, যিনি মুজাহিদ হিসেবে মোল্লা বুরজান নামে পরিচিত ছিলেন, একটি ট্যাঙ্ক শেলের আঘাতে তার পায়ে গুরুতর জখম হয়েছিলেন। তিনি হাঁটতে পারতেন না, আর চিকিৎসা করানো ঝুঁকিপূর্ণ ও কঠিন ছিল। পাকিস্তান ও আন্তর্জাতিক রেড ক্রস সীমান্তে মোবাইল ক্লিনিক স্থাপন করেছিল, কিন্তু সেখানে পৌঁছাতে প্রায়ই কয়েক সপ্তাহ সময় লেগে যেত।

অনেক সময় গাড়ি ও ট্রাকগুলো পাহাড়ি পথ ও কাঁচা রাস্তায় ধীরগতিতে চলত। মুজাহিদিন, শরণার্থী এবং অন্যান্য লোকজন উটের পিঠে চড়ে সীমান্ত অতিক্রম করে পাকিস্তানে যেত এবং আবার আফগানিস্তানে ফিরত। আহত ও অসুস্থদেরও একইভাবে চামানে স্থানান্তর করা হতো। আজকের যোদ্ধারাও একই রাস্তায় পাকিস্তানে ফিরে যায় বিশ্রাম ও চিকিৎসার জন্য।

চোরাপথই ছিল আমাদের জন্য পাকিস্তানে যাওয়ার একমাত্র উপায়। যারা চামান-কান্দাহার মহাসড়ক দিয়ে সীমান্ত পার হতো, বিশেষ করে ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী পুরুষদের ধরে নিয়ে আফগান পুতুল সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলকভাবে ভর্তি করানো হতো। তবে শুধু মুজাহিদরাই নয়, এই বিপজ্জনক পাহাড়ি পথে অনেকেই যেত–বেসামরিক নাগরিক, পরিবার, বিদেশি ও সাংবাদিকরাও এই চোরাপথ ব্যবহার করত।

আমি মোল্লা বুরজানের সাথে নেলঘামে দেখা করলাম, সেখান থেকেই আমাদের যাত্রা শুরু হয়। প্রায় ত্রিশ বছর বয়সী বুরজান ছিলেন শক্তিশালী ও সাহসী একজন ব্যক্তি, তার মুখে ঘন কালো দাড়ি। তাংগাই থেকে আমরা রেগ-এর পাহাড়ি পথ দিয়ে উটে চড়ে এগোতে থাকি। আমি আমাদের পাঁচজনের ছোট দলটি নেতৃত্ব দিচ্ছিলাম, ধীরে ধীরে সীমান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। সূর্য ডোবার আগেই মোল্লা মেহরাবের কাছের ফ্রন্ট থেকে আরও দুই মুজাহিদ আমাদের সঙ্গে যোগ দিল।

মোল্লা খানজরিয়ার ছিলেন একজন ভালো মুজাহিদ, যিনি মাহালাজাতের একটি ছোট ফ্রন্টে যুদ্ধ করতেন। রাশিয়ানদের সাথে এক যুদ্ধে শহীদ হওয়ার পর তার ভাই তার স্থলাভিষিক্ত হন। তবে খানজরিয়ার পরে তার ভাইদের পথ থেকে সরে গিয়ে একটি অস্ত্র পাচারকারী দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তারা একটি উটে মাল বোঝাই করে আমাদের সাথে সীমান্ত পার হচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলেও তারা কখনো বলেনি তাদের উটে কী ছিল।

শেষে আমরা "দো লারে" নামের একটি জায়গায় পৌঁছাই। মাত্র দুই দিন আগে রুশরা সেখানে একটি হামলা চালিয়ে ৩০ জনকে শহীদ করেছিল এবং সাতটি উট মেরে ফেলেছিল। আমি নিশ্চিত ছিলাম, আশপাশে রুশ বাহিনী রয়েছে এবং আমরা যদি প্রস্তুতি না নিই, তাহলে আমরাও একই ফাঁদে পড়ব। কিন্তু আমাদের সাথে কোনো অস্ত্র ছিল না। অন্য কোনো চোরাপথ ধরলে যাত্রা কয়েক দিন বাড়ত, আর মোল্লা বুরজান গুরুতর আহত ছিলেন।

রুশদের হামলার খবর আমাদের কাফেলার সবাইকে ভীষণ চিন্তিত করে তোলে। পেছনে ফিরে যাওয়া সম্ভব ছিল না, আর সামনেই ছিল রুশ বাহিনীর ফাঁদ। তখন আমাদের সাথে প্রায় ত্রিশ বা চল্লিশ জন মানুষ ছিল, কিন্তু কারো কাছেই কোনো অস্ত্র ছিল না। যখন আমরা অন্ধকারে হাঁটছিলাম, ঠিক তখন মৌলভী খানজরিয়ারের এক ভাই আমার কাছে এসে বললেন, তাদের উটে একটি আরপিজি এবং পাঁচটি কালাশনিকভ আছে। তিনি বললেন, "আমরা তোমাদের তিনটি কালাশনিকভ ও একটি আরপিজি দেব, আর বাকি দুটি আমাদের কাছে থাকবে।"

আমি মনে করলাম, এটি ভালো খবর, এবং তাকে তাড়াতাড়ি করতে বললাম। সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছিল এবং আমাদের সামনে কী আছে, তার জন্য প্রস্তুতি নিতে হতো। তারা তাদের উট থামিয়ে অস্ত্রগুলো নামিয়ে আমাদের হাতে তিনটি কালাশনিকভ ও আরপিজি লাঞ্চার তুলে দিল। যখন লোকেরা অস্ত্রগুলো দেখল, অনেকেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

আমি তখন একটি পরিকল্পনা তৈরি করলাম। মৌলভী খানজরিয়ারের ভাইদের বললাম—আমরা ভাগ হয়ে যাব। আমি আমার বন্ধুদের নিয়ে অধিকাংশ লোকদের একটি ছোট পাশর্^বর্তী পথ দিয়ে নিয়ে যাব, আর তিনি ও তার দল অন্য একটি পথ নেবেন।

আহত এবং বয়স্করা আমাদের থেকে কিছুটা দূরে থেকে চলছিল, যাতে এম্বুশ হলে তারা দ্রুত পেছনে সরে যেতে পারে অথবা রুশ বাহিনীকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য অন্য কোনো পথ খুঁজে নিতে পারে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ রুশরা প্রায়ই সংঘর্ষের সময় 'রক্সানা' ব্যবহার করত—এগুলো ছিল উজ্জ্বল ফ্লেয়ার, যা রাতকে দিনে পরিণত করে ফেলত এবং সবাইকে লক্ষ্যে পরিণত করত।

যখন আমরা সামনে থাকা এম্বুশ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, তখন পাকিস্তান থেকে আফগানিস্তানে প্রবেশ করা একটি কাফেলাকে আমাদের থেকে এক কিলোমিটার দূরে আক্রমণ করা হলো। আমরা আরপিজির হুইসেল শব্দ ও মেশিনগানের গুলির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। রক্সানাগুলোর আলো চারপাশকে এক উজ্জ্বল গ্রীষ্মের দিনের মতো করে তুলেছিল। আকাশে হেলিকপ্টার ঘুরছিল, আর যখন রক্সানা ছোড়া হতো, তখন সেগুলো নিচে নেমে এসে মাটি স্ক্যান করত। আমরা গুল্ম ও মরুভূমির ঝোপঝাড়ের নিচে লুকিয়ে পড়লাম এবং প্রার্থনা করছিলাম যে রাতের অন্ধকার আমাদের ঢেকে রাখবে। আমরা সেখানেই অপেক্ষা করছিলাম, যতক্ষণ না যুদ্ধ থেমে যায়।

যুদ্ধ শেষ হলে আমরা আবার একত্রিত হয়ে একটি ভিন্ন পথ ধরে চলতে থাকলাম, যাতে সেই হামলা-স্থল এড়িয়ে যেতে পারি। ভোরে আমরা টাঙ্গির পাহাড়ে পৌঁছালাম। পাহাড়ের পাদদেশে কুচি জনগণ কূপ খনন করেছিল। সূর্য ওঠার সময় আমরা একটি কুচি শিবিরে পৌঁছালাম। গ্রামের নাম ছিল 'শিন আকা' , যা ছিল কিছু তাঁবু ও

কয়েকটি ঘরের সমন্বয়ে গঠিত। আমাদের কাফেলা ভাগ হয়ে বিভিন্ন ঘরে বিশ্রামের জন্য ছড়িয়ে পড়ল। কুচিরা আমাদের খুব আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা করেছিল—খাবার ও পানি দিয়েছিল। সূর্যাস্তের পর আমরা নাইয়েব ওয়ালি হয়ে চামানের দিকে রওনা দিলাম। বাম বুল তান্নার কাছে আরেকটি এম্বুশের খবর পেলাম, তাই আমরা এক দীর্ঘ পথ ঘুরে সেটিকে এড়িয়ে চললাম।

অবশেষে নিরাপদে চামানে পৌঁছানোর পর, মনে হচ্ছিল যেন পুরো যাত্রায় কিছুই ঘটেনি, আর যেই ভয় আমাদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল, তা যেন অতীতের এক আবছা স্মৃতি মাত্র।

আমি তাড়াতাড়ি মোল্লা বুরজানকে ক্লিনিকে নিয়ে গেলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার ক্ষত ইতোমধ্যে সংক্রমিত হয়ে গিয়েছিল। যদিও তাকে কোয়েটার রেড ক্রস হাসপাতাল পর্যন্ত নেওয়া হয়েছিল, তিনি দ্রুতই শহীদ হন।

এরপর আমার আর কিছুই করার ছিল না—আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমার পরিবারের সঙ্গে দেখা করব। আমি প্রথমে পানজপায়ি গেলাম, কিন্তু সেখানকার মানুষরা জানাল যে আমার পরিবার কোয়েটায় চলে গেছে। আমি রাতটা সেখানে কাটিয়ে পরদিন কোয়েটার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। তখন ১৯৮৪ সালের গ্রীষ্মকাল, আর আমি আফগানিস্তানে ছিলাম পুরো তেরো মাস।

আমার পরিবার আমার কাছ থেকে কিছুই শোনেনি সেই দিন থেকে, যেদিন আমি জিহাদে যোগ দিতে ঘর ছেড়েছিলাম। কিন্তু আমাদের পুনর্মিলনের আনন্দ এতটাই বেশি ছিল যে, তারা আমার অনুমতি না নিয়ে চলে আসার রাগটুকুও ভুলে গিয়েছিল।

LESSONS FROM THE ISI

কোয়েটা এক বছরে অনেক বদলে গিয়েছিল। যারা আগে শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে থাকত, তাদের অনেকেই এখন শহরে চলে এসেছে। আমার পরিবার আমাকে ফিরে পেয়ে খুশি হলেও, তারা চিন্তিত ছিল—ভাবছিল যে আমি আবার আফগানিস্তানে ফিরে গিয়ে যুদ্ধ শুরু করে দেব।

তারা আমাকে পাকিস্তানে থেকে যাওয়ার এবং পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল। আমি নবম শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিই এবং ক্লাস শুরু করি। পরবর্তী নয় মাস আমি মূলত স্কুল এবং স্থানীয় মসজিদেই সময় কাটাই। শিক্ষাবর্ষের শেষে আমি দশম শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হই।

তবু আমার ইচ্ছা ছিল ইসলামি শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার, তাই আমি কোয়েটায় থাকা একদল ছাত্রের সঙ্গে যোগ দিই, যারা মৌলভী আবদুল কাদির নামে একজন শিক্ষকের কাছে পড়ত। তিনি কন্দাহারি মসজিদের সঙ্গে যুক্ত একটি মাদ্রাসা খোলেন, এবং তার ক্লাস করাতেন সেরিয়াব রোডের বার্মা হোটেলের একটি সাদামাটা ঘরে। তখন মৌলভী কাদির ছিলেন একজন তরুণ, হালকা বাদামী চুল আর গাঢ় বর্ণের অধিকারী, সবসময় সাদা পাগড়ি পরতেন। আমি আজও আমাদের প্রথম সাক্ষাতের কথা মনে করতে পারি।

ধর্মীয় ছাত্র হিসেবে শিক্ষককে বিভিন্নভাবে সেবা দেওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার—যেমন যাকাত সংগ্রহ করা, পশুর দেখভাল করা, খাবার প্রস্তুত করা ইত্যাদি। কিন্তু আমি যখন প্রথম মৌলভী কাদিরের সঙ্গে দেখা করি, তখন আমি স্পষ্টভাবে বলি—আমি এসব করব না। আমি পশু পালতে বা টাকা তুলতে আসিনি। আমি শর্ত দিতেই এসেছি, নিতে নয়। তিনি তখন হেসে ফেললেন এবং সরাসরি আমার চোখে তাকিয়ে বললেন, "জঈফ, তুমি যেসব কাজের কথা বলছ, সেগুলো আসলে তোমার জন্যই তৈরি। এভাবেই তুমি তোমার শিক্ষক এবং সহপাঠীদের খেয়াল রাখবে। এগুলো তোমারই করা উচিত। আমি যদি তোমাকে শেখাতে শ্রম দিই, তাহলে তোমার দায়িত্ব নয় কি আমাকে সেবা দেওয়া?"

আমি মৌলভী কাদিরের অধীনে পড়াশোনা করে খুব উপভোগ করছিলাম এবং তাতে ভালো ফল করছিলাম। পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে চেয়েছিলাম বলে আমি আমার মুজাহিদিন বন্ধুদের কাউকেই জানাইনি আমি কোথায় আছি, আড়ালেই থেকেছি।

তিন মাস পর মীর হামজা এবং আরও কিছু বন্ধু মসজিদে এল এবং আমরা আফগানিস্তানের পরিস্থিতি ও চলমান জিহাদ নিয়ে আলোচনা শুরু করলাম। তখন ১৯৮৪ সাল, এবং সোভিয়েতরা নিয়মিতভাবে আমাদের সঙ্গে লড়াই করত কিংবা মুজাহিদিন ঘাঁটিগুলোর ওপর বড় ধরনের হামলা চালাত। আমাদের সংখ্যা বেড়েছিল, কিন্তু যুদ্ধ জয়ের সম্ভাবনা তখনো দূরে ছিল।

আমার বন্ধুরা আমাকে পড়াশোনা ছেড়ে আবার ফ্রন্টে ফিরে যেতে বোঝাতে লাগল। মৌলভী আবদুল কাদির এতে একেবারেই রাজি ছিলেন না, কিন্তু আমার বন্ধুরা হাল ছাড়ছিল না। আমাদের মধ্যে উত্তপ্ত বিতর্ক শুরু হলো—ফিরে যাওয়ার কারণ নিয়ে, জিহাদের দায়িত্ব নিয়ে, আর দক্ষিণে মুজাহিদিনদের সঙ্গে রাশিয়ান বাহিনীর সাম্প্রতিক যুদ্ধ নিয়ে।

মৌলভী কাদির জিহাদের বিরোধিতা করতেন না। তিনি জিহাদে বিশ্বাস করতেন এবং যারা এতে যোগ দিতে চায়–আমার মতো তরুণদেরও–তাদের সমর্থন করতেন। তবে কয়েক মাসের মধ্যেই আমাদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল এবং তিনি আমার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন–ভেবেছিলেন আমি হয়তো শহিদ হয়ে যাব। শেষ পর্যন্ত, আমার বন্ধুরা তাকে বোঝাতে সাহায্য করল যে আমাকে ফিরে যেতেই হবে। এর কিছুদিন পরই আমরা রওনা দিলাম। মৌলভী আবদুল কাদির আমাদের সঙ্গে সীমান্ত পর্যন্ত কিছুদূর হেঁটে গেলেন, আমাদের জন্য দোয়া করে তারপর মাদ্রাসায় ফিরে গেলেন।

আমি আমার পরিবারকে আমার পরিকল্পনার কিছুই বলিনি। আগেরবার ফিরে আসার পর তারা অনুরোধ করেছিল যেন আমি আর ফিরে না যাই। তারা বলেছিল, আমি চাইলে বাড়ি পাব, স্ত্রী পাব, ব্যবসা করতে পারব–শুধু যদি পাকিস্তানে থেকে যাই। কিন্তু আমার মন ছিল যুদ্ধে ফেরার জন্য ব্যাকুল, আমার দেশের ডাক আমি উপেক্ষা করতে পারিনি।

আমাদের ছোট্ট মুজাহিদিন দল জঙ্গাল ক্যাম্পে গেল এবং হাজি করিম খানের বাড়িতে উঠল, যিনি আমাদের ফ্রন্ট পরিচালনা করতেন। আমরা আফগানিস্তানে ফেরার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম।

মোল্লা মোহাম্মদ সাদিক ছিলেন আমাদের ফ্রন্টের কমান্ডার, আর করিম খান ছিলেন ব্যবস্থাপক। করিম খান মূলত মাঠপর্যায়ে যা হতো, তার সবকিছুর দায়িত্বে ছিলেন–তিনি দ্বিতীয়-শ্রেণির নেতা ছিলেন–আর মোল্লা মোহাম্মদ সাদিক ছিলেন আসল কমান্ডার। তিনি সাধারণত অর্ধেক সময় ফ্রন্টে, আর বাকিটা সময় পাকিস্তানে থাকতেন।

একটি ফ্রন্ট পরিচালনা করা ছিল খুব জটিল। সফলভাবে একটি দল পরিচালনা করতে হলে উভয় দেশেই কাজ করতে হতো। অন্যান্য মুজাহিদিন গোষ্ঠী এবং রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলা ও বজায় রাখা হতো অর্থ ও রাজনৈতিক সমর্থনের জন্য। আর কন্দাহারে চলমান যুদ্ধ নির্ভর করত স্থানীয় নেতৃত্বের ওপর। দুই পক্ষ একত্রে কাজ করত: অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহ করা, যোগাযোগ রক্ষা করা, পরিবহন সংগঠিত করা, নতুন মুজাহিদিনদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং প্রস্তুত করা।

জিহাদের শুরুর দিকে আমরা রুশ ট্যাংক ও হেলিকপ্টারের মোকাবিলা ভালোভাবে করতে পারতাম না, মিগ বা দূরপাল্লার বোমারু বিমান তো দূরের কথা। পাহাড়ি গিরিপথে নিচে নেমে আসা রুশ হেলিকপ্টারগুলো ছিল আমাদের জন্য বড় হুমকি। ১৯৮০-এর দশকের শুরুতে আইএসআই (ISI) মুজাহিদিনদের জন্য একটি বিশেষ অস্ত্র প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করেছিল। আমাদের বলা হয়েছিল, এই নতুন অস্ত্রের সাহায্যে আমরা রুশ ট্যাংক ধ্বংস করতে পারব এবং আকাশ থেকে তাদের হেলিকপ্টার নামিয়ে আনতে পারব।

মোল্লা মোহাম্মদ সাদিক আমাদের ফ্রন্ট থেকে আমাকে এবং আরও কয়েকজন মুজাহিদকে প্রশিক্ষণ নিতে পাঠানোর জন্য বেছে নিলেন। আমরা কোয়েটায় সাইয়্যাফের অফিসে গেলাম, যেখানে দক্ষিণ-পূর্ব আফগানিস্তানের দায়িত্বে থাকা কমান্ডার আবদুল্লাহ আমাদেরকে পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

মোল্লা মোহাম্মদ সাদিক তখন সদ্য প্রতিষ্ঠিত সাইয়্যাফের ইত্তেহাদ-ই-ইসলামির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। আমাদের ফ্রন্ট আগে মৌলভী নবি মুহাম্মদীর হারাকত-ই-ইনকেলাব-ই-ইসলামির সঙ্গে যুক্ত ছিল, কিন্তু সাইয়্যাফ ও তার নতুন দল তখন আইএসআইয়ের সঙ্গে প্রভাবশালী সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। এটা সবারই জানা ছিল যে, আইএসআইয়ের মাধ্যমে যে অস্ত্র, প্রশিক্ষণ ও সাহায্য দেওয়া হতো, তা প্রধানত সাইয়্যাফের মাধ্যমেই বিতরণ করা হতো।

পাকিস্তান ছিল আফগানিস্তানের থেকে অনেকটাই আলাদা। কান্দাহারে, ফ্রন্টে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আপনি কোন দলের তা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না; মুজাহিদিনরা একে অপরকে সাহায্য করত, দলে-উপদলে ভাগ না হয়ে। তালেবান এবং আধা-তালেবান ফ্রন্টগুলোর মধ্যে সহযোগিতা ছিল সাধারণ ও ভ্রাতৃসুলভ। তবে জিহাদের কিছু সময় পর গোষ্ঠীগত ও উপজাতিগত বিরোধ শুরু হয়; যেমন মোল্লা নকিবুল্লাহ ও সরকারতিব আত্তা মুহাম্মদের মধ্যে প্রায়শই সংঘর্ষ হতো। কিন্তু পাকিস্তান সীমান্তের এপারে গোষ্ঠীগত রাজনীতি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পাকিস্তানি সরকারি কর্মকর্তারা আমাদের সাইয়্যাফের অফিস থেকে ট্রাকে তুলে নিয়ে গেলেন। আমাদের ট্রাকের পেছনে গাদাগাদি করে বসানো হলো যেন আমরা বুঝতে না পারি কোথায় যাচ্ছি। তিন ঘণ্টার মতো গাড়ি চলল এবং আমরা সবাই ভাবলাম, নিশ্চয়ই কোনো গোপন পাহাড়ি ঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু যখন ট্রাক থেকে নামলাম এবং চারপাশ দেখলাম, আমরা সবাই জায়গাটি চিনে ফেললাম।

আমরা ছিলাম "ত্রাট" নামক একটি জায়গায়, যা পাশিন বাজার ও সুরখাব ক্যাম্পের মাঝে। পাশিন ডাব আলিজাই নদী বিল্ডিংটির সামনের দিকে বয়ে যাচ্ছিল এবং এর পেছনে একটি সরু ধারা সুরখাব ক্যাম্পের পাশ দিয়ে পাশিন রাস্তা ধরে পাশিন শহরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

মোল্লা মোহাম্মদ সাদিক আমাদের ফ্রন্ট থেকে বারো জনকে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু “ত্রাট” -এর সেই উঠোনে তখন আশিটিরও বেশি মুজাহিদিন উপস্থিত ছিল। প্রশিক্ষকেরা পাঠ দিতেন পশতু ভাষায়, তাই আমাদেরকে উত্তরের দারি ভাষাভাষী মুজাহিদিনদের জন্য অনুবাদ করে দিতে হতো, যারা পশতু বুঝত না।

প্রশিক্ষণ শুরু হলো পরদিন। প্রথম যে অস্ত্রটি আমরা ব্যবহার শিখলাম সেটি ছিল BM12, একটি মাল্টিপল রকেট লঞ্চার। এই ভূমি-স্থাপনযোগ্য অস্ত্রব্যবস্থা ১০৭ মিমি রকেট ৮ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত ছুড়তে পারত। এটি চীনে তৈরি অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি একটি হালকা এবং কার্যকরী অস্ত্র ছিল।

প্রশিক্ষণ কোর্সে দুটি অংশ ছিল—একটি তাত্ত্বিক, আরেকটি ব্যবহারিক। তাত্ত্বিক অংশটি শ্রেণিকক্ষে হতো, যেখানে অস্ত্র ব্যবহারের মৌলিক কৌশল, রক্ষণাবেক্ষণ, বিভিন্ন যন্ত্রাংশের পরিচিতি, লক্ষ্য নির্ধারণের সমস্যা, দূরত্ব ও আঘাত নিরূপণ বিষয়ে পাঠ দেওয়া হতো। আমরা প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ক্লাস করতাম। বিকেলে আমি সেই দিনের পাঠ পড়তাম বা পুনরাবৃত্তি করতাম। তাত্ত্বিক অংশ চলল দশ দিন, তারপর আমরা অস্ত্র হাতে নেওয়ার সুযোগ পেলাম।

আমরা অস্ত্রগুলো আগেই দেখে ফেলেছিলাম এবং সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে প্রতিটি দিক বোঝার চেষ্টা করছিল। আমরা জানতাম, ত্রাট-এ আমরা যা শিখছি তা ভবিষ্যতের যুদ্ধে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আমাদের জিহাদের সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে।

ব্যবহারিক অংশে আমাদের ১০ থেকে ১২ জনের দলে ভাগ করে দেওয়া হলো এবং প্রতিটি দলকে একটি করে অস্ত্র দেওয়া হলো। আমরা ট্রাইপড বসালাম, তারগুলি ঠিক করলাম, লক্ষ্য স্থির করলাম এবং বাতাস ও অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদানের প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে লক্ষ্য নির্ধারণ করলাম।

BM12-র পর আমরা BM14 সম্পর্কে শিখলাম। প্রাথমিক প্রশিক্ষণ চলল এক মাস। এরপর আবার আমাদের একটি ট্রাকে তুলে নতুন এক স্থানে নিয়ে যাওয়া হলো। ছয় ঘণ্টার যাত্রার পর ভোরবেলা ট্রাক থামল। ট্রাক থেকে নামতেই দেখি আমরা বিশাল এক মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে আছি, সামনে কিছু কিলোমিটার দূরে আকাশ ছুঁয়ে থাকা একটি পাহাড়ি এলাকা। পুরো জায়গাটি বিরান, আশপাশে কোনো ঘরবাড়ি বা বাগান নেই—শুধু কয়েকটি ব্যারাক যেগুলো দেখতে সামরিক ঘাঁটির মতো।

প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে, উত্তরের পাহাড়ে আমরা একটি সাদা বর্গাকৃতির বস্তু দেখতে পেলাম। ব্যারাকগুলোর বাইরেও কিছু BM41, BM12 এবং কিছু রকেট মাটিতে পড়ে ছিল। পাকিস্তানি প্রশিক্ষকেরা বিল্ডিংয়ের সামনে একটি বেঞ্চে বসে ছিলেন।
আমাদের সারি বেঁধে দাঁড়াতে বলা হলো। প্রশিক্ষকেরা জানালেন, আমরা এখন এই অস্ত্রগুলো ব্যবহার করে প্রথমবারের মতো বাস্তব প্রশিক্ষণে অংশ নেব। তারা বলল, এই অস্ত্রগুলোই আমাদের সাহায্য করবে রুশ হেলিকপ্টার ও ট্যাংক ধ্বংস করতে।

হেরাত, কুন্দুজ, জালালাবাদ, গার্দেজ ও কাবুল থেকে আগত মুজাহিদিনদের অন্যান্য দলও সেখানে ছিল। প্রতিটি দলই অস্ত্রটি পরিচালনা করেছিল—প্রথমে যন্ত্রপাতি নিজেদের কাঁধে বহন করে, তারপর সেটি সেট আপ করে এবং শেষে প্রয়োজনে লক্ষ্য ঠিক করে দু'বার ফায়ারিং করেছিল। আমাদের প্রশিক্ষকরা গত কয়েক সপ্তাহের প্রশিক্ষণে শেখানো তিনটি মূল বিষয় আবারো স্মরণ করিয়ে দিলেন: অস্ত্রের স্থাপন ও প্রস্তুতি, প্রজেক্টাইলগুলোর পালিশ ও লোডিং, এবং ফায়ারিং মেকানিজমের লক্ষ্য নির্ধারণ ও বাস্তব পরিচালনা।

আমরা অংশ নেওয়া তৃতীয় দল ছিলাম এবং দ্রুত অস্ত্র সেট আপ করার মধ্য দিয়ে শুরু করলাম। আমার দায়িত্ব ছিল ট্রাইপড, অপটিক্যাল এম এবং স্পিরিট লেভেল মিটারের। কমান্ড পাওয়ার পর আমরা অস্ত্র ফায়ার করলাম, কিন্তু লক্ষ্য থেকে দশ মিটার দূরে পড়ল। দ্বিতীয় শটটি ছিল পাহাড়ের পাদদেশে থাকা দূরের লক্ষ্যের দিকে। আমরা অস্ত্রটি আনপ্যাক করলাম, সেট আপ করলাম এবং ফায়ার করলাম। এবারও আমরা লক্ষ্য ভুলে গেলাম, এবং আসলে কুন্দুজ দলই একমাত্র সফলভাবে টার্গেটে আঘাত করতে পেরেছিল। বাকি সব দলই ব্যর্থ হয়েছিল; হেরাত দলের ছোড়া রকেট তো পাহাড় ডিঙিয়ে চলে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় অনুশীলন রাউন্ড শেষে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়। ফলাফল নিয়ে আমি তেমন খুশি ছিলাম না, এবং আরও অনেকেই আমাদের ব্যর্থতায় হতাশ হয়েছিল। কোয়েটা ফেরার পথে ট্রাকের গাদাগাদি করে বসা অবস্থায় আমরা এটা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। কোয়েটায় পাকিস্তানি কর্মকর্তারা আমাদের হাফিজুল্লাহ আখুন্দজাদার ফ্রন্টের জন্য একটি বিএম১২ এবং মোল্লা মোহাম্মদ সাদিক আখুন্দের জন্য একটি বিএম১ দিলেন।

আমি চামানের বুগরা ক্যাম্পে যাত্রারত চৌত্রিশ জন মুজাহিদিনের একটি দলে যোগ দিলাম। এটি কান্দাহারের রুটে প্রথম স্টপ ছিল, এবং সাধারণত মুজাহিদিনরা আফগানিস্তানের দিকে শনা নারাই কোসে যাওয়ার আগে এখানে জড়ো হত। আবু খাবিবের নেতৃত্বে একটি আরব-অর্থায়িত সংগঠন থেকে আমাদের একটি ট্রাক্টর দেওয়া হয়েছিল। ক্যাম্পে অস্ত্রের মজুদ ছিল এবং আমরা ট্রাক্টরের ট্রেলি বোঝাই করলাম। আমাদের মধ্যে তেইশজন ট্রেলিতে উঠে পড়লাম এবং আফগানিস্তানের দিকে রওনা দিলাম। কিছুক্ষণ পর মোল্লা আবদুল ঘানি বালা ঝালাইয়ের আরেকটি ট্রাক্টর আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়।

আমাদের ফ্রন্টের কিছু সদস্য মোল্লা আবদুল ঘানির দলের অন্যদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল, এবং আমরা একসাথে যাত্রা অব্যাহত রাখলাম। দুই দিন পর আমরা ওয়ান্দুজে পৌঁছলাম, যেখানে দিনের বেলা বিশ্রাম নিলাম। আসরের

নামাজের আগে আমরা করম খান ও মোল্লা ওয়ালি মোহাম্মদকে তাদের মোটরবাইকে করে আমাদের আগে পাঠালাম। তাদের আদেশ ছিল সামনের রাস্তায় কোনো সম্ভাব্য এম্বুশ বা সমস্যা আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা। বাকি দলটি দুটি ট্রাক্টর নিয়ে তাদের পিছু নিল। সূর্যাস্তও হয়নি তখন, তবু আমরা আবার এগিয়ে যাওয়া শুরু করলাম। আফগানিস্তানে প্রবেশ করা বিপজ্জনক ছিল, তাই আমরা সাধারণত রাতের আড়ালেই চলাচল করতাম। আমরা হাবিব কালা অতিক্রম করলাম এবং আসফাল্ট রোড পার হলাম। সুলতান মোহাম্মদ খান কারিজে পাথর ও শিলা দিয়ে রাস্তা অবরুদ্ধ করা ছিল।

একজন লোক রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। সে আমাদের বলল, রাশিয়ানরা কিছুক্ষণ আগেই ট্যাংক ও ট্রান্সপোর্টার নিয়ে এ পথ দিয়ে গেছে। তারা ঠিক তোমাদের পরিকল্পিত রুটেই গেছে, সে বলল। সামনে কোনও এম্বুশ থাকতে পারে। মোল্লা আবদুল ঘানি নিশ্চিত ছিলেন যে, যেহেতু করম খান ও তার সঙ্গী একই পথে গিয়েছিলেন, সামনে যদি কোনও এম্বুশ থাকত তাহলে তারা ফিরে এসে আমাদের সতর্ক করতেন। আমি একমত হলাম না; তারা ফিরে আসেনি তার অনেক কারণ থাকতে পারে। তাদের গুরুতর সমস্যা হতে পারে বা তারা নিহতও হয়ে থাকতে পারেন। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে সামনে একটি এম্বুশ আছে, এবং আমরা দীর্ঘ তর্কে জড়িয়ে পড়লাম। কিন্তু মোল্লা ঘানিই ছিলেন কমান্ডে, এবং তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে আমরা আমাদের পথে এগিয়ে যাব। আমার সহিত পাঁচ জন মুজাহিদিনের একটি ছোট দল বাকিদের আগে হেঁটে চললাম। আমাদের সঙ্গে ছিল চারটি কালাশনিকভ ও একটি আরপিজি।

সুলতান মোহাম্মদ খান কারিজ থেকে আমরা গারাই কারিজের দিকে রওনা দিলাম। গ্রামের কাছে ভূগর্ভস্থ কারিজের একটি ছোট পানির হাউজে আমরা থামলাম। আমি চারদিকে তাকাতে তাকাতে কিছু পানি পান করার জন্য হাঁটু গেড়ে বসলাম। ঝোপ ও গাছের ডালে ঝুলছিল ছিঁড়ে যাওয়া পাগড়ি ও কাপড়ের টুকরো। মাটি বারুদের কালো দাগে ঢাকা, চারদিকে শুকনো রক্তের গাঢ় দাগ ও পুড়ে যাওয়া মানবদেহের টুকরো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। তখন রাত প্রায় একটার দিকে, চারদিকে যেন নিস্তব্ধতা ঘিরে ছিল।

পানির ধারে হাঁটু গেড়ে বসে আমার মাথা ঘুরছিল, মনে হচ্ছিল যেন আমি স্বপ্ন দেখছি। মাত্র দুই দিন আগে, হাজি বাবাইয়ের তেইশজন যোদ্ধা এখানে রাশিয়ানদের একটি এম্বুশে শাহাদাতবরণ করেছিলেন। আমি উঠে দাঁড়াতেই কয়েক পা যেতেই দুটি পিকে ট্রেসার বুলেট আমার কানের পাশ দিয়ে শিস দিয়ে বেরিয়ে গেল। আরও এক ঝাঁক গুলিবর্ষণ শুরু হলো। নাজার মোহাম্মদ ও মীর হামজা গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। আরেকটি পিকে বুলেট আমার কোমরের নিচে বিদ্ধ হলো। রাশিয়ানরা রোশনন্দাজ ও আরপিজি নিক্ষেপ করছিল; আমাদের চারপাশে গ্রেনেড ও বোমা বিস্ফোরিত হচ্ছিল; ধোঁয়া ও ধুলোয় আকাশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। এক মুহূর্তে মনে হচ্ছিল যেন কিয়ামত নেমে এসেছে। নাজার মোহাম্মদ ও মোল্লা মীর হামজা শাহাদাতবরণ করেছিলেন, কিন্তু আমি জানতাম তাদের সঙ্গে দুটি আরপিজি গ্রেনেড ছিল। আমার কাছে ছিল তৃতীয়টি, এবং আরেকটি ছিল মোল্লা নাসরুল্লাহর কাছে। শাহ ওয়ালি আমাদের ট্রাক্টরটি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন; তিনিও শাহাদাতবরণ করলেন। মোল্লা আবদুল ঘানি ও আবদুল গফফার আহত হয়েছিলেন। আমার কোমর থেকে রক্ত ঝরছিল। আমি আশেপাশের গ্রামের একটি ছাদের উপর রোশনির দিকে আমার রকেট নিক্ষেপ করলাম। রকেটটি একটি বাড়ির ছাদে আঘাত

করতেই পুরো গ্রামটিতে আলো ছড়িয়ে পড়ল। আগুনের লেলিহান শিখা আকাশে উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি মাথা নিচু করে আরেকটি আরপিজি তুলে নিলাম।

রাশিয়ানরা আমাদের থেকে মাত্র কয়েক মিটার দূরে ছিল; তাদের সব গ্রেনেড আমাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে বিফল হয়েছিল। আমার রকেটটি বাড়িতে আঘাত হানার পর তারা সঙ্গে সঙ্গে গুলিবর্ষণ বন্ধ করে দিল। চারদিক অন্ধকার, আগুনের লেলিহান শিখা কমে এসেছিল এবং আমরা এই সুযোগে পিছু হটলাম। আমরা মাত্র দশ থেকে পনেরো মিটার পিছনে সরে গেছি, এমন সময় রাশিয়ানরা আবার আমাদের উপর গুলি চালালো; আমরা আবার মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম, পিছনে গড়িয়ে একটি খাদে গিয়ে ঠেকলাম। আমরা একে অপরের দিকে তাকিয়ে গভীর শ্বাস নিলাম। আমাদের শাহাদাতপ্রাপ্ত সঙ্গীরা আমাদের পাশেই নিথর হয়ে পড়ে ছিলেন, আর আমরা আমাদের কালাশনিকভ দিয়ে পাল্টা গুলি চালাতে লাগলাম। রাশিয়ানরা তখনও গুলি চালিয়ে যাচ্ছিল এবং এগিয়ে আসতে শুরু করেছিল। আমাদের কাছে তখন শুধু একটি কালাশনিকভ বুলেটের বাক্স এবং একটি আরপিজি অবশিষ্ট ছিল। আমি লক্ষ্য করলাম, গ্রামের বাড়িগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ট্যাংক দেখা যাচ্ছে এবং আমি সেখানে আমার আরপিজি তাক করলাম যেখানে আমি মনে করলাম সেগুলো আছে। আগুন ও ধোঁয়া উপরে উঠে গেল এবং রাশিয়ানরা আবার গুলি বন্ধ করে দিল। আমরা আমাদের অবস্থান থেকে ছুটে বেরিয়ে এলাম, যত দ্রুত সম্ভব এম্বুশের স্থান থেকে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। আমরা জানতাম না ট্রাক্টর এবং পিছনে থাকা লোকদের কী হয়েছে। কয়েকশ মিটার দৌড়ানোর পর আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। আমি প্রচণ্ড রক্তপাত করছিলাম এবং আর এক পা-ও নড়তে পারছিলাম না।

আমি মোল্লা নাসরুল্লাহর দিকে ফিরে তাকে বললাম যে আমি আর নড়তে পারছি না। তাকে বললাম, আমার জন্য নিরাপদ স্থানে যাওয়ার ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। আমি তাকে বললাম আমার জন্য একটি কালাশনিকভ রেখে যেতে এবং যত দ্রুত সম্ভব দৌড়ে পালাতে। আমি পিছনে থেকে রাশিয়ানদের সাথে লড়াই করব, যতক্ষণ না আমি শাহাদাতবরণ করি। আমি তাকে বুঝাতে শুরু করেছিলাম যে আমি কিছুতেই রাশিয়ানদের হাতে বন্দী হতে পারি না, এমন সময় সে আমার কোমর ধরে আমাকে তার কাঁধে তুলে নিল, অন্য হাতে তার কালাশনিকভ নিয়ে।

মোল্লা নাসরুল্লাহর কাঁধে ঝুলে থাকার সময় মনে হচ্ছিল যেন সময় স্থির হয়ে গেছে। যখন আমরা শেষ পর্যন্ত ট্রাক্টরের কাছে পৌঁছলাম, এর ইঞ্জিন তখনও চলছিল, ড্রাইভার এবং অন্যান্য মুজাহিদিনরা এটি ফেলে পালিয়েছিল। মোল্লা নাসরুল্লাহ জানতেন না কিভাবে ট্রাক্টর চালাতে হয়, তাই আমি তাকে আমাকে ড্রাইভারের সিটে বসাতে বললাম। সে আমাকে বসিয়ে দিতেই, আমাদের পিছু নেওয়া রাশিয়ানরা গুলি চালাল। রোশনন্দাজের আলোতে আমরা আবার অন্ধ হয়ে গেলাম, এবং আল্লাহর রহমতে আমি কোনভাবে ট্রাক্টর ঘুরিয়ে পালানোর শক্তি পেলাম। পথে অন্য যারা রাশিয়ানদের থেকে পালাচ্ছিল, তাদের তুলে নিলাম। যখন আমরা শেষ পর্যন্ত সুলতান মোহাম্মদ কারিজে পৌঁছলাম, আমার শরীরের শেষ শক্তিটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেল, আর একটি পেশিও নাড়াতে পারলাম না।

কেউ একজন ট্রাক্টরের দায়িত্ব নিল এবং ভোর হওয়ার আগেই আমরা হাজি হাবিবের গ্রামে পৌঁছে গেলাম।

গ্রামে পৌঁছতেই গ্রামবাসীরা আমাদের বলল যে রাশিয়ানরা আমাদের পিছু নেবে এবং তাদের আসতে বেশি সময় লাগবে না। তারা আমাদের গ্রামের বাইরে কিছু ধ্বংসস্তূপের কাছে নিয়ে গেল, যেখানে আমরা গোলাবারুদ খালাস করলাম এবং সারাদিন লুকিয়ে থাকলাম। খালি ট্রাক্টরটি গ্রামে ফেরত পাঠানো হলো। একজন ডাক্তার এসে আমার ক্ষতস্থান ব্যান্ডেজ করলেন এবং ইনফেকশন প্রতিরোধের জন্য আমাকে ইনজেকশন দিলেন। ঠিক দুপুরের আগে, হেলিকপ্টারগুলো ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়ে উড়ে যেতে শুরু করল এবং আমরা দেখতে পেলাম ট্যাংকগুলো অবস্থান নিচ্ছে। রাশিয়ানরা গ্রামে ঢুকে ঘরে ঘরে তল্লাশি চালাল, আর ট্যাংকগুলো পশ্চিম ও উত্তর দিক থেকে ধ্বংসস্তূপের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

তারা আমাদের আস্তানা থেকে মাত্র কয়েকশ মিটার দূরে থেমে গেল। সবাই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, অস্ত্র সেট আপ করতে লাগল, আরপিজি প্রস্তুত করল এবং ম্যাগাজিন ক্লিপ সাজাতে লাগল। আমি নড়াচড়া করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার মাথা ঘুরছিল এবং ঠিকভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিছুক্ষণ পর আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

বিকেল গড়াতে গড়াতে আমার জ্ঞান ফিরল। কিছু মুজাহিদিন আমার পাশে বসে ছিলেন এবং আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম ট্যাংকগুলোর কী হয়েছে। তারা বলল যে ট্যাংকগুলো আর কাছে আসেনি, মাত্র এক-দুই ঘন্টা তাদের অবস্থান ধরে রেখে পরে সরে গেছে।

সন্ধ্যা নামতে না নামতে ট্রাক্টরটি গ্রাম থেকে ফিরে এল এবং অন্য মুজাহিদিনরা গোলাবারুদ বোঝাই করে আমাকে ট্রেলারে তুলে নিল। তারা আরেকজন ড্রাইভার খুঁজে পেল এবং আমরা হাজি হাবিবের গ্রাম পেছনে ফেলে কমান্ডার আবদুল রাজিকের ক্যাম্পের দিকে রওনা দিলাম, যা আমরা রাতের শেষভাগে পৌঁছলাম।

গেটের দিকে একটি ছোট ঢালু পথ উঠে গিয়েছিল, এবং পুরনো ট্রাক্টরটি তা পার হতে হিমশিম খাচ্ছিল যদিও আমি ছাড়া সবাই নেমে গিয়েছিল। যখন ট্রাক্টরটি পিছনের দিকে গড়াতে শুরু করল, ড্রাইভারও লাফিয়ে নেমে পড়ল। ট্রেলারটি বিচ্ছিন্ন হয়ে দ্রুত গতি পেতে লাগল। আমি তখনও নড়তে পারছিলাম না, তাই যখন এটি উল্টে গেল, আমি বাতাসে উড়ে গেলাম। ট্রেলারটির নিচে চাপা পড়া থেকে আমাকে বাঁচাল একটি আরপিজি বাক্স, যা ট্রেলারের একপাশে আটকে গিয়েছিল। অন্যরা দৌড়ে এসে আমাকে ট্রেলারের নিচ থেকে টেনে বের করল। আমি সবকিছু দেখতে পেয়েও নড়তে পারিনি।

আমাকে পাকিস্তানে ফেরত আনা হলো। আমি যেদিন রওনা দিয়েছিলাম, তার সাত-আট দিন পেরিয়ে গিয়েছিল।

BITTER PICTURES

যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে আফগানিস্তানে প্রায় ১ লক্ষ সোভিয়েত সৈন্য মোতায়েন ছিল। লাখ লাখ বেসামরিক মানুষ প্রতিবেশী দেশগুলোতে পালিয়ে যায় এবং প্রায় দশ লক্ষ মুজাহিদিন তাদের জীবন উৎসর্গ করেন। যুদ্ধের শেষ কয়েক বছর ছিল বিশেষভাবে নির্মম - সোভিয়েত ও আফগান সৈন্যদের বর্বরতা, বিমান হামলা এবং হাজার হাজার মুজাহিদিনের অংশগ্রহণে বিশাল যুদ্ধের মাধ্যমে চিহ্নিত।

এই যুদ্ধ ছিল জীবন-মরণ প্রশ্ন; প্রায়ই কেবল ভাগ্যের একটু ইতর-বিশেষই জীবন-মৃত্যুর ব্যবধান নির্ধারণ করত। আমি রাশিয়ানদের এম্বুশে নয়বার পড়েছি, যুদ্ধরত অবস্থায় এবং পাকিস্তানে যাতায়াতের সময়। আটবার আল্লাহ আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন, মাত্র একবার আমি গুরুতর আহত হয়েছিলাম। খুশাবের যুদ্ধে একটি বোমা বিস্ফোরণে আমি বাতাসে উড়ে গিয়েছিলাম ঠিক সেই স্থান থেকে যেখানে এক সেকেন্ড পরে গুলিবৃষ্টি হয়েছিল। নেলঘামে একটি মর্টার বিস্ফোরণে আমার দুই সহযোদ্ধা শাহাদাতবরণ করেছিলেন, যা আমি অল্পের জন্য এড়িয়ে যেতে পেরেছিলাম; রাশিয়ানরা একটি দুর্গে রেখে যাওয়া মর্টার গোলাগুলিতে ফাঁদ পেতে রেখেছিল। যদিও বিস্ফোরণের সময় আমি মাত্র কয়েক মিটার দূরে দাঁড়িয়েছিলাম, তবু আমার শরীরে একটি ক্ষতও ছিল না।

আমি প্রথমে জিহাদে যোগ দিয়েছিলাম যখন আমার বয়স ছিল মাত্র পনেরো বছর। আমি তখন কালাশনিকভ চালানো বা লোকদের নেতৃত্ব দেওয়া কোনটাই জানতাম না। যুদ্ধ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। কিন্তু রাশিয়ান ফ্রন্টলাইন ছিল একটি কঠিন পরীক্ষাক্ষেত্র এবং - বিভিন্ন সময়ে - আমি শেষ পর্যন্ত আবাসাবাদ, মাহালাজাত, আর্ঘান্দাব, খুশাব এবং সানজারিতে বেশ কয়েকটি মুজাহিদিন গ্রুপের নেতৃত্ব দিয়েছিলাম।

অনেকবার আমরা রাশিয়ান বাহিনী দ্বারা ঘেরাও হয়েছিলাম, যেমনটি একবার মাহালাজাতে ঘটেছিল। রাশিয়ানরা আমাদের ফাঁদে ফেলেছিল, একাধিক ওভারল্যাপিং সিকিউরিটি বেল্ট দিয়ে একমাত্র পশ্চাদপসরণের পথ বন্ধ করে দিয়েছিল, পাশাপাশি আমাদের চারপাশের উচ্চভূমিগুলো দখল করে নিয়েছিল। তারা পাহাড় থেকে এবং সুফি সাহেব মরুভূমি অঞ্চল থেকে আমাদের উপর গোলাবর্ষণ করতে করতে ধীরে ধীরে কাছে আসছিল। আমরা কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না এবং রাশিয়ান লাইন ভেদ করার মত যথেষ্ট লোকবল আমাদের কাছে ছিল না। যদিও তারা তাদের স্থলবাহিনীর একটি বড় অংশ বানা থেকে ওয়োকানুতে স্থানান্তর করেছিল, তবু আমরা আমাদের অবস্থান ধরে রাখার জন্যই সংগ্রাম করছিলাম। আমরা পাঞ্জওয়াই, নাখুনায় এবং জালাখানের নিকটবর্তী মুজাহিদিন ফ্রন্ট থেকে খুব দূরে ছিলাম না, যারা সবাই দ্রুত আমাদের সাহায্য পাঠাতে পারত, কিন্তু তবুও তাদের সাথে যোগাযোগ করার কোন উপায় আমাদের ছিল না, এবং আমাদের গোলাবারুদ প্রায় শেষ হয়ে আসছিল। সময় ফুরিয়ে আসছিল; নয়জন মুজাহিদিন শাহাদাতবরণ করেছিলেন এবং বিভিন্ন গ্রুপের আরও দশজন আহত হয়েছিলেন।

পরিস্থিতি ক্রমশ আরও নাজুক হয়ে উঠছিল এবং আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে নতুন রসদ ও সৈন্যবাহিনী ছাড়া আমরা আর বেশি দিন টিকতে পারব না। আমাদের জরুরি সাহায্য প্রয়োজন ছিল। মোল্লা মোহাম্মদ সাদিক এবং আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি যদি রাশিয়ান লাইন ভেদ করে বেরোতে পারি তবে সেটাই সবচেয়ে ভালো হবে। আমি পাঞ্জওয়াইয়ের অনেক মুজাহিদিনকে চিনতাম এবং আমাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য পাওয়ার সবচেয়ে ভালো সম্ভাবনা ছিল আমারই। আমি সৈন্য সংগ্রহ করে ফিরে আসতে পারতাম এবং রাশিয়ান অবরোধের পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে আহত মুজাহিদিনদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য একটি পথ খুলে দিতে পারতাম।

কিন্তু আমি কীভাবে বেরোব? একমাত্র উপায় ছিল সরাসরি রাশিয়ান লাইনের মধ্য দিয়ে যাওয়া। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমার একজন গ্রামবাসীর সাথে কৃষকের ভান করে যাওয়া উচিত। কাছে একটি গ্রামে আমার বন্ধুরা আমার সব পকেট খুঁজে দেখল এবং এমন কোনো জিনিস বের করে নিল যা আমাকে মুজাহিদ যোদ্ধা হিসেবে চিহ্নিত করতে পারে। একজন গ্রামবাসী তার মোটরসাইকেলে আমাকে নিতে রাজি হল এবং আমরা রাশিয়ান লাইনের দিকে রওনা দিলাম। যখন আমরা চিলজিনা থেকে সারপোজায় পৌঁছলাম, একজন আফগান সেনা সৈন্য রাস্তায় এগিয়ে এসে আমাদের দিকে তার কালাশনিকভ তাক করল।

সৈনিটি দূর থেকে চিৎকার করে বলল, "স্বাগতম, আশরার! আমি তোমাকে গ্রামে দেখেছি যখন তোমার বন্ধুরা তোমাকে প্রস্তুত করছিল।" আমি ব্যাখ্যা করলাম যে আমরা সাধারণ নাগরিক; "আমাদের বাড়ি সেদিকে," আমি বললাম, রাস্তার কিছু দূরের বাড়িগুলোর দিকে ইশারা করে। "আমরা মিরওয়াইস মিনার দিকে যাচ্ছি, আমরা বুঝতে পারছি না তুমি কী বলতে চাইছ।" সৈনিটি কিছুটা বিভ্রান্ত মনে হল এবং আমাদের বাইক থেকে নামতে বলল।

কোনো সতর্কতা ছাড়াই, সে তার কলম দিয়ে আমার বাহুতে খোঁচা মারল এবং আমাকে খুঁজতে শুরু করল। কলমটি ভেঙে গেল এবং এর এক টুকরো আমার বাহুর মধ্যে আটকে রইল। ক্ষত থেকে রক্ত ঝরতে লাগল এবং আমার হাতার ধীরে ধীরে গাঢ় লাল রঙ ধারণ করল। সে আমাকে সবখানে খুঁজল কিন্তু কিছুই পেল না। ড্রাইভার শপথ করে বলল যে আমি তার গ্রামে থাকি এবং দীর্ঘদিন ধরে সেখানে বসবাস করছি। আমার বাহুতে তীব্র ব্যথা হচ্ছিল এবং আমি দেখতে পাচ্ছিলাম ভাঙা কলমের ডগাটি বেরিয়ে আছে। আমি সৈনিটিকে আমার গল্প আবার বললাম: আমি কীভাবে গনি গ্রামে থাকি, আমার বাড়ি সেখানে, এবং আমার মুজাহিদিনদের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। আমি শুধু একজন কৃষক।

সৈন্য যখন শেষ পর্যন্ত আমাদের মোটরসাইকেলে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিল, গ্রামবাসীটি তৎক্ষণাৎ দ্রুত গতিতে স্টার্ট দিল। সে কাঁধের উপর দিকে চিৎকার করে বলল যে সৈনিটির নাম বিসমিল্লাহ এবং সে তার নিষ্ঠুরতার জন্য কুখ্যাত। "গত কয়েক মাসে," সে ইঞ্জিনের শব্দের মধ্যে চেঁচিয়ে বলল, "পিঠে গুলি করে পঁয়ত্রিশ জনকে হত্যা করা হয়েছে"। এর বেশিরভাগের জন্যই দায়ী ছিল এই বিসমিল্লাহ।

আমরা নিরাপদে পাঞ্জাওয়ালিতে পৌঁছলাম, কিন্তু পুরো পথটাই আমি অত্যন্ত উত্তেজনা অনুভব করছিলাম। আমাদের দিকে একটি গুলিও ছোঁড়া হয়নি। জেন্দারমায় আমরা আরও সৈন্য দেখে দীর্ঘ পথ ঘুরে গেলাম। আমি একই দিনে পাঞ্জওয়াই পৌঁছে শেষ পর্যন্ত মিরওয়াইস নিকার গ্রামে গিয়ে উঠলাম। দুই শতাধিক মুজাহিদিনকে একত্র করতে আমার তিন দিন সময় লেগেছিল। তৃতীয় রাতে আমরা জালাখানের দিকে অগ্রসর হলাম এবং সেখান থেকে আঙ্গুরিয়ান ও তাইমুরিয়ানের দিকে রওনা দিলাম। শত্রুর পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে আমরা মোল্লা মোহাম্মদ সাদিকের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বেশ কয়েকটি সরকারি অবস্থানে আঘাত হানলাম এবং নিরাপত্তা বলয় ভেঙে দিলাম। আফগান সরকারি বাহিনী ও তাদের রাশিয়ান মিত্ররা এখন দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। কিছু শত্রুসৈন্য বিস্ময়ের সাথে অস্ত্র ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল। আমরা বিশৃঙ্খলার মধ্য থেকে একটি পথ সুরক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছিলাম এবং আহত মুজাহিদিন ও শহীদদের দেহাবশেষ সরিয়ে নিতে পেরেছিলাম। আমাদের আক্রমণে শত্রুপক্ষে হতভম্ব ভাব সৃষ্টি হয়েছিল এবং তারা পিছু হটে গিয়েছিল, এভাবে কারেশের অবরোধের সমাপ্তি ঘটল।

*****

রাশিয়ানদের আফগানিস্তান থেকে প্রত্যাহারের অল্প সময় আগে, তারা পাঞ্জওয়াই, মাইওয়ান্দ, দান্দ ও আর্গান্দাবে ব্যাপক সামরিক অভিযান চালায়। এগুলো ছিল প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার তাদের শেষ প্রচেষ্টা, কিন্তু বদলে তা পরিণত হয় তাদের চূড়ান্ত পরাজয়ে। রাশিয়ান সৈন্যরা শেষবারের মতো পাঞ্জওয়াইয়ের সাঙ্গিসারে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সম্মুখীন হয়েছিল অঞ্চলের সমস্ত মুজাহিদিনের, যারা একত্রিত হয়ে একটি যৌথ প্রতিরক্ষা লাইন গড়ে তুলেছিল। হাফিজুল্লাহ আখুন্দজাদার বিখ্যাত ফ্রন্ট সাঙ্গিসারে অবস্থিত ছিল, এবং তিনি অনেক শক্তিশালী ও অভিজ্ঞ মুজাহিদিনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। দ্বিতীয়, নতুনভাবে গঠিত একটি ফ্রন্টের নেতৃত্বে ছিলেন প্রয়াত মেজর আবদুল হাই। আরও বিভিন্ন ছোট মুজাহিদিন গ্রুপ আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিল।

আমরা তিন দিন ধরে রকেট, আর্টিলারি ফায়ার ও বোমাবর্ষণের মুখোমুখি হয়েছিলাম। আকাশে বিমানগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আর তাদের বিস্ফোরণে মাটি কেঁপে উঠছিল, আমাদের হৃদয়ে ভয় সৃষ্টি করছিল। ট্যাংকগুলো পাঞ্জওয়াইয়ে ঢুকে পড়ল, এবং শীঘ্রই স্থলবাহিনী অনুসরণ করল। তবে তাদের বিপুল শক্তির পরও রাশিয়ানরা ও তাদের আফগান মিত্রদের মুখোমুখি হয়েছিল প্রবল প্রতিরোধের। চার-পাঁচ দিনের মধ্যে রাশিয়ানরা নেলঘাম রোড, নেলঘাম পাহাড় ও কোল্ক থেকে আমাদের অবস্থানগুলিকে ঘিরে ফেলেছিল। আবারও সব রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল; আমাদের কাছে রসদ পৌঁছানোর কোনো উপায় ছিল না, এবং আমরা আমাদের আহত বা শহীদদের সরিয়ে নিতে পারছিলাম না।

আমাদের খাদ্যও প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, এবং শীঘ্রই শুধু রুটি ও খেজুর অবশিষ্ট ছিল। মাওলভি সাহেব দাঙ্গার ছিলেন মুজাহিদিনের লজিস্টিক অফিসার এবং তিনি আমাদের স্বল্প মজুতকে যতদূর সম্ভব টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছিলেন। শেষ পর্যন্ত আমরা প্রতি বেলায় মাত্র তিনটি করে খেজুর পেতাম। রাশিয়ানরা প্রতিদিন নতুন এলাকা

দখল করছিল। আমরা কাছাকাছি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম এবং যে বাড়িগুলোতে ঘুমাতাম, তার বাইরে খন্দক খনন করলাম।

আমরা প্রয়াত মোল্লা মাজুল্লাহ আখুন্দের নেতৃত্বে একটি নতুন গ্রুপে পুনর্গঠিত হলাম। আমাদের কমান্ডার ছিলেন খান আবদুল হাকিম ও করম খান, যাদের আমরা "যমজ ভাই" বলতাম। করম খান আমাদের কমান্ডার ছিলেন, আর খান আবদুল হাকিম প্রয়াত হাফিজুল্লাহ আখুন্দজাদার ফ্রন্টের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তারা ছিলেন দক্ষ যোদ্ধা ও চমৎকার কৌশলবিদ, যারা অসমসাহসিকভাবে লড়াই করেছিলেন। পরবর্তীতে তালিবান আন্দোলনের নেতা হওয়া মোল্লা মোহাম্মদ ওমর আখুন্দ তখন আমাদের উত্তর ফ্রন্টের কমান্ডার ছিলেন। মোল্লা মোহাম্মদ ওমর আখুন্দ, মোল্লা মাজুল্লাহ, মোল্লা ফিদা মোহাম্মদ ও মোল্লা ওবাইদুল্লাহ আখুন্দ ছিলেন সাঙ্গিসারের সেই যুদ্ধের মূল নেতৃত্ব।

রাশিয়ানরা এগিয়ে আসছিল, এবং শীঘ্রই আমরা আমাদের খন্দক থেকে তাদের দেখতে পেলাম। বিকেলের দিকে তারা মাত্র একশ মিটার দূরে ছিল। সংঘর্ষ ছিল সংক্ষিপ্ত কিন্তু তীব্র যুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্র লাশে ছেয়ে গিয়েছিল। আমরা দুটি পিকে এবং অনেক হালকা অস্ত্র দখল করেছিলাম। জন মোহাম্মদ একটি পিকে নিয়েছিলেন এবং মোল্লা মোহাম্মদ ওমর আখুন্দ নিয়েছিলেন অন্যটি। যুদ্ধ হাতাহাতি লড়াইয়ে পরিণত হয়েছিল, আমাদের মাথার উপর দিয়ে গ্রেনেড উড়ে যাচ্ছিল। কিছু মুজাহিদিন মাঝবরাবর সেগুলো ধরে ফেলে পেছনে ছুড়ে দিচ্ছিলেন, যদিও এক ঘটনায় একজন মুজাহিদ শহীদ হয়েছিলেন যখন একটি গ্রেনেড তার হাতে ফেরত ছোড়ার আগেই বিস্ফোরিত হয়েছিল। রাশিয়ানরা পিছু হটে ডিসি বন্দুক দিয়ে আমাদের অবস্থানে গোলাবর্ষণ শুরু করল। বিস্ফোরণে মাটি কেঁপে উঠছিল, আর বারুদের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে গিয়েছিল। চারদিকে ধোঁয়া ও ধুলো উড়ছিল। তাদের বিমানবাহিনী আমাদের অবস্থানে বোমাবর্ষণ করছিল; প্রতিটি বাড়ি ও খন্দক আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। চারজন মুজাহিদ শহীদ হয়েছিলেন এবং আরও চারজন আহত হয়েছিলেন।

মোল্লা নাজিবুল্লাহ একটি বোমার আঘাতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। তার হাত আহত হয়েছিল এবং যখন জ্ঞান ফিরে পেলেন, তিনি আর কিছু শুনতে পাচ্ছিলেন না।শার্পনেল, পাথর ও কাঠের টুকরো বাতাসে উড়ছিল। মোল্লা মোহাম্মদ ওমর আমার থেকে মাত্র বিশ মিটার দূরে একটি দেয়ালের আড়ালে ছিলেন। তিনি কোণ থেকে তাকাতেই ধাতব শার্পনেলের একটি টুকরো তার মুখে আঘাত করে চোখ উপড়ে ফেলেছিল।

শীঘ্রই প্রতিটি ঘর আহত মুজাহিদিনে ভরে গিয়েছিল, কিন্তু তাদের কেউই আত্মসংবরণ হারায়নি। শহীদ মুজাহিদিনদের দেহ মাটিতে পড়ে ছিল, বাইরের যুদ্ধের একটি করুণ স্মারক। মোল্লা মোহাম্মদ ওমর ব্যস্ত ছিলেন নিজের চোখ ব্যান্ডেজ করতে। সেই একই রাতে আমরা একটি অবিস্মরণীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম। প্রয়াত মোল্লা মারজান গান গেয়েছিলেন এবং আমরা তার মধুর কণ্ঠস্বরের সাথে হাতের কাছে যা পেয়েছিলাম তা দিয়ে তাল দিয়েছিলাম। আমি এখনও সেই গজলটি মনে করতে পারি যা মোল্লা মোহাম্মদ ওমর আখুন্দ গেয়েছিলেনঃ-

"আমার অসুস্থতা নিরাময়হীন, হে আমার ফুলের মতো বন্ধু
তোমাকে ছাড়া আমার জীবন কঠিন, হে আমার ফুলের মতো বন্ধু।"

যদিও মোল্লা নাজিবুল্লাহ আহত ছিলেন, তবুও তিনি আমাদের অনেক আনন্দ দিয়েছিলেন। তিনি এখনো একটি শব্দও শুনতে পারতেন না, কিন্তু আমরা তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা চালিয়ে যেতাম। অপর ফ্রন্টের কমান্ডার খান আব্দুল হাকিমও একটি বোমার আঘাতে আহত হয়েছিলেন।

আল্লাহর নামে প্রশংসা! কী চমৎকার ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল মুজাহিদদের মধ্যে! আমরা দুনিয়া বা নিজেদের জীবন নিয়ে চিন্তিত ছিলাম না; আমাদের নিয়ত ছিল বিশুদ্ধ, এবং আমরা প্রত্যেকেই শহিদ হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। যখন আমি পেছনে ফিরে তাকাই–আমাদের একে অপরের প্রতি যে ভালোবাসা ও সম্মান ছিল–সেটা কখনো কখনো স্বপ্ন বলে মনে হয়।

পরদিন আমরা রওনা দিয়ে সিয়া চয়ের মধ্য দিয়ে যাত্রা করে পৌঁছালাম জানগিয়াবাদ। আমরা কয়েকদিন বিশ্রাম নিলাম, আর এই সময়েই রুশ ও সরকারি বাহিনী পেশমল এলাকায় চলে গেল। কিছুদিনের মধ্যেই পেশমলের মুজাহিদরা আমাদের কাছে বার্তা পাঠালেন যে তারা সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করছেন, এবং আমরা সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলাম। মোল্লা মোহাম্মদ ওমর তার পিকে (পিএকে মেশিনগান) তুলে নিলেন পেশমলে যাওয়ার জন্য, কিন্তু আমরা তাকে যেতে না করার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি প্রয়াত মোল্লা মাজুল্লাহর সঙ্গে তর্ক করলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাননি। তিনি ফিরে গেলেন নেলঘামে, সেখান থেকে পাকিস্তানে চিকিৎসার জন্য।

সংঘর্ষ চলতেই থাকল সাঙ্গিসার, নেলঘাম এবং নাহর-ই কারিজে। পেশমলে আমাদের তিন সপ্তাহ ধরে আটকে রাখা হয়, তারপর যখন শত্রু পক্ষের বড় ক্ষয়ক্ষতি হয়, তখন তারা পিছু হটে। রক্তে ভিজে গিয়েছিল প্রতিটি ইঞ্চি যুদ্ধক্ষেত্র। শত্রুরা পরে চলে যায় মাহালাজাত, সুফ জালাখান ও মাশুরে। যারা পেশমলের যুদ্ধে অংশ নেননি, তারা চলে যান মাহালাজাতে সাহায্য করতে। নতুন বাহিনীর সমর্থনে তারা রুশদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা বজায় রাখতে সক্ষম হন।

আর্গানদাবের অবরোধ ছিল দক্ষিণ আফগানিস্তানে রুশদের শেষ বড় অপারেশন। চার হাজারের বেশি ট্যাংক পাহাড় পেরিয়ে সবুজ ও উর্বর উপত্যকায় প্রবেশ করে, এবং যুদ্ধ চলে পাঁচ সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে। দক্ষিণের সব মুজাহিদ একত্রিত হয়ে জেলাটি রক্ষা করেন। শত শত মুজাহিদ শহিদ হন; শুধু আমাদের ফ্রন্টেই সত্তরের বেশি যোদ্ধা প্রাণ হারান। তালেবানরা আলিকোজাই গোত্রের নেতা মোল্লা নাকিবের নেতৃত্বে যুদ্ধ করেন। অবশেষে রুশ বাহিনী পিছু হটে এবং বিমানবন্দরের প্রধান ঘাঁটিতে ফিরে যায়। ওই ক্যাম্প ছাড়া তারা কেবল কিছু চেকপোস্ট রেখেছিল প্রধান রাস্তা ও মহাসড়কের পাশে। তাদের হেলিকপ্টার নিয়মিত টহল ও তল্লাশি চালাতো, আর রাতে একা চলা গাড়িকে থামানো হতো বা কখনো কখনো গুলি করা হতো। রুশ ইউনিটগুলো বড় চোরাচালানের পথগুলোতে ওঁত পেতে থাকত, প্রায়ই পাহাড়ি পথগুলোতে হেলিকপ্টারে করে সৈন্য নামিয়ে দিত, যেসব পথ দিয়ে মুজাহিদরা আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে চলাচল করতেন।

আমরা একের পর এক চেকপোস্টে হামলা চালাই, ধীরে ধীরে রুশদের বিতাড়িত করি এবং কিছু অঞ্চলে তালেবানরা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। রুশরা দূর থেকে তাদের ভারী গোলন্দাজ ও বিমান বাহিনী দিয়ে হামলা চালিয়ে

যেতে থাকে, আর আমরা বিচারিক ব্যবস্থা বিস্তারে মনোনিবেশ করি। আমাদের আদালতগুলো ভালোভাবে কাজ করছিল এবং জনগণের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি শুরু করেছিল।

মোল্লা নেক মোহাম্মদ আখুন্দ ছিলেন সে সময়ের একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি। মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তিনি পেশমলের কাছে একটি সড়কের অংশে একাই রুশ কনভয়গুলোর বিরুদ্ধে জিহাদ চালান। তিনি রাস্তার পাশে একটি খালে লুকিয়ে থাকতেন–একটি বাইসাইকেলের টায়ারের ইনার টিউবের সাহায্যে শ্বাস নিয়ে–এবং ট্যাংক কলামের ওপর আরপিজি দিয়ে হামলা চালাতেন।

রুশরা সেই রাস্তা ঘৃণা করত এবং তাকে হত্যা করতে বিমান পাঠায়। একসময় তিনি একটি বোমা হামলায় শহিদ হন, কিন্তু মৃত্যুর আগে তিনি ঘোষণা করেন যে তিনি মারা গেলেও রুশরা আর কোনোদিনও সেই রাস্তায় চলাচল করবে না। তাকে সেই রাস্তার পাশে দাফন করা হয়, যেমনটা তিনি চেয়েছিলেন। তিন দিন পর রুশরা জারাই মরুভূমির ঘাঁটিতে ফিরে যায়। তারা আর কখনোই সেই রাস্তায় চলেনি।

*****

রুশ ও সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে অনেক মহান যুদ্ধ লড়েছিল মুজাহিদরা, কিন্তু আমার জন্য সবচেয়ে তীব্র যুদ্ধ ছিল ১৯৮৮ সালে খুশাবের কাছে কান্দাহার বিমানবন্দরে চূড়ান্ত হামলা। রুশরা ইতিমধ্যেই তাদের প্রধান ঘাঁটিতে ফিরে গিয়েছিল এবং প্রত্যাহারের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখনই আমরা চূড়ান্ত আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নিই। সময়টা ছিল গ্রীষ্মকাল, আঙ্গুর তখনও পাকেনি, আমরা আমাদের বাহিনী একত্র করি। এটি ছিল আমার অংশগ্রহণকৃত সবচেয়ে বড় অপারেশন, যেখানে মোল্লা মোহাম্মদ আখুন্দ এবং আমি প্রায় পাঁচ বা ছয়শ মুজাহিদকে নেতৃত্ব দিই। আমি উত্তর-পূর্ব দিক থেকে বেইসের দিকে অগ্রসর হওয়া ৫৮ জনের একটি দলকে নেতৃত্ব দিই, আর মোল্লা মোহাম্মদ আখুন্দ উত্তর দিক থেকে বাকি যোদ্ধাদের নিয়ে আক্রমণ করেন।

রুশরা চূড়ান্ত আক্রমণের জবাবে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে–এমন ধরনের লড়াই আমরা আগে কখনো দেখিনি। পিছু হটার আর কোনো পথ তাদের ছিল না, কারণ এটি ছিল দক্ষিণে তাদের শেষ ঘাঁটি। আমরা তিন দিন তিন রাত ধরে লড়াই করি। আমি ঘুমাইনি, খাইনি। তখন ছিল রমজান মাস এবং আমি রোজা রেখেছিলাম, কিন্তু আক্রমণ অব্যাহত ছিল, রাতজুড়ে গোলা ও রকেটের ঝড়ে আমরা আক্রান্ত হই। উলামারা আমাকে রোজা ভাঙতে বলেন, কিন্তু আমি ভয় পেতাম যে যেকোনো সময় শহিদ হতে পারি, আর আমি রোজা অবস্থায় শহিদ হতে চেয়েছিলাম। মাত্র তিন দিনের মধ্যেই আমার নেতৃত্বাধীন ৫৮ জনের মধ্যে ৫০ জন নিহত হয়।

আমরা দোস্তম (জেনারেল আব্দুল রশিদ দোস্তম)ও সরকারি বাহিনীর আক্রমণের সম্মুখীন হই। আমার জীবনে যত যুদ্ধ দেখেছি এবং লড়েছি, তার মধ্যে খুশাবের যুদ্ধ ছিল সবচেয়ে তীব্র, সবচেয়ে ভয়ংকর এবং সবচেয়ে কঠিন। আমরা বিপুল সংখ্যক সৈন্যের মুখোমুখি হই এবং এতটাই কাছাকাছি ছিলাম যে শত্রুরা তাদের সর্বশক্তি

আমাদের ওপর নিক্ষেপ করে। প্রতিটি সেন্টিমিটার জায়গায় সৈন্য ও যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। পুরো অঞ্চল থেকে মুজাহিদদের ফ্রন্টগুলো এসে এই যুদ্ধে যোগ দেয়।

প্রতিদিন সামরিক অভিযান চলেছে; গ্রাম ও ঘরবাড়ি বোমায় ধ্বংস হয়েছে; মানুষ নিহত হয়েছে এবং জমি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। কিন্তু মুজাহিদরা প্রতিটি ফ্রন্টে শত্রুদের ব্যস্ত রাখে এবং তাদের শক্তি ছড়িয়ে দেয়।

মাহালাজাতে অনেক বিখ্যাত কমান্ডার ও শক্তিশালী যোদ্ধাসহ বিপুল সংখ্যক মুজাহিদ যুদ্ধ করছিলেন। মোল্লা নূরুদ্দিন তুরাবি, প্রয়াত মোল্লা আহমদুল্লাহ আখুন্দ, মোল্লা আব্দুল গনি আখুন্দ, গনি জান আঘা এবং অন্যান্য অনেক গ্রুপের মুজাহিদরা একত্রে যুদ্ধ করছিলেন।

রুশদের সঙ্গে এই চূড়ান্ত যুদ্ধে আমাদের অনেক ক্ষতি হয়েছিল।

শেষে আমি একটি বাড়ির কথা মনে করি, যেখানে দশজন মুজাহিদ সারিবদ্ধভাবে শুয়ে ছিলেন। সেই দিনই হাজি লতিফ আখুন্দ, যাকে পশ্চিমা সাংবাদিকরা "কান্দাহারের সিংহ" বলে ডাকত, ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন। মুজাহিদরা নিঃসাড় মেষশাবকের মতো পড়ে ছিলেন, আর তার চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। হাজি লতিফ, যিনি তখন যৌথ ফ্রন্টের কমান্ডার ছিলেন, মোল্লা বুরজানকে বলেন, "মোল্লা সাহেব! আল্লাহকে ভয় করুন! আমাদের তরুণ তালেবানদের রুশদের সামনে কোরবানি করবেন না।"
"হাজি সাহেব!" মোল্লা বুরজান জবাব দেন, "আমাদের আর কোনো পথ নেই। যদি আমরা জিহাদ না করি, তাহলে রুশরা আমাদের দেশ দখল করে নেবে। জিহাদ করা মানেই শহিদি ও ক্ষতির জন্য প্রস্তুত থাকা।"

এই জবাবে সন্তুষ্ট হননি হাজি লতিফ। তিনি বলেন, "মোল্লা সাহেব! আমি বলছি না যে জিহাদ বন্ধ করা উচিত, কিন্তু আমি তালেবান ও উলামাদের জন্য চিন্তিত। তারা আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক হৃদয়, তাদের রক্ষা করা দরকার। আমার ফ্রন্টে যেসব যোদ্ধা আছে, তারা গাঁজা খায়, দাড়ি কামায়, ইসলামের কিছু জানে না। আমি যদি তাদের স্বাধীনতা দিই, তাহলে তারা মুজাহিদদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করবে। তাদের থামিয়ে রাখলে অন্তত তারা সরকারি বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবে না। পথে যদি তারা মরে, তাহলে শহিদ হয়ে জান্নাতে যাবে। কিন্তু তালেবানদের সমাজে অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে।"

পরে তালেবানরা হাজি লতিফ ও তার লোকদের সঙ্গে নেলঘামে একটি কমান্ডারদের বৈঠকে দেখা করে। হাজি লতিফ সেখানে উপস্থিত হন কাঁধে ছোট কালাশনিভ (কালাকভ) ঝুলিয়ে রাখা রুক্ষদর্শন, গাঁজাসেবী যুবকদের সঙ্গে। তারা ছিল পশ্চিমা ধাঁচের পোশাক পরা, চুল পেছনে আঁচড়ানো। তালেবানদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য ছিল স্পষ্ট। তারা আমাদের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, আর তালেবানরা তাদের দিকে তাকিয়ে থাকত, আতিথেয়তা না দেখিয়ে।

হাজি মোল্লা আলি মোহাম্মদ আখুন্দ ওই যুবকদের নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, তারা সবাই গাঁজাসেবী ও “সিনেমা বয়” । হাজি লতিফ লজ্জিত হন এবং প্রতিশ্রুতি দেন, তিনি তাদের মাথা ন্যাড়া করে দেবেন ও চুল কাটাবেন। তিনি বলেন, তিনি তাদেরকে ইয়াসিন, তবারকাল্লাযি ও আম্-পারার সূরা শিখাবেন। “আমি তাদের তালেবানে রূপান্তর করব,” তিনি আন্তরিকভাবে অঙ্গীকার করেন।

মিটিং থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরপরই তিনি তাদের শিক্ষা দেওয়া শুরু করেন, কিন্তু আমরা পরে শুনি যে একজন নারী তাকে দেখতে আসেন।

“হাজি বাবা, আপনি কী করছেন?” – তিনি জিজ্ঞেস করেন।

হাজি লতিফ তাকে বলেন যে তিনি তার লোকদের তালেবানে রূপান্তর করতে চান।

“কিন্তু হাজি সাহেব!” – ওই নারী বলেন – “এইভাবে তারা তালেবান হবে না। তাদের ছেড়ে দিন। তারা তরুণ, তাদের চাহিদা আছে। তাদের জীবন মাত্র দুদিনের, সুখে কাটাতে দিন।”

শোনা যায়, এই নারীর কথা শুনে হাজি লতিফ তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। আল্লাহ ভালো জানেন!

WITHDRAWAL

আমাদের সময় লেগেছিল দশ বছর, কিন্তু ১৯৮০-এর দশকের শেষ নাগাদ আমরা অবশেষে সোভিয়েতদের বিপক্ষে পাল্টা অবস্থানে যেতে সক্ষম হই। যুদ্ধটি তাদের জন্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছিল এবং মস্কো বুঝে গিয়েছিল যে তারা আর এই দখল বজায় রাখতে পারবে না। মুজাহিদরা শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, আন্তর্জাতিক পরিসরেও অগ্রগতি অর্জন করেছিল। ১৯৭৯ সালে রাশিয়ানরা প্রথম যখন আফগানিস্তানে সৈন্য পাঠিয়েছিল, তখন থেকেই জাতিসংঘ ধারাবাহিকভাবে একাধিক প্রস্তাব পাস করে এই অভিযানে একটি সার্বভৌম দেশের বিরুদ্ধে সহিংসতা হিসেবে নিন্দা জানায়। সাংবাদিকরা পাকিস্তান থেকে "অপর পাশে" যাওয়া শুরু করে যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করার জন্য, এবং আমেরিকা ও ইউরোপে সহানুভূতিশীল বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সমাজ গড়ে উঠতে থাকে।

একাধিক পশ্চিমা দেশ শুরু থেকেই মুজাহিদদের সক্রিয়ভাবে সমর্থন করছিল। আশির দশকের মাঝামাঝি এসে এই অর্থনৈতিক সহায়তা ও আধুনিক অস্ত্রপ্রযুক্তির প্রাপ্তি স্পষ্ট করে দেয় যে রাশিয়ানরা এক ব্যর্থ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের এই আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতা ধীরে ধীরে তাদের অভ্যন্তরীণ চাপও বাড়িয়ে তোলে– নাগরিক ও যুদ্ধফেরত সৈনিকদের পক্ষ থেকে। এই সব কিছুর ফলস্বরূপ সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘ-প্রায়োজিত জেনেভা চুক্তির অংশ হিসেবে ১৯৮৮ সালে পুরোপুরি আফগানিস্তান থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

বাবরাক কারমালকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তার স্থলে আনা হয় নাজিবুল্লাহকে। কারমালের আফগানিস্তানকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৬তম প্রজাতন্ত্রে রূপান্তর করার প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি। ক্রেমলিন নাজিবুল্লাহকে কাবুলে একটি পুতুল সরকারসহ ক্ষমতায় বসায়। তিনি তার পূর্বসূরির চেয়ে কম ক্ষমতাবান ছিলেন এবং বয়সেও ছিলেন তরুণ, কিন্তু খাদ (KhAD - আফগান গোয়েন্দা সংস্থা)-এর সাবেক প্রধান হিসেবে তিনি নিজের উত্থান নিশ্চিত করতে সক্ষম হন।

এই নতুন সরকারের ছায়াতলে দাঁড়িয়ে রুশরা তাদের সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়। যখন আমি প্রথম এই খবর শুনি, আমি অত্যন্ত খুশি হই। মনে হয়েছিল, জিহাদ শেষ হয়ে গেছে, আর আমরা বিজয়ী হয়েছি। আমি কখনো ভাবিনি যে এমন দিন দেখতে পারব যেদিন সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান ছেড়ে যাবে। আমি নিশ্চিত ছিলাম, তাদের গুলিতে শহিদ হব–আমি এমনটিই চেয়েছিলাম। প্রতিবার কোনো অভিযানে গেলে ভাবতাম, এবার আর ফিরে আসব না। কিন্তু এই পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন আশা জন্ম নেয়, আর আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম, যেন তিনি আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন, যাতে আমি একটি স্বাধীন ও মুক্ত ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে আফগানিস্তানকে দেখতে পারি, যেখানে থাকবে একটি ইসলামি সরকার।

কিন্তু বিভিন্ন মুজাহিদ গ্রুপগুলোর মধ্যে থাকা দূর্বল জোট আমাদের চোখের সামনে ভেঙে পড়ল, যখন প্রত্যেকে নিজ নিজ লক্ষ্য পূরণের জন্য ছুটতে শুরু করল। এরপর যা ঘটল, তা আমাদের সংগ্রামের উদ্দেশ্যকে ধ্বংস করল এবং মুজাহিদ ও জিহাদের নাম ও সম্মানকে কলঙ্কিত করল।

রাশিয়া তাদের সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেওয়ার পর তাদের অভিযান দ্রুত হ্রাস পায়। তারা পাহাড় ও মরুভূমিতে টহল দেওয়া প্রায় বন্ধ করে দেয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই শহর ও মহাসড়ক ছেড়ে দিয়ে কেবল বিমানবন্দর ও রানওয়ের ওপর মনোযোগ দেয়, যেখানে তাদের অধিকাংশ সৈন্য মোতায়েন ছিল। তবে তারা এখনো আকাশপথে হামলা ও গোলাবর্ষণ চালিয়ে যেতে থাকে।

রাশিয়া পিছু হটার পর গ্রামগুলোতে জীবনযাত্রার মান অনেকটাই উন্নত হয়। কিন্তু একই সঙ্গে নতুন সমস্যারও জন্ম হয়। ১৯৯০ সালে যুক্তরাষ্ট্র মুজাহিদদের জন্য অর্থায়ন কমাতে শুরু করে, এবং অনেক কমান্ডার অস্ত্র ও অর্থের অভাবে পড়ে যান–তাই তারা বিকল্প উৎস খুঁজতে থাকেন। অনেকেই নাজিবুল্লাহর নতুন সরকারের দিকে ফিরে তাকান। কিছু কমান্ডার তাদের মুজাহিদদের বেতনও দিতেন, আর নিয়মিত আয় না থাকলে তাদের সৈন্যরা সরে যেতে পারত।

এই সময় যখন কিছু কমান্ডার নতুন পৃষ্ঠপোষক খুঁজতে শুরু করেন, তখন নাজিবুল্লাহ মুজাহিদ ফ্রন্টগুলোকে খাদ (KhAD)-এর সঙ্গে নিবন্ধন করাতে শুরু করেন। একবার অনুমোদন পেলে এই ফ্রন্টগুলো সরকারের কাছ থেকে অর্থ পেত এবং মূলত গোয়েন্দা সংস্থার একপ্রকার অংশে পরিণত হত–এবং সরকারের জন্য হুমকি হয়ে থাকত না।

এইভাবে যারা কমিউনিস্ট সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করছিল, তারা আমাদের মতো ফ্রন্টগুলোর বিরুদ্ধে কাজ করতে শুরু করে, যারা এখনো মূল আদর্শ অনুসারে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় কান্দাহারের গভর্নর নূর উল হক উলূমি বিভিন্ন গোষ্ঠীর মাঝে ট্রাকভর্তি টাকা বিতরণ করতেন, এর বিনিময়ে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে পূর্ব-ঘোষিত ও সাজানো আক্রমণ চালাত, যেখানে কোন হতাহতের ঘটনা ঘটত না।

যখন দেখা গেল বহু খ্যাতনামা কমান্ডার নাজিবুল্লাহর পক্ষ নিচ্ছেন, তখন একটি প্রকৃত ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ধীরে ধীরে অধরা হয়ে যেতে লাগল। রাশিয়ানরা পরাজিত হলেও, কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় থেকে যেতে পারছিল মুজাহিদদের কিনে নেওয়ার মাধ্যমে। যদিও জেনেভা চুক্তিতে এই ধরনের কাজ স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ছিল, তবুও এই কৌশল সোভিয়েত ইউনিয়নের সরাসরি অর্থায়নে পরিচালিত হয়।

এভাবে তালেবান ও অন্যান্য কান্দাহারি মুজাহিদ গ্রুপগুলোর মধ্যে গড়ে ওঠা নাজুক ঐক্য ভেঙে পড়তে শুরু করে।

*****

তবুও, ১৯৮৮ সালের আগস্টে যখন শেষ সোভিয়েত সেনা কান্দাহার ছেড়ে চলে গেল, আমরা দুশ্চিন্তাহীনভাবে উৎসব করেছিলাম। মোল্লা মারজান আনন্দে পুরনো এক চুলার ঢাকনাকে ঢোল বানিয়ে গান গাইলেন, আর আমরা সবাই মিলে আতান নৃত্য করলাম। আমরা তখনো আশা করছিলাম যে মুজাহিদরা পরস্পরের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে নেবে এবং একটি ইসলামি সরকার প্রতিষ্ঠা করবে, যাতে আমরা আমাদের শহিদদের সম্মান দিতে পারি, এতিমদের আহার জোগাতে পারি এবং বিধবাদের সহায়তা করতে পারি। কিন্তু নতুন সরকার ক্ষমতা ধরে রাখল।

প্রেসিডেন্ট নাজিবুল্লাহ রেডিওতে ভাষণ দিলেন, কথা বললেন শান্তি, নিরাপত্তা ও ভ্রাতৃত্ব নিয়ে। তিনি কুরআনের আয়াত এবং নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদিস উদ্ধৃত করলেন। তাঁর "মিলনসূত্র" ছিল ক্ষমা–কিন্তু সেটি প্রকৃত ঐক্য ছিল না। আমাদের শুধু অতীতকে ভুলে যেতে বলা হয়েছিল, যে সংঘর্ষ ও শত্রুতা ঘটেছিল তা মন থেকে মুছে ফেলতে বলা হয়েছিল। “তোমরা কিছু করোনি, আমিও কিছু করিনি” –এই কথা বলতেন তিনি। তিনি সকল পক্ষকে আহ্বান জানাতেন একসঙ্গে একটি সরকার গঠনের জন্য। তাঁর কথাগুলো যুক্তিসঙ্গত মনে হলেও, আমরা জানতাম তিনি দুর্বল এবং তাঁর সরকারের পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী হওয়া সম্ভব নয়।

রাশিয়ানরা কান্দাহার ছাড়ার পর তালেবানদের অভিযান অনেক কমে যায়। আমার মতো অনেকেই আবার ধর্মীয় শিক্ষার দিকে মনোযোগী হয়, তবে কিছু দূরবর্তী এলাকায় কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা রক্ষা এবং ক্ষুদ্র অভিযান চলতে থাকে। আমি নেলঘামে গ্রামবাসী ও তালিবদের ধর্মীয় শিক্ষা দিতে থাকি, অন্যান্য মুজাহিদদের সঙ্গে। কিন্তু পরে আমরা সিদ্ধান্ত নিই অন্য কোথাও চলে যাওয়ার। নেলঘাম ছিল প্রধান রাস্তা থেকে অনেক দূরে, আর সরকার বা যুদ্ধে কী হচ্ছে সে খবর পৌঁছাতে কয়েকদিন লেগে যেত। আমরা হাওয়ে মুদাত নামের একটি গ্রামে যাই, যেটি ওয়াজির কালা পাসাও-এর ওপরে মহাসড়কের ধারে। সেখানে আমরা কাজ শুরু করি।

আমি নির্মাণস্থলেই থাকতাম, ক্যাম্প নির্মাণে সহায়তা করতাম–যার চারকোণে চারটি টাওয়ার ছিল। পরে আমরা সবাই নেলঘাম ছেড়ে নতুন সেই জায়গায় চলে যাই। এটি অনেকটাই একটি মাদ্রাসার মতো দেখাত। তখন আমাদের দুটি গাড়ি ছিল, তাই ভবন নির্মাণ ও খাদ্যের খরচ চালাতে আমরা একটি ট্রাক্টর ভাড়া দিতাম।

তালেবান নেতৃত্ব কান্দাহারের খাদ্য গুদামে একটি বৈঠক আয়োজন করে, যা এখনো শহরের পশ্চিম প্রান্তে রকেট ও মর্টারের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। রাশিয়ানরা কান্দাহার ছেড়ে দেওয়ার পর শহরকে তালেবান ও অন্যান্য মুজাহিদ গোষ্ঠীর মধ্যে কীভাবে ভাগ করা হবে, তা নিয়ে আলোচনা করতে সবচেয়ে প্রভাবশালী কমান্ডাররা সেখানে জড়ো হয়েছিলেন। কিন্তু যখন তারা সভায় ব্যস্ত, ততক্ষণে অন্যান্য মুজাহিদ গোষ্ঠী দ্রুতগতিতে কান্দাহারের দিকে এগিয়ে আসছিল। যারা তখন নাজিবুল্লাহর সরকারের পক্ষে চলে গিয়েছিল, তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে তালেবানদের নতুন প্রশাসন থেকে বাদ দেওয়া হবে। তারা শহর ভাগ করে নেয়, আর তালেবান যখন সাইলোতে বসে পরবর্তী করণীয় নিয়ে আলোচনা করছিল, তখনই ওই কমান্ডাররা পুরো শহরে নিজেদের অবস্থান গ্রহণ করছিল।

আমি মোটরসাইকেলে করে সাইলো থেকে মিরওয়াইস মিনা যাচ্ছিলাম, তখন দেখি শত শত সশস্ত্র লোক চেকপয়েন্ট দখল করে শহরে প্রবেশ করছে। আমি তৎক্ষণাৎ ফিরে গিয়ে সভাস্থলে ঢুকে চিৎকার করে বললাম:

"আপনারা এখানে ব্যস্ত, আর শহর দখল হয়ে যাচ্ছে ঐ জোটের দ্বারা!"

কেউই নিঃশব্দ এই হামলার খবর জানত না। যখন কমান্ডাররা অবশেষে সাইলো ছেড়ে শহরের দিকে রওনা হয়, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

তালেবানরা রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে বহু সামরিক অভিযান চালিয়েছিল এবং তারা ছিল জিহাদের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ, অসংখ্য প্রাণ বিসর্জন দিয়ে হাজার হাজার হতাহত বরণ করেছিল, কিন্তু আমরা ছিলাম বিশ্বাসঘাতকতার শিকার। শুধু পুরনো রাশিয়ান ব্যারাকগুলো, যেগুলো বিমানবন্দরের বাইরে ছিল, তা আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসে; সেই দায়িত্বে ছিলেন মরহুম হাজী মোল্লা ইয়ার মোহাম্মদ আখুন্দ। তবুও, আমরা আর যুদ্ধ করতে চাইনি। আমাদের অনেকেই আবার নিজেদের গ্রামে ফিরে গিয়ে পড়াশোনায় মনোযোগ দেয়।

আমরা এই কথাতেই সন্তুষ্ট ছিলাম যে, আমরা রাশিয়ানদের আফগানিস্তান থেকে বের করে দিতে পেরেছি।

*****

সারা আফগানিস্তানজুড়ে মুজাহিদিন দলগুলো একে একে নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছিল।

নাজিবুল্লাহ বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করেন এবং ১৯৯২ সালের ১৬ এপ্রিল কাবুলে জাতিসংঘের একটি কম্পাউন্ডে আশ্রয় নেন। দুই সপ্তাহ পর, পাকিস্তানের পেশোয়ারে আইএসআই একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করে, যার সভাপতিত্বে ছিলেন সিবঘাতুল্লাহ মুজাদ্দেদি। মুজাদ্দেদিকে দুই মাসের জন্য রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়, এরপর বুরহানউদ্দিন রব্বানী চার মাসের জন্য দায়িত্ব নেবেন বলে ঠিক হয়।

যদিও মাত্র দুই মাসের রাষ্ট্রপতির মেয়াদ আমাদের অদ্ভুত লেগেছিল—একজন রাখালও চার মাসের কম সময়ে কাজ করতে রাজি হবে না—তবুও আমরা এটিকে সুসংবাদ হিসেবে নিয়েছিলাম এবং খুশি হয়েছিলাম।

একদিন আমি রেডিওতে কাবুল থেকে সম্প্রচারিত একটি অনুষ্ঠান শুনছিলাম, সেই একই রেডিও চ্যানেল যা আগে মুজাদ্দেদিকে আইএসআই ও আমেরিকার দালাল বলে আখ্যায়িত করেছিল। আমি বিস্ময়ে হাঁ করে শুনছিলাম, কারণ সেটি ছিল মুজাদ্দেদির একটি ভাষণ, যার প্রারম্ভিক ঘোষণায় বলা হচ্ছিল:

"প্রফেসর হযরত সিবঘাতুল্লাহ মুজাদ্দেদি, জভা-ই-মিলির নেতা এবং আফগানিস্তানের ইসলামি সরকারের রাষ্ট্রপতি…"

এই মুহূর্তটি হয়তো আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় মুহূর্ত ছিল।

আমার জীবনে অনেক সুখের অভিজ্ঞতা হয়েছে—

১৯৮৯ সালে হজ পালন করে মক্কা ও কাবা শরীফ দর্শন,

বিয়ে,

জ্ঞান অর্জনের আনন্দ,
আরবিতে কুরআন হিফজ করার বরকত,
এমনকি পরে সরকারি পদে আসীন হওয়া–
কিন্তু ওই দিনের আনন্দের সঙ্গে কিছুই তুলনীয় নয়।

আমি সেদিন ভাবছিলাম, জনগণের আশা পূরণ হতে যাচ্ছে,
আমাদের ত্যাগ, কষ্ট, এবং অন্তহীন প্রয়াস সফল হতে যাচ্ছে।
তবে পরিচয়ের পর যেই মুজাদ্দেদির ভাষণ শুরু হলো, একের পর এক হতাশা ভেসে আসতে লাগল।

তিনি ঘোষণা দিলেন, তাঁর নতুন স্থায়ী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হবেন পাঞ্জশির উপত্যকার কমান্ডার আহমদ শাহ মাসউদ।
যে কেউ বুঝতে পারবে, এটা একটা দ্বন্দ্বের বীজ বপন।
আমি বুঝতে পারলাম না, হযরত মুজাদ্দেদি কীভাবে একজন প্রাদেশিক কমান্ডারকে স্থায়ী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নিয়োগ দিলেন, যখন তিনি নিজেই মাত্র দুই মাসের রাষ্ট্রপতি?

তিনি কেন মাসউদকে নিয়োগ দিলেন?
কেন এমন একটি সিদ্ধান্ত নিলেন?

আমি জানতাম, মুজাদ্দেদি একজন প্রকৃত জিহাদি নেতা, যিনি রাশিয়ান ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।
তিনি আল্লাহর পথে কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন।
তবে তিনি এখন এমন কিছু করলেন, যা আরও রক্তপাত ঘটাবে–এটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না।

এক মুহূর্তেই আমার আনন্দ চলে গেল।
চোখ দিয়ে অঝোরে পানি পড়তে লাগল, চিৎকার করে কাঁদতে লাগলাম।
কিছু মুজাহিদিন এসে বলল,
"তুমি এই আনন্দের দিনে কাঁদছ কেন? আফগানিস্তান মুক্ত হয়েছে, আমাদের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে।"

আমি বললাম, তারা ঠিক বলছে–
আমি খুশি, তবে আমি দুঃখিতও।

আমাকে ভাবতে হয়েছিল তাদের কথা, যারা শহিদ হয়েছেন।
তাঁরা সবাই আমাদের মতোই এই দিনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, কিন্তু তার জন্য চরম মূল্য দিয়েছেন।
বিশেষ করে মোল্লা মারজানের কথা মনে পড়ে, যিনি সব সময় বলতেন–
"কখন সেই দিন আসবে, যখন আমি শাহিদান চৌকে ঘুরে ঘুরে বিজয় উদ্‌যাপন করব।"

আমরা একসাথে অনেকবার ঘুরেছি সেখানে, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই তিনি শহিদ হন।

কাবুলে খুব দ্রুতই মাসউদ ও হেকমতইয়ারের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়।
মাসউদ পুরো শহরের নিয়ন্ত্রণ দাবি করলেন, কিন্তু হেকমতইয়ার–প্রধানমন্ত্রী হিসেবে–তা মানলেন না।
পুরনো কমিউনিস্ট দলগুলোর খল্কি ও পারচামি বিভাজন আবার প্রকাশ পেতে লাগল।
জোটগুলো কখনও পরিষ্কার ছিল না, কিন্তু খল্কিরা হেকমতইয়ারকে, আর পারচামিরা মাসউদকে সমর্থন করছিল বলে মনে হলো।

এই সংঘর্ষ কান্দাহারেও ছড়িয়ে পড়ে,
সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী কমান্ডারদের মধ্যে যুদ্ধ হয়।
সাইয়্যাফের দলভুক্ত কমান্ডার উস্তাদ আব্দুল হালিম প্রাদেশিক পুলিশ দপ্তর দখল করে নেন, কিন্তু মোল্লা নাকিবের বাহিনী সেটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে।
সেই যুদ্ধে কমান্ডার ছিলেন আব্দুল হাকিম জান, যা একদিনের বেশি স্থায়ী হয়নি।
উস্তাদ আব্দুল হালিম পালিয়ে যান, এবং বেশিরভাগ লোক নিহত হয়, কিছু সাড়পোজা ও তাঁর মূল ঘাঁটির দিকে পালিয়ে যায়।

তালেবানরা এই বিরোধে জড়ায়নি।
তাদের অনেকেই ততক্ষণে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল।
মোল্লা মোহাম্মদ ওমর সাঙ্গিসারে আমাদের পুরনো মুজাহিদিন ঘাঁটিকে একটি মাদ্রাসায় রূপান্তর করেন।
আমি সেখানে থাকার কথা চিন্তা করেছিলাম, কিন্তু কাজ ছাড়া জীবন কঠিন হতো।

আমি সিদ্ধান্ত নিই, স্ত্রীর কাছে ফিরে যাব।
আমার বিয়ে হয়েছিল ১৯৮৭ সালে এবং তখন আমরা দেহ মেরাসায় আমার শ্বশুরবাড়িতে থাকতাম।
ততদিনে আমাদের সন্তানও জন্ম নিয়েছে।
আমি আমার স্ত্রী ও শ্বশুরের সঙ্গে বিষয়টি আলোচনা করি এবং সিদ্ধান্ত নিই কাজ খুঁজে বের করব।
আমি আগে কখনও কাজ করিনি, ব্যবসা শুরু করার মতো টাকা ছিল না, কী করব তাও জানতাম না।

আমার পরিবার তখন পাকিস্তানে ছিল,
তারা চাইলে আমাকে কাজ বা ব্যবসা শুরু করতে সাহায্য করতে পারত, কিন্তু আমি আফগানিস্তান ছাড়তে চাইনি।

আমি শুনেছিলাম–সালাওয়াত-পাঞ্জোয়াই রোডে কোনো একটি বিদেশি সংস্থা কাজ করছে,
সেখানে অনেকেই কাজ পেয়েছে।
পরদিন সকালে আমি সেখানে গিয়ে নাম রেজিস্ট্রি করি।
তারা আমাকে একটি ফাঁসা (কোদাল) দেয় এবং রাস্তার ধারে পানি সরবরাহের জন্য খাল খনন করতে বলল।

আমি সঙ্গে সঙ্গেই কাজ শুরু করি।
প্রতিদিন সবাইকে ২৫০ আফগানি ও ৭ কেজি গম দেওয়া হতো।

এটাই ছিল আমার জীবনের প্রথম চাকরি–
আমি পরিবারের জন্য উপার্জন করতে চাচ্ছিলাম, তাই মনপ্রাণ দিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

তবে অন্যরা খনন থামিয়ে বসে পড়ত,
যখন কেউ তাদের দিকে তাকাচ্ছিল না বা তারা একা থাকত, তখন কাজ না করে আড্ডা দিত।
তারা আমাকেও বলল: "তুমি কেন কাজ করছো? কেউ তো দেখছে না।"
তারা আরও বলল, "দেখালেই হবে, সত্যি সত্যি খোঁড়ার দরকার নেই।"

কাজের সময় ছিল সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত।
প্রথম দিন প্রায় দুপুরের দিকে আমাদের গ্রামের এক প্রবীণ, হাজী বাহাউদ্দিন–যিনি আমার বাবার ছাত্র ও বন্ধু ছিলেন–
সালাওয়াত থেকে দেহ মেরাসায় যাওয়ার পথে আমার পাশ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন।
তিনি আমাকে দেখে গাড়ি থামিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন।

তিনি আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "হাজী মোল্লা সাহেব, আপনি কী নিয়ে ব্যস্ত?" আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি আমার হাতের দিকে তাকালেন। মাত্র আধা ঘণ্টা খনন কাজ করেছি, কিন্তু ইতোমধ্যেই হাতের গায়ে ফোসকা পড়ে গেছে এবং তা ফেটে রক্ত বেরিয়ে এসেছে। আমার হাত রক্তমাখা ছিল; খনন করার অভ্যাস আমার ছিল না।

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে কাঁদতে লাগলেন: "এই রকম হাত কাজের জন্য নয়," বলে তিনি আমার হাত থেকে কোদালটি নিয়ে নিলেন এবং আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিলেন। আমরা বাড়িতে পৌঁছলে তাঁর সামনে কিছু দেয়ার মতো কিছুই ছিল না, তাই কিছুক্ষণ পর তিনি চলে গেলেন। আমাদের ঘরে খাবার ছিল না, এমনকি এক কাপ চা-ও ছিল না। আমার ছয় মাসের ছেলে অসুস্থ ছিল। আমি গভীর চিন্তায় ডুবে ছিলাম–এই দুঃসময় থেকে মুক্তির উপায় খুঁজছিলাম–ঠিক তখন কেউ দরজায় এসে আমার নাম ধরে ডাক দিল।

হাজী বাহাউদ্দিন সাহেবের ছেলে নূর আলী দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল, তার হাতে একটি ময়দার বস্তা। সে বলল, "আমি কি এটা ঘরে এনে রাখতে পারি?" সে বস্তাটি উঠানে রাখল, তারপর পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে আমার হাতে দিল। বলল, "আমার বাবা বলেছেন, এই টাকা নিয়ে আপাতত আপনার সমস্যা মিটিয়ে ফেলুন।"

আমি টাকা গুনে দেখলাম, ষাট হাজার আফগানি–সে সময়ের জন্য অবিশ্বাস্য রকমের উদারতা। আমি কখনোই হাজী সাহেবের এই মহানুভবতা ভুলতে পারব না।

পরদিন আমি আমার ছেলেকে ডাক্তার দেখাতে কান্দাহার শহরে নিয়ে গেলাম। তখনও উস্তাদ আব্দুল হালিম ও মোল্লা নকীবের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। আমরা কারাগারের কাছাকাছি পৌঁছলে কিছু এলোমেলো চেহারার, মলিন ও বুনো লোক আমাদের বাস থামিয়ে দিল। তারা সবাইকে বাস থেকে নামতে বলল এবং ট্রেঞ্চ খননের নির্দেশ দিল। আমি তাদের একজনকে বললাম, "আমার ছয় মাসের ছেলে অসুস্থ, আমি তাকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি। ওর মা আমার সঙ্গে নেই।" কিন্তু লোকটি চিৎকার করে বলল, "যা, কাজ শুরু কর! যা জিজ্ঞেস করা হয়নি, তা নিয়ে কথা বলিস না।" সে হুমকি দিল, যদি আমি আর একটি শব্দ বলি, সে আমার শরীরে ত্রিশটা গুলি ঢুকিয়ে দেবে। সে আমাকে গালাগালি করল এবং বলল, "তুই মুজাহিদিনদের সাহায্য করতে চাস না কেন?"—এই ধরনের মুজাহিদদের লজ্জা! তারা পুরো জিহাদকে অপমানিত করেছে!

আমি বাসে কাউকে চিনতাম না, তাই ছেলেটিকে এক বৃদ্ধের হাতে দিয়ে বললাম, "ভাই! এই ছেলেটাকে চালকের কাছে পৌঁছে দাও। আমি যেই কাজ আমাকে জোর করে করানো হচ্ছে, সেটা শেষ করে এসে নিয়ে যাব। যদি আমার কিছু হয়, চালক আমার গ্রাম চেনে, সে ছেলেটিকে আমার স্ত্রীর কাছে নিয়ে যাবে।"

আমরা মোল্লা নকীব ও উস্তাদ আব্দুল হালিমের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার মাঝে ছিলাম। অনেক যাত্রী শহীদ হয়েছিলেন বা নিখোঁজ হয়েছিলেন এই জায়গায়, যখন তাদের ধরে খনন কাজে বাধ্য করা হতো। অনেক সময় নিরপরাধ মানুষদের গুলি করে মেরে ফেলা হতো, এবং তাদের দাফন কাফনের নিয়ম না মেনে কোনো রকমে গর্তে ফেলে দেয়া হতো, এমনকি পরিবারের কেউ জানতেও পারত না তারা মারা গেছেন।

আমি এখনো সেই জায়গায় পৌঁছাইনি, যেখানে আমাকে খনন করতে বলা হয়েছিল, তখন একজন আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, "ও মোল্লা সাহেব! আপনি এখানে কী করছেন?"

আমি বললাম, "আমাকে বাস থেকে নামিয়ে জোর করে কাজে লাগানো হয়েছে।"

সে কিছু না বলে তার সাথীকে ঘুরে বলল, "মাদার***! তুই কি গাজীকে চিনিস না? তুই তো গাজীদের বাস থেকে নামাচ্ছিস! দেখ, এই লোকটি হচ্ছে রাশিয়ান সময়ের গাজী–তুই ওকে চিনিস না?" সে আমাকে বলল,

“তুমি আবার বাসে উঠে যাও।” যে লোকটা আমাকে নামিয়েছিল, সে ক্ষমা চাইল। বলল, “চাচা, আমি কীভাবে জানতাম আপনি আমার বাবা তুল্য একজন মানুষ?”

আমি বেঁচে গেছি ভেবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম এবং আবার বাসে উঠে পড়লাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাস আবার থামল—এবার আমরা পৌঁছেছি হিন্দু কোটাই। এখন মোল্লা নকীবের লোকেরা এসে বাস থামাল। একজন বাসে উঠল, চারপাশে তাকাল, আবার নেমে গেল। সে কিছুই বলল না। এরপর আরেকজন বাসে উঠল, তার হাতে ছিল এক ব্যাগ ফল। সে ছিল চেকপোস্টে কর্মরত একজন মুজাহিদ।

বাস চলতে শুরু করলে আমি তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলাম, “ভাই! এই ফলের ব্যাগটা কত দিয়ে কিনেছো?” সে হেসে উত্তর দিল, “আমরা হাইওয়েতে ফলবাহী ট্রাক থেকে কমিশন নিই।” আমি জিজ্ঞেস করলাম, “একটা ট্রাক থেকে ক’ টা ব্যাগ নেন?” সে বলল, “দশটা ব্যাগ।” আমি বললাম, “তাহলে তো তোমরা ট্রাকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করো পাকিস্তান পর্যন্ত।” সে বলল, “না ভাই, ট্রাকগুলো নির্ভয়ে শুধু হাজারাজি বাবা পর্যন্ত যায়। এরপর রাস্তার দখল লালাইয়ের হাতে, তাঁর লোকেরাও তাদের কমিশন নেয়।” হাজারাজি বাবা ছিল হিন্দু কোটাই থেকে মাত্র তিন-চার কিলোমিটার দূরে। মনে হচ্ছিল, ট্রাকগুলো চেকপোস্টে পৌঁছাতে পৌঁছাতে তাদের অর্ধেক মাল হারিয়ে ফেলছে।

সন্ধ্যায় আমি ছেলেকে নিয়ে শহর থেকে ফিরে এলাম। আমি পরিবারকে বললাম, “আমার মনে হয় আফগানিস্তান এখন আর আমাদের জন্য নিরাপদ নয়।” যদিও পাঞ্জওয়াই জেলার প্রশাসক মুয়াল্লেম ফেদা মোহাম্মদ একজন ভালো মানুষ ও প্রকৃত মুজাহিদ ছিলেন, তবুও শহরে যাতায়াত এখন বিপজ্জনক ও কষ্টকর হয়ে পড়েছে। মুয়াল্লেম ফেদা ছিলেন কঠোর, তিনি তার জেলায় চোর, জুয়াড়ি ও মদ্যপদের প্রবেশ নিষেধ করেছিলেন এবং সবসময় আমাদের সহায়তা করতেন। কিন্তু তিনি কতদিন আর এই জেলাকে রক্ষা করতে পারবেন?

একবার ঈদের সময় উস্তাদ আব্দুল হালিম তাঁর লোকজন নিয়ে পাঞ্জওয়াই এসেছিলেন। তারা কুকুরের লড়াই ও জুয়ার মতো অপসংস্কৃতি ছড়াতে শুরু করেছিল। শহরে ঢুকেই তারা নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে। এরপর জেলার মুজাহিদরা একত্র হয়ে তাদের আনন্দকে শোকের দিনে পরিণত করে। অনেকেই আহত বা নিহত হয়, তবে উস্তাদ আব্দুল হালিম পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

অতঃপর আমি আমার পরিবারকে নিয়ে পাকিস্তানে পালিয়ে যাই। আমরা কোনো মূল সড়ক ব্যবহার করিনি। চোরাপথ ও বিকল্প রাস্তায় গিয়েছি, কারণ দক্ষিণ আফগানিস্তানে চরম বিশৃঙ্খলা চলছিল—ডাকাত ও দুর্বৃত্তদের দল পথচারীদের লুটে নিচ্ছিল, স্ত্রীদের ধর্ষণ করছিল। সেখানে কোনো নিরাপত্তা ছিল না, কোনো আইন ছিল না।

প্রাক্তন মুজাহিদ, চোর আর সন্ত্রাসীদের দল দেশটাকে রক্তাক্ত করছিল, আর কেউ তাদের জবাবদিহির আওতায় আনছিল না।

আমি স্বস্তি পেলাম যখন আমাদের যাত্রা কোনো বিপদ ছাড়াই পাকিস্তানে শেষ হলো। কোয়েটার কাছে সুমঙ্গলিতে আমার চাচাতো ভাই ওবায়দুল্লাহ আমাদের থাকার জন্য একটি ঘর দিলেন। হাজী বাহাউদ্দিনের দেয়া টাকা দ্রুত ফুরিয়ে গেল। আবারও আমি সমস্যায় পড়লাম। আমি চাচাতো ভাইদের কাছ থেকে ধার করে একটি ছোট দোকান খুললাম, কিন্তু তেমন আয় হতো না। তবুও আমি একটি ছোট ঘর ভাড়া নিয়ে আবার পড়াশোনা ও শিক্ষাদান শুরু করলাম।

ধীরে ধীরে আমি আফগানিস্তানের কথা ভুলতে শুরু করলাম। আমি জমি কেনা-বেচার কাজ শুরু করলাম। ঋণ নিয়ে ছোট প্লট কিনতাম, সেখানে ঘর বানিয়ে বিক্রি করতাম। কয়েক মাস সময় লাগত, কিন্তু বিক্রি করে লাভে বিক্রি করতাম, ঋণ শোধ করতাম, আরেকটি জমি কিনতাম। এভাবে আমার জমির সংখ্যা ও সম্পদ বাড়তে থাকল, আমার পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত হতে থাকল। আমি কঠোর পরিশ্রম করতাম, জেগে থাকা প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগাতাম।

ব্যবসা ভালো চলছিল। অবশেষে আমি পেশোয়ারে চলে গেলাম ইসলামি শিক্ষায় মনোনিবেশ করতে এবং পড়াশোনা সম্পন্ন করতে। সেখানেই আমি রাজনীতির প্রতি আগ্রহ অনুভব করতে শুরু করলাম।

TAKING ACTION

পরবর্তী কয়েক বছর আমি পাকিস্তানে ছিলাম, তবে নিয়মিত কান্দাহারে যাতায়াত করতাম। নব্বই দশকের গোড়ার দিকে, নাজিবুল্লাহ সরকারের পতন এবং মুজাহিদিন সরকারের আগমনের পর আফগানিস্তান যেন ধসে পড়ে। কাবুলে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, কিন্তু তা দ্রুত দক্ষিণ দিকেও ছড়িয়ে পড়ে। উস্তাদ আবদুল হালিম, হাজী আহমদ, মোল্লা নকীবসহ স্থানীয় কমান্ডাররা ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য শহর ও আশপাশের এলাকায় সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। যুদ্ধ এতটাই তীব্র হয়ে ওঠে যে স্বাভাবিক জীবনযাপন অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আমার এক যাত্রায় আমি গুল আহমদের বাড়িতে, যা কান্দাহার শহরের পূর্ব দিকে দেহ খুজা এলাকায়, ছয় দিন আটকে ছিলাম–শহরে ঢোকার আগে লড়াইয়ের কারণে অপেক্ষা করতে হয়। ওই সময় শহরের মানুষ শুক্রবারের নামাজের পর একত্রিত হয়ে কমান্ডারদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে নামে। হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে আসে, ঈদগাহ দরওয়াজা থেকে শুরু করে চারসু পর্যন্ত মিছিল করে–চারসু সেই পুরনো বাজার, যা শত শত বছর আগে আহমদ শাহ বাবা-র সময়ে স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু মিছিল থেমে যায় কাবুল দরওয়াজার চত্বরে, যেখানে বারু নামের এক প্রাক্তন মুজাহিদ, যে কিছু লোক জড়ো করে নিজের বাহিনী গড়ে তুলেছিল, একটি ট্যাঙ্ক নিয়ে অবস্থান নিয়েছিল।

কোনো পূর্বাভাস ছাড়াই সে মিছিলের ওপর গুলি চালায়। বারুর হাতে ডজনখানেক মানুষ শহীদ হন এবং বিক্ষোভ সেখানেই থেমে যায়। পরবর্তী কয়েক দিন প্রতিটি বাড়ি ছিল শোকস্তব্ধ–কেউ না কেউ পরিবারের সদস্য বা বন্ধু হারিয়েছিল। কিন্তু এমনকি জানাজা বা দাফনে যাওয়াও কঠিন ছিল, কারণ শহরের প্রতিটি গলি ও রাস্তা পরিণত হয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে, যেখানে খনন করা ট্রেঞ্চ দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছিল।

ষষ্ঠ রাতের শেষে যুদ্ধরত দলগুলো অস্ত্রবিরতিতে সম্মত হয়। লোকজন ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরোতে শুরু করল, তবু বাজারে যাওয়ার সাহস পাচ্ছিল না। শহর সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল–রাস্তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত, গুলির চিহ্নে ছেয়ে গেছে। দেয়ালগুলি বারুদের ধোঁয়ায় কালো হয়ে গিয়েছিল এবং অনেক ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। রাস্তায় ছড়িয়ে ছিল লাশ; প্রতিটি দেয়াল, চত্বর ও সড়ক রক্তে রঞ্জিত ছিল। শত শত দোকান লুট হয়ে গিয়েছিল যুদ্ধের মধ্যে, কিন্তু মানুষ অন্তত বেঁচে থাকার জন্য কৃতজ্ঞ ছিল।

আমি প্রথম রাতে কাজি কারিজে ছিলাম এবং দ্বিতীয় রাতে কান্দাহার শহরে পৌঁছাই। দক্ষিণ আফগানিস্তান জুড়ে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছিল অসংখ্য চেকপোস্ট, যেন ছত্রাকের মতো গজিয়ে উঠেছে। প্রতিটি চেকপোস্টে রাস্তায় চেন টানা হতো এবং যাত্রীদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা বা জিনিসপত্র দাবি করা হতো। শহরে যাওয়ার পথে হাজী লালক মামা সারাই ইয়ার্ডের কাছে আমাদের গাড়ি থামানো হয়।

চেকপোস্টে দাঁড়ানো ছিল একটি কিশোর—দেখতে যেন পনেরো বছর বয়সী কোনো কুমারী মেয়ের মতো, দামি চামানি টুপি পরে, হাতে আধা-ঢাকা মাকারভ পিস্তল, মুখে এলএম সিগারেট। সে আমাদের গাড়ির চালককে বলল: "নঘমার ক্যাসেট দাও।"
চালক বলল, "বেটা! থাকলে তো খুশিমনে দিয়ে দিতাম। কিন্তু গাড়িতে ক্যাসেট তো দূরের কথা, ক্যাসেট প্লেয়ারও নেই।"

ছেলেটি রেগে গিয়ে গাড়ির চাবি কেড়ে নেয়, ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে হাঁটতে শুরু করে। কেউ কিছু বলল না। গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তিনজন ছিল, সবারই মুখমণ্ডল পরিষ্কার শেভ করা, তারা সেই ছেলের সঙ্গেই ছিল। চালক নিচু স্বরে বলল, "আল্লাহ! কী লজ্জার সময় এসেছে! দেখো এই ছেলের কাণ্ড। কেউ কিছু বলতেও পারে না!"

কিন্তু সেই ছেলে শুনে ফেলে এবং ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, "তুই কী বললি?" চালক ভয়ে কেঁপে গিয়ে বলে, "কিছু বলিনি ভাই!" তখন ছেলেটি অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি শুরু করে, চালকের মা ও বোনকে নিয়ে কুৎসিত মন্তব্য করে, এমনকি পিস্তল বের করে কক করে ফেলে।

সবাই আতঙ্কে চিৎকার করে বলি, "দয়া করো ভাই! আল্লাহর ওয়াস্তে, এমন করো না!"
কিন্তু সে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে, নিজেই নিজেকে উত্তেজিত করে তুলছিল। তার সঙ্গীরা এগিয়ে এসে তাকে শান্ত করতে চায়, একজন এসে আমার পাশে দাঁড়ায়। আমি ধীরে ধীরে বলি, "ভাই, আপনি তো দেখছেন—গাড়িতে বুড়ো, বাচ্চা, নারী সবাই আছে। গাড়ি রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। আপনি এতক্ষণ ধরে এই বাচ্চাটার সঙ্গে তর্ক করছেন! একটা চড় লাগান, চাবি নিয়ে নিন। সে তো কোনো কমান্ডার না। ওর অস্ত্র নিয়ে নিন। ওর কাছে কিসের ভয়? আপনি তো বড় মানুষ, এটা আমাদের জন্য লজ্জা।"

লোকটি অসহায়ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, "মোল্লা সাহেব, আমরা কিছু করতে পারি না। সাবধান থাকতে হয়। সে বারুর ছেলে। বারু ওকে খুব ভালোবাসে। আমরা যদি ওকে একটা কথাও বলি, তাহলে বারু রেগে যাবে।"

অনেক অনুরোধের পর সেই ছেলে অবশেষে চাবি ফিরিয়ে দেয় এবং আমাদের যেতে দেয়।

আমি কয়েকদিন কান্দাহারে ছিলাম, তারপর পাকিস্তানে একটি শেয়ার্ড ট্যাক্সিতে ফিরে যাই। সড়কে চেকপোস্টে ঠাসা ছিল। প্রতি কয়েক কিলোমিটার পরপরই নতুন কোনো দল বা কমান্ডার গাড়ি থামিয়ে টাকা বা জিনিসপত্র চাইত। আজও লোকজন সেই সময়কে টোপকিয়ান নামে স্মরণ করে—অস্ত্রধারীদের সময়।

মিল ব্রিজে আমরা শাহ বারানের চেকপোস্টে পৌঁছাই। সে ছিল চোর ও প্রতারক। মিল ব্রিজ ছিল সেই জায়গা, যেখানে জাঙ্গাল রিফিউজি ক্যাম্পের সব চোর-ডাকাত শাহ বারানের নেতৃত্বে একত্রিত হয়ে ভ্রমণকারী ও

ব্যবসায়ীদের লুট করত। তারা ছিল ভয়ানক–মানুষের চেয়ে জানোয়ারের মতো দেখতে। বিশ্রী, লম্বা, অপরিষ্কার চুল মুখে পড়ে থাকত, সারা গায়ে ধুলো-ময়লা, ঠোঁট মোটা ও বাদামি, দাঁত কলা-তামাক, গাঁজা ও নস্যির দাগে বাদামী-হলুদ হয়ে গিয়েছিল। মোটা পশমি চাদরে মোড়া, তারা রাস্তার মাঝখানে বসে বিশাল চেলাম ফুঁকত। তারা একে একে উঠে এসে চেলাম টানত, তারপর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে জবুথবু হয়ে আড্ডা দিত।

আমরা ঠিক তাদের সামনে গাড়ি থামিয়ে বসে থাকি, কিন্তু তারা প্রথমে আমাদের খেয়ালই করে না। কেউ গাড়ি থেকে নেমে জানাতেও সাহস করে না যে আমরা অপেক্ষা করছি। আশেপাশে কোনো ট্রাফিক ছিল না, আমরা গাড়িতে বসে আতঙ্কিত চোখে তাদের চেলাম টানতে আর কথা বলতে দেখি। প্রায় পনেরো মিনিট পরে তারা আমাদের লক্ষ্য করে। শাহ বারান গাড়ির দিকে তাকায়, তারপর তার লোকদের দিকে:

“এই শালাদের ছেড়ে দাও, যেতে দাও,” সে বলে। আমরা খুব সৌভাগ্যবান ছিলাম। প্রায়ই শাহ বারান ও তার লোকেরা যাত্রীদের গাড়ি থেকে টেনে বের করে দাড়ি কামিয়ে দিত, রোজা ভাঙতে বাধ্য করত, এমনকি অনেক সময় কিশোর ছেলেদের অপহরণ করত।

*****

১৯৯২ সালে আমি আবার আফগানিস্তানে ফিরে আসি এবং পাঞ্জওয়াই জেলা কেন্দ্রে যাওয়ার পথে অবস্থিত একটি ছোট্ট গ্রামে–যেখানে মাত্র দশ বা পনেরোটি পরিবার বাস করত–সেখানে প্রয়াত হাজী খুশকিয়ার আকার মসজিদের ইমাম হিসেবে নিযুক্ত হই। আমি তখন শান্তি অনুভব করছিলাম, এবং জীবনে প্রথমবারের মতো সময় সহজে কেটে যাচ্ছিল; আমি পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকতে পারছিলাম। আমি পুরোপুরি শহর এড়িয়ে চলতাম এবং কোনো চেকপয়েন্ট বা চোর-ডাকাতদের আস্তানার ধারে-কাছেও যেতাম না। কোনো কিছু দরকার হলে আমি আমার জামাতের কাউকে বলতাম সেটা এনে দিতে। জিহাদের সময়কার বন্ধুদের সঙ্গেও খুব কম দেখা হতো, কেবল যখন কেউ ঐ গ্রাম দিয়ে যেত, তখনই একটু সাক্ষাৎ হতো।

যারা শহরে যেত, তারা ফিরে এসে বিশৃঙ্খলা আর নৈরাজ্যের গল্প শোনাত। আমি দূর থেকে মাঝে মাঝে গোলাবারুদের আওয়াজ শুনতাম। ঐসব গল্প আমাকে অস্থির করে তুলত; আমি জিহাদের সময় আর আমাদের আত্মত্যাগের কথা মনে করতাম। তখন মনে হতো, যেন সবই ব্যর্থ হয়ে গেছে। কিন্তু আমি ধৈর্য ধরতাম এবং আমার জামাতকেও একই উপদেশ দিতাম।

একদিন আমার দুজন পুরনো বন্ধু মসজিদে আমাকে দেখতে এল–আবদুল কুদ্দুস ও নেদা মোহাম্মদ। তারা উভয়েই মুজাহিদিন ছিল এবং আমরা একসাথে যুদ্ধ করেছিলাম। তারা রাতের খাবার খেয়ে রাত পর্যন্ত গল্প করল। আবদুল কুদ্দুস–যিনি পরবর্তীতে উত্তরে কাবুলে শহীদ হন–বললেন, "জীবন এখন অসহ্য হয়ে উঠেছে।

চুরি আর ডাকাতি অবধারিত হয়ে গেছে। সমকামিতা ও ব্যভিচার সর্বত্র। মানুষ কোনো নৈতিকতার কথা ভাবে না। মোল্লা সাহেব, আমরা কী করব? আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি।"

এটাই প্রথমবার ছিল না, যখন কেউ এসে এমন কথাগুলো আমাকে বলেছিল। কয়েক মাস ধরে মানুষ আমাকে বলছিল, তারা কতটা অসহায় বোধ করে–তাদের পাশে দাঁড়াবার মতো কোনো আদালত বা পুলিশ নেই। আমিও কিছু করতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম, এবং এটা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। আমি ভাবতাম, এটা কি আমার ধর্মীয় দায়িত্ব? এটাই কি আমার জিহাদের অংশ, নিজ দেশের মানুষদের উপর যারা টাকা আর ক্ষমতার জন্য অত্যাচার করছে, তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো?

আমার বন্ধুদের বয়স কম ছিল; তারা এক নতুন প্রজন্মের মানুষ, যারা পরিস্থিতির অসহনীয়তা নিয়ে খোলাখুলি বলত, কিন্তু কোনো কর্মফল বা পরিণতির কথা ভাবত না। আমি তাদের বলতাম ধৈর্য ধরতে। "আল্লাহ মহান" , আমি বলতাম, "অবস্থা বদলে যেতে পারে" । কিন্তু আবদুল কুদ্দুস ও নেদা মোহাম্মদ বলল, তারা শুধু বসে থাকতে পারছে না।

তাদের বাড়ির কাছে পাশমল এলাকায় কমান্ডার সালেহ একটি চেকপয়েন্ট চালাতো। সে আর তার লোকেরা শুধু মানুষকে হয়রানিই করত না, তাদের টাকা-পয়সা ছিনতাই করত, এমনকি নারীদের ধর্ষণও করত। তারা পরিকল্পনা করেছিল, সালেহকে অর্গান্দাব নদীর কাছে হত্যা করবে। সালেহ স্পেরওয়ানে এক মেয়ের সঙ্গে বাগদান করেছে, এবং প্রতিদিন নদী পার হয়ে তার কাছে যেত। তারা চেয়েছিল তাকে নদীর পাশে হত্যা করতে। তারা বলেছিল, "কমপক্ষে মানুষ তো তার হাত থেকে বাঁচবে।"

তাদের পরিকল্পনা খুবই জোরালো ছিল, আমি মনোযোগ দিয়ে শুনলাম, কিন্তু আমি এতে সম্মতি দিতে পারলাম না। আমি বললাম, "ধরো, তোমরা সালেহকে মেরে ফেললে, এরপর কী হবে? অন্য কেউ তো তার জায়গা নিয়ে একই কাজ করবে। তার গোত্র তো প্রতিশোধ নেবে। তখন কে তোমাদের রক্ষা করবে, শারিয়াহ আদালতেও কি যাবে?"

তারা কোনো জবাব দিতে পারল না। পরে জিজ্ঞেস করল, "তাহলে কী করব মোল্লা সাহেব?"

আমি বললাম, "যা করা দরকার, সেটা এখন আমাদের হাতে নেই। হ্যাঁ, যা আমরা করব, সেটা আমাদের দায়িত্ব, কিন্তু ফলাফল আল্লাহর হাতে। এখনো কিছু জানা যাচ্ছে না–পরিস্থিতি হয়তো ভালোও হতে পারে, খারাপও।"

আমরা তখনো আলোচনা করছিলাম, তখন আবদুল মোহাম্মদ নামের এক যুবক ঘরে ঢুকল। সে আমার জামাতের একজন ছিল, সদ্য শহর থেকে ফিরেছে। আমি তাকে চা খেতে আমন্ত্রণ জানালাম। জিজ্ঞেস করলাম, শহরের অবস্থা কেমন।

আবদুল মোহাম্মদ অবাক হয়ে বলল, “হাজী মোল্লা সাহেব, আপনি শহরের কথা জিজ্ঞেস করছেন, অথচ কিছুক্ষণ আগে তো আমরা এখানে রাস্তায় মরেই যাচ্ছিলাম!” আমি জিজ্ঞেস করলাম, গাড়ি দুর্ঘটনা হয়েছে নাকি?

সে বলল, “না! ডাকাত এসেছিল। মোটরবাইকে করে এসে আমাদের গাড়ি থামায়। একজন বন্দুক ধরে রাখে, আরেকজন বলে, ঘড়ি আর টাকা দিয়ে দাও।”

আবদুল মোহাম্মদ বলল, সে তখন তাদের ধমকে বলে, “দেশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, আর তোমরা দিনে দুপুরে ডাকাতি করছ?” তারা তাকে চুপ করতে বলে।

কিন্তু সে হাল ছাড়েনি। সে একজনকে ধরে ফেলে আর দুজনের মধ্যে কুস্তি শুরু হয়। সে অন্য যাত্রীদের বলে, “তোমরা দ্বিতীয় ডাকাতটিকে ধরো!” কিন্তু কেউ এগিয়ে এলো না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি তখন একে-৪৭ বের করে। কিন্তু কুস্তির কারণে সে গুলি চালাতে পারে না, নিজের সঙ্গীকেও মারার ভয় ছিল। সে পিছিয়ে গিয়ে বলে, “ছাড় না হলে সবাইকে মেরে ফেলব।” যাত্রীরা ভয়ে চিৎকার করে, আর আবদুল মোহাম্মদ বাধ্য হয়ে ছেড়ে দেয়। তারা পালিয়ে যায়।

এই ঘটনা শুনে সবাই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। অনেকে বলছিল, ঐ দুই ডাকাতকে খুঁজে বের করে তাদের বাড়িতে যাবে। আবদুল মোহাম্মদ চলে যাওয়ার পর আমি কথা বলি।

আমি বললাম, “প্রথমত, আমাদের আরও লোক দরকার, এমন একটা দল যাদের নিজস্ব শক্তি থাকবে। নিজেদের রক্ষা করতে পারবে, আর অন্যের অধিকারও রক্ষা করতে পারবে। আমাদের জনগণের সমর্থন দরকার, আর জনগণকে সঙ্গে নিয়ে একটা সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। শুধু নিজেদের সমস্যায় ফোকাস করলে হবে না”

আমি বললাম, “আমার মনে হয় আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। তাদের মতামত জানতে হবে, তাদের চিন্তা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। তারপর সবমিলিয়ে এমন একটা পথ বের করতে হবে যা সফলতার দিকে নিয়ে যাবে।”

তারা সম্মতি জানাল, কিন্তু বলল, “প্ল্যানটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাস্তবায়ন করতে হবে।”

*****

আমরা সোভিয়েতবিরোধী জিহাদের সময়কার অন্যান্য মুজাহিদিন ও তালিবানের সঙ্গে দেখা করা শুরু করলাম। কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা পেশমল গ্রামের মসজিদে একটি বৈঠক ডাকার সিদ্ধান্ত নিই। সেখানে মোট তেত্রিশজন ব্যক্তি উপস্থিত হয় এবং মোল্লা আবদুর রউফ আখুন্দ সভার সভাপতিত্ব করেন।

আলোচনা কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী হয় এবং শেষ পর্যন্ত আমরা একটি কর্মপরিকল্পনায় পৌঁছাই: আমরা অন্যান্য ধার্মিক মুজাহিদিন ও তালিবানদের সহযোগিতা চাইব এবং একত্রে সড়ক ও চেকপয়েন্ট থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত কমান্ডারদের উৎখাত করব। আমরা তিনটি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিই। প্রথম দলটি যাবে এমন ধর্মপরায়ণ মুজাহিদিনদের সঙ্গে দেখা করতে, যারা লুটতরাজ বা অন্য কোনো অন্যায়ে জড়িত নয়।

দ্বিতীয় দলটি যাবে তালিবান ও অন্যান্য ধার্মিক ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, যেন অন্তত তারা আমাদের বিরোধিতা না করে বা আমাদের পাশে দাঁড়ায়। তৃতীয় দলটি যাবে উলামা কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করতে এবং তাদের সমর্থন নিতে। বিশেষ করে, আমরা মর্যাদাসম্পন্ন বিচারক মৌলভী সাইয়্যেদ মোহাম্মদ পাশানাই সাহেবের ফতোয়া চাইছিলাম, যাতে আমাদের আন্দোলনের একটি ধর্মীয় বৈধতা থাকে।

সব দল তাদের কাজ সম্পন্ন করার পর আবার পাশমোলে একটি বৈঠক ডাকা হবে, যেখানে সবাই তাদের রিপোর্ট পেশ করবে। এক মাস পরে দ্বিতীয় বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দলের রিপোর্ট ছিল আশাজাগানিয়া–অনেক মুজাহিদিন আমাদের পরিকল্পনার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় দল শুধুই নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া নিয়ে ফেরে। তালিবান ও তাদের কমান্ডাররা শুধু সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানায়নি, বরং কেউ কেউ প্রকাশ্য বিরোধিতা করে। মৌলভী পাশানাই সাহেবের উত্তর ইতিবাচক হলেও, তিনি পরিকল্পনার সব অংশের সঙ্গে একমত ছিলেন না।

তবুও আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে, তার কিছু সমালোচনার পরেও আমরা পরিকল্পনার মূল কাঠামো অনুসরণ করব। বৈঠকে নেতৃত্বের প্রসঙ্গ আসে।

সবার মধ্যে আলোচনা হতে থাকে, কেমন ধরনের ব্যক্তি এই গোষ্ঠীর নেতা হওয়া উচিত। অধিকাংশই আমাকে অস্থায়ী নেতা হিসেবে প্রস্তাব করেন, কিন্তু আমি মনে করি না যে আমি সঠিক ব্যক্তি। আমি বললাম, যেসব প্রবীণ কমান্ডার নিজেরা লুটতরাজে জড়িত না হলেও, তারা আমাদের সমর্থন করতেন না; বরং তারাই প্রথম আমাদের বিরোধিতা করতেন। সুতরাং, আমি প্রস্তাব করলাম এমন কাউকে নেতা হিসেবে বেছে নেওয়া হোক যিনি রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ এবং পূর্বের কোনো কমান্ডারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। এই মানদণ্ডে আমি নিজেই উপযুক্ত নই। তখন আমরা নেতৃত্বের বিষয়টি স্থগিত রাখি এবং এমন একজন ব্যক্তিকে খোঁজার সিদ্ধান্ত নিই।

তবে বিভিন্ন জায়গায় দলের লোকজনকে পাঠানো হয় পরিচিত কমান্ডারদের সঙ্গে দেখা করতে–যেমন, মৌলভী আবদুল সামাদ, মোল্লা মোহাম্মদ ওমর আখুন্দ, মোল্লা ওবায়দুল্লাহ আখুন্দ এবং হেলমান্দ প্রদেশের আব্দুল গাফফার আখুন্দজাদা, প্রধান মোল্লা আবদুল ওয়াহেদ এবং মৌলভী আতাউল্লাহ মোহাম্মদ।

আমি যে গোষ্ঠীকে মোল্লা মোহাম্মদ ওমর আখুন্দ ও মোল্লা ওবায়দুল্লাহ আখুন্দের সঙ্গে দেখা করার প্রস্তাব দিয়েছিলাম, আমি নিজেই সেই দলে ছিলাম। আমি, শহীদ মোল্লা সত্তার এবং মোল্লা নেদা মোহাম্মদ সাঙ্গিসারে মোল্লা মোহাম্মদ ওমর আখুন্দের বাড়িতে যাই।

ওই সময়ে মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের স্ত্রীর একটি পুত্রসন্তান জন্মেছিল এবং তিনি কুরআন খতমের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। এলাকার ইমাম ও বন্ধুবান্ধব সবাই উপস্থিত ছিলেন। আমরাও কুরআনের একটি অংশ পাঠ করি। শেষে দোয়া হয় এবং খাবার পরিবেশন করা হয়। খাবারের পরে বেশিরভাগ অতিথি চলে যান। আমরা মোল্লা সাহেবের সঙ্গে একটি আলাদা ঘরে যাই এবং আমাদের পেশমল বৈঠকের বিস্তারিত এবং আমাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানাই। আমরা বলি, আপনি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য একজন যোগ্য নেতা হতে পারেন। আমাদের কথা শোনার পর তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকেন। এটাই ছিল তার স্বভাব–তিনি মনোযোগ দিয়ে সবাইকে শুনতেন, কাউকে থামাতেন না। তার পরে তিনি পরিপাটি ও ধারাবাহিকভাবে নিজের মতামত দিতেন।

শেষে তিনি বললেন, "আমি তোমাদের পরিকল্পনার সঙ্গে একমত। কিছু একটা করতেই হবে। কিন্তু আমি নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারি না।" তিনি মোল্লা সত্তার ও আমাকে লক্ষ্য করে বলেন, "তাহলে তোমরা কেন নেতৃত্ব নিচ্ছ না?" আমরা আমাদের অযোগ্যতার কারণ ব্যাখ্যা করি, কিন্তু তিনি তখনও দ্বিধায় ছিলেন। তিনি বলেন, "এটি একটি বিপজ্জনক দায়িত্ব। কী গ্যারান্টি আছে যে কঠিন সময়ে সবাই আমাকে একা ফেলে দেবে না?" আমরা তাকে আশ্বস্ত করি যে, যাঁরা এই আন্দোলনে আছেন তাঁরা সত্যিকারের তালিবান ও মুজাহিদিন।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার শেষে তিনি বলেন, তার কাছে এমন আরও কয়েকটি প্রস্তাব এসেছে। কেশকিনাখুদ জেলার প্রশাসক হাজি বাশার আমাদের মতের সঙ্গে একমত এবং সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। মোল্লা মোহাম্মদ ওমর বলেন, "আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব। মানুষের সমস্যার সমাধান করা আমাদের কর্তব্য। বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছা।"

তিনি আরও বলেন, "শেষ পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে, সবই আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। আমি কিছু উলামা কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করব এবং মৌলভী পাশানাই সাহেবকে বোঝানোর চেষ্টা করব। তারপর দেখা যাক কী করা যায়।"

আমার বাড়িতে আব্দুল কুদ্দুস ও নেদা মোহাম্মদের সঙ্গে প্রথম আলোচনা হওয়ার পর পরবর্তী চার থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যেই আমাদের সব বৈঠক ও পরামর্শ অনুষ্ঠিত হয়।

যা পরে 'তালিবান' নামে পরিচিত হয়, সেই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাবৈঠকটি ১৯৯৪ সালের দেরি শরতে (হেমন্তে) অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশজন ব্যক্তি সাঙ্গিসারের সাদা মসজিদে জড়ো হয়েছিলেন। মৌলভী সাহেব আবদুল সামাদ, মোল্লা মোহাম্মদ ওমর আখুন্দ, মোল্লা আবদুল সত্তার আখুন্দ এবং মোল্লা শের মোহাম্মদ মালাং বক্তৃতা করেন এবং তাদের দায়িত্বগুলো ব্যাখ্যা করেন।

সম্মানিত মৌলভী আবদুল সামাদকে তালিবানের আমীর হিসেবে মনোনীত করা হয় এবং মোল্লা মোহাম্মদ ওমরকে সংগঠনের সামরিক কমান্ডার হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। মোল্লা মোহাম্মদ ওমর উপস্থিত সকলের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করেন। প্রত্যেক ব্যক্তি কুরআনের উপর শপথ করে প্রতিজ্ঞা করেন যে, তারা তার পাশে থাকবেন এবং দুর্নীতিবাজ ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন।

এই বৈঠকে কোনো লিখিত গঠনতন্ত্র, কোনো লোগো, এমনকি সংগঠনের কোনো নামও নির্ধারিত হয়নি।

শরিয়াহ আমাদের দিকনির্দেশক আইন হবে এবং আমরাই তা বাস্তবায়ন করব। আমরা পাপের প্রতিরোধ করব এবং পুণ্যের প্রচার করব; এবং যারা এই ভূমিকে রক্তাক্ত করছে তাদের থামাব। বৈঠকের কিছুদিন পরই আমরা হাওয-ই মুদাত নামক স্থানে (হেরাত-কান্দাহার মহাসড়কের পাশে) নিজেদের একটি চেকপয়েন্ট স্থাপন করি এবং কাছাকাছি অঞ্চলে শরিয়াহ আইন প্রয়োগ করা শুরু করি।

আমরা কয়েকটি দল পাঠাই আশপাশের গ্রামগুলোতে, যাতে মানুষ জানতে পারে আমরা কারা, এবং তারা আমাদের জন্য রুটি ও টক দুধ সংগ্রহ করতে পারে। মোল্লা মাসউম এই সংগ্রহের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন এবং জনগণকে জানানোও তার দায়িত্ব ছিল। তালিবানদের অনেকেই এলাকায় সুপরিচিত ও সম্মানিত ছিলেন, এবং মানুষও সহযোগিতা করতে আগ্রহী ছিল।

এর পরদিন রাতেই বিবিসি ঘোষণা করে যে, আফগানিস্তানে একটি নতুন আন্দোলনের জন্ম হয়েছে এবং এটি সাঙ্গিসারে তালিবানদের মাধ্যমে শুরু হয়েছে। বিবিসির রিপোর্টে বলা হয়, তালিবানরা সেই সমস্ত বেআইনি সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে নির্মূল করতে চায় যারা জনগণকে লুটে নিচ্ছে। অথচ তালিবানদের কেউই তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো অফিসিয়াল ঘোষণা দেয়নি, কোনো সাক্ষাৎকার দেয়নি, এমনকি কোনো প্রেস বিবৃতিও দেয়নি।

তবুও, গণমাধ্যম সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন নাম ব্যবহার করতে শুরু করে–যেমন "তালিবান আন্দোলন" , "ইসলামিক মুভমেন্ট অব তালিবান" , "তালিবান গোষ্ঠী" , কিংবা শুধুই "মুভমেন্ট" । যদিও তালিবান তখন একটি গঠনমূলক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল এবং বাস্তবতায় রূপ নিয়েছিল, তবুও আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম।

আমি চিন্তিত ছিলাম পুরনো কমান্ডারদের নিয়ে। তারা আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং তাদের লোকজন একটি জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেবে না। আমাদের এমন একটা পথ খুঁজে বের করতে হতো, যাতে তাদেরও আমাদের কাতারে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

THE BEGINNING

আন্দোলনের প্রথম কয়েক দিন ছিল খুবই কঠিন সময়। আমাদের কাছে কিছু অস্ত্র ছিল, কিন্তু কোনো গাড়ি বা টাকা ছিল না। মোল্লা আব্দুল সত্তার এবং আমার কাছে প্রত্যেকেরই একটি করে মোটরবাইক ছিল, আর আমার কাছে বাড়িতে প্রায় দশ হাজার আফগানি টাকা ছিল যা আমি আন্দোলনের তহবিলে দিলাম। আমরা আমাদের মোটরবাইকগুলো আন্দোলনের জন্য উৎসর্গ করলাম। তবে আমার বাইকের ইঞ্জিন প্রথম দিনেই বিকল হয়ে যায়, ফলে মোল্লা সত্তারের রাশিয়ান মোটরবাইকটাই তালিবানদের একমাত্র যাতায়াতের মাধ্যম ছিল। ওই বাইকে কোনো এক্সহস্ট পাইপ ছিল না, তাই সেটার আওয়াজ অনেক দূর থেকে শোনা যেত, মাটি ও অলিগলির রাস্তা ধরে ঘোরাঘুরি করত। আমরা তাকে ডাকতাম "ইসলামের ট্যাঙ্ক" ।

মোল্লা মাসুম যখন গ্রামের ভ্রমণ করলেন, তখন অনেক মানুষ আমাদের চেকপয়েন্টে এসে সরাসরি তালিবানদের দেখতে লাগল। অনেক বছর পর প্রথমবার তাদের মনে আশা জাগল, আর অনেকেই আমাদের আদর্শকে দ্রুত গ্রহণ করল। তালিবান অঞ্চলটিতে সৌন্দর্য এনে দিল, যেমন কোনো ফুল মরুপ্রান্তরের সবচেয়ে নির্জন জায়গাকেও রঙিন করে তোলে। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই আন্দোলনে চারশোর বেশি সদস্য যোগ দিল। হেলমন্ডের বিভিন্ন জায়গা থেকে এবং এমনকি পাকিস্তান থেকেও মানুষ আমন্ত্রণ পেয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে আসছিল।

অনেক ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়ীরা আন্দোলনকে সহযোগিতার জন্য টাকা দান করতে শুরু করল। এক ব্যক্তি আমাদের চেকপয়েন্টে এসে পেছনে একটি বস্তা ভর্তি টাকা নিয়ে আসলেন। আমি এখনো মনে করি আমরা যখন নোটগুলো গুনছিলাম, মোট টাকা ছিল নব্বই কোটি আফগানি' রও বেশি। তখনকার সময় এটা একেবারে অবিশ্বাস্য এক পরিমাণ টাকা ছিল; এমন বড় অংকের কথা আমি কখনো কল্পনাও করিনি। আমরা তার উদারতায় স্তব্ধ হয়ে তাকে একটি রসিদ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলাম, যা তার দান ও সাদাকাহ হিসেবে স্বীকৃতি হিসেবে থাকবে, কিন্তু তিনি বললেন, "আমি এই টাকা শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করেছি। আমার নাম প্রকাশের প্রয়োজন নেই, কোনো রসিদ দরকার নেই।" অনেকে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দান করতে আসত।

আমরা মাইওয়ান্ড থেকে পাঞ্জওয়াই পর্যন্ত রাস্তায় চেকপয়েন্ট থেকে চেকপয়েন্টে যাতায়াত করতাম এবং সব কমান্ডার ও ডাকাতদের জানাতাম যেন তারা তাদের ব্ল্যাকমেইল এবং হয়রানি বন্ধ করে। কিন্তু বেশিরভাগই আমাদের অগ্রাহ্য করল। অনেকেই তাদের নিষ্ঠুর শাস্তি বাড়িয়ে দিল। তারা প্রতিটি গাড়ির সাথে যা আমাদের দিকে আসত, সেই গাড়িগুলোতে শাপ ও গালি ভরা বার্তা পাঠাতো। তারা আমাদের গরিব লোক, মুরাদের সন্তান, বা বন্যপাগড়াদের ডাকত। অনেক সময় আরও খারাপ গালি-গালাজও আমাদের কাছে আসত।

তালিবানদের নিকটস্থ চেকপয়েন্ট ছিল দারু খান-এর, তারপর ইয়াকুত, বিসমিল্লাহ, পীর মোহাম্মদ, সালেহ এবং কাইয়ুম খান। এগুলো শুধুমাত্র মাইওয়ান্দ ও পাঞ্জওয়াইয়ের চেকপয়েন্ট। রাস্তার পাশে এমন অনেক জায়গাও ছিল যেখানে পরিচিত চোরেরা দিনদিন দাঁড়িয়ে যাত্রীদের লুটত।

তালিবানদের তখন কোনো পরিকল্পনা ছিল না এই দুই জেলার বাইরে তাদের কার্যক্রম বাড়ানোর। আমরা মূলত আমাদের বন্ধু ও প্রতিবেশীদের, যাদের গ্রাম ও শহরে আমরা বাস করতাম, তাদের কথা ভাবছিলাম। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে কিছু একটা করতে হবে, কিন্তু কেউই সাহস পায়নি বা চায়নি দুর্নীতিবাজ কমান্ডার ও ডাকাতদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। আমরা কেবল রাস্তার ধারে বসবাসকারীদের জানাতাম। কিন্তু তারা আমাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে পরিস্থিতি আরও খারাপ করে তুলল।

আলোচনা আর কোনো কাজের ছিল না। আমাদের প্রমাণ করতে হতো যে, আমাদের দাবি না মানলে আমরা কাজ করব। এক বৈঠকে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম দারু খানের চেকপয়েন্টে আক্রমণ চালাব। দশ থেকে বারো জন তালিবান, যাদের মধ্যে একটি আরপিজি এবং কয়েকটি কালাশনিকভ ছিল, কাছাকাছি একটি গ্রাম থেকে চেকপয়েন্টের দিকে এগিয়ে গেলো, অন্য একটি দল রাস্তা দিয়ে এলো। দারু খান যখন আমাদের দেখল, গুলি চালানো শুরু করল এবং লড়াই শুরু হলো। তাকে দুই দিক থেকে আক্রমণ করা হচ্ছিল এবং সে বুঝতে পারল আমরা সিরিয়াস — তার চেকপয়েন্ট মেনে নেব না এবং তার যুদ্ধ করলেই আমরা পিছু হটব না। কিছু তার লোক নিহত হল। দারু খান তখন আমাদের কাছে গিয়ে ভিক্ষা করল:

"আল্লাহর জন্য! আমাকে মেরে ফেললে তোমাদের কিছু লাভ হবে না। আমি মুসলিম। আমি তোমাদের সঙ্গে সহযোদ্ধা হিসেবে জিহাদ করেছি। আমাকে যাওয়ার সুযোগ দাও, আমি তোমাদের যে কোনো আদেশ পালন করব!" এমন কথা বলে সে আমাদের ঠকিয়ে পালিয়ে গেল। যখন ইয়াকুত, বিসমিল্লাহ ও পীর মোহাম্মদ দেখল দারু খানের অবস্থা, তারা যুদ্ধ না করে নিজেদের পোস্ট ছেড়ে দিল।

কিন্তু রাস্তার একটু নিচে সালেহ পা গর্বে বলছিলো কিভাবে সে মুরাদের সন্তানদের পরাজিত করবে, কিভাবে আমাদের ধ্বংস করবে এবং কোনো তালিবের পালানোর সুযোগ থাকবে না। সালেহ অনেক লোকের কমান্ডার ছিল, মাঝে মাঝে শতাধিক লোক। এবং সে একা ছিল না; শহরের কমান্ডারদের, যেমন উস্তাজ আবদুল হালিম ও সারকাতেব তার পাশে ছিল। আমরা শুনেছি তারা তাকে লোক ও অস্ত্র পাঠিয়েছিল। সারকাতেব ও উস্তাজ জানত দারু খানসহ অন্যান্য চেকপয়েন্টের কথা। সালেহ ছিল তাদের শহরের এবং আমাদের মাঝখানে শেষ প্রতিবন্ধকতা। তারা জানত আমরা এগোচ্ছি। তাই সালেহ-কে সমর্থন করে তালিবানদের শহরে প্রবেশ ঠেকাতে চেয়েছিল।

আমরা তিনটি প্রতিনিধি দল পাঠালাম সালেহর চেকপয়েন্টে এবং অবশেষে তাকে এবং তার লোকদের একটি সময়সীমা দিলাম। তাদের চেকপয়েন্ট ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে, নাহলে আক্রমণ হবে। সে কোনো সাড়া দিল না।

সময়ের পরের দিন দু’ দিনও সালেহ থেকে কোনো খবর না পেয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম। আমাদের বাহিনী তিন ভাগে বিভক্ত ছিল, সবচেয়ে বড় দলে ছিলেন আব্দুল কুদ্দুস ও নেদা মোহাম্মদ, যারা কয়েক মাস আগে আমার মসজিদে এসে সালেহ-কে নদীর ধারে মারার পরিকল্পনা করেছিল।

আমরা সব পালানোর রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিলাম, এক দল কাছের গ্রামে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। আমাদের বাহিনী পশ্চিম দিক থেকে এগিয়ে গেল। সালেহ আমাদের উপর গুলি চালাল, কিন্তু সংক্ষিপ্ত লড়াইয়ের পর সে ও তার লোকেরা গ্রামে পালানোর চেষ্টা করল। তারা আমাদের ফাঁদে পড়ল। সালেহ দুই ফ্রন্টের মাঝে আটকা পড়ল, তার লোকেরা এক থেকে দুই ঘণ্টা লড়াই করল তারপর শহরে পালানোর চেষ্টা করল। তারা তাড়াহুড়ো করে পালিয়ে অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ তাদের সরঞ্জাম ফেলে গেল।

আমরা বেসটি দখল করলাম, কিন্তু পেছনে একটি গর্তে দুটি হেরাতি নারীর নগ্ন দেহ পেলাম। আমরা ভ্রমণকারীদের থেকে শুনেছিলাম সালেহ ও তার লোকেরা বাস থেকে নারীদের জোর করে নামিয়ে ধর্ষণ করত।

পরে জানা গেল ওই নারীরা–যাদের শরীরে পিটুনির এবং ধর্ষণের চিহ্ন ছিল–হেরাত থেকে কান্দাহারের পথে যাত্রা করছিলেন। দৃশ্যটা ও ঘটনা ভয়াবহ ছিল, সবাই রাগান্বিত হল। যারা আগে আমাদের উদ্দেশ্য নিয়ে নিশ্চিত ছিল না, তারা নিশ্চিত হল যে আমরা সঠিক কাজ করছি এবং আমাদের সমর্থন আরও বেড়ে গেল।

*****

হাজী বাশার, কেশকিনাখুদের প্রশাসক, এমনকি কেউ চায়নি তবুও তাঁর এলাকা তালেবানদের হাতে তুলে দেন। তিনি ইতোমধ্যে একটি টয়োটা ড্যাটসান এবং একটি হিনো ট্রাক দান করেছিলেন। আব্দুল ওয়াসি, যিনি একজন সুপরিচিত ও সাহসী মুজাহিদ ছিলেন এবং প্রয়াত মোল্লা আবদুল হাইয়ের অধীনে যুদ্ধ করেছিলেন এবং পরবর্তীতে একজন প্রভাবশালী ব্যবসায়ীতে পরিণত হন, তিনি একটি ল্যান্ড ক্রুজার দান করেছিলেন।

হাজী বাশার একজন ভালো মুজাহিদ ছিলেন এবং রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় জামিয়াত দলের একটি ফ্রন্টের কমান্ডার ছিলেন। যদিও তিনি আমাদের অনেকের চেয়ে ছোট ছিলেন, তবুও তিনি সাহসী ও উদার ছিলেন। তিনি জিহাদের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং অধিকাংশ সামরিক অভিযানে আমাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি খুশি হয়েই নিজের জেলা তালেবানদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আমি মনে করি কীভাবে তিনি কেশকিনাখুদের প্রধান বাজারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি হতে চান যাকে তালেবানদের প্রতিষ্ঠিত শরিয়াহর আওতায় বিচার করা হবে। তিনি বলেন, “আমি গর্বিত যে আমি নিজের ইচ্ছায় শরিয়াহর সামনে প্রথম দাঁড়ালাম।” তিনি তালেবানদের বলেন, “আমার মাথা প্রথমে মুড়িয়ে দিন, যাতে আমার জেলার অন্যরা শিক্ষা পায়।”

মোল্লা নাকিব, যিনি আলিকোজাই গোত্রের নেতা এবং আর্গানদাব জেলায় রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য পরিচিত ছিলেন, তিনিও তালেবানদের সমর্থন দেন। মোল্লা নাকিব তখন কান্দাহারের সবচেয়ে শক্তিশালী নেতাদের একজন ছিলেন–সম্ভবত সবচেয়ে শক্তিশালী–এবং তাঁর আলিকোজাই গোত্র যুদ্ধক্ষেত্রে অপরাজিত ছিল। অন্যান্য অনেক কমান্ডার চেষ্টা করেছিলেন মোল্লা নাকিবকে তালেবানদের বিরোধিতা করতে এবং শহরে তাদের প্রবেশ ঠেকাতে রাজি করাতে। কিন্তু তিনি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে বরং হঠাৎ করে হিন্দু কোতাই এলাকার নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে তুলে দেন। হিন্দু কোতাই ছিল শহরের ভেতরের তাঁর প্রধান ঘাঁটি এবং তাঁর অধিকাংশ সেনা সেখানে অবস্থান করত।

তালেবানদের প্রাথমিক সাফল্য এবং মোল্লা নাকিবের সমর্থনের খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেকেই এসে যোগ দেয়। প্রয়াত মোল্লা মোহাম্মদ রাব্বানী আখুন্দ পরে মোল্লা নাকিবের অনুসরণে তালেবানদের সাথে যুক্ত হন; এর ফলে দক্ষিণ-পূর্বের আরঘেস্তান জেলা আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসে।

শীঘ্রই আমরা পুরো আফগানিস্তানে পরিচিত হয়ে উঠি। একদিন আজিজুল্লাহ ওয়াসেফি এবং হামিদ কারজাইয়ের পিতা হিন্দু কোতাইয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে আসেন। আমি মনে করতে পারি না হামিদ কারজাই নিজে সেখানে ছিলেন কি না, কারণ আমি সেই বৈঠকে অংশ নিইনি। আমি এমন একটি বাড়ির ছাদে বসে ছিলাম, যেখান থেকে সামনের উঠানটা দেখা যেত। বৈঠকটি নিচের ঘরে হচ্ছিল, যেখানে কারজাই, ওয়াসেফি, মোল্লা মোহাম্মদ রাব্বানী এবং মোল্লা বুরজান একত্রে বসেছিলেন।

কারজাই, ওয়াসেফি, মোল্লা মোহাম্মদ রাব্বানী ও মোল্লা বুরজান চুপচাপ কিছু পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছিলেন, এবং যদিও আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম না, তবুও ছাদ থেকে কথার কিছু টুকরো শুনতে পাচ্ছিলাম। তারা কিছু পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছিলেন, কিন্তু মোহাম্মদ রাব্বানী এবং মোল্লা বুরজান তাঁদের সঙ্গে একমত হননি। মাঝে মাঝে তারা উচ্চস্বরে বিতর্ক করছিলেন।

রেড ক্রসসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরাও প্রায়ই হিন্দু কোতাইতে আসতেন। মাঝেমধ্যে সাংবাদিকরাও আসতেন, কিন্তু আমরা তাদের নিয়ে তেমন মাথা ঘামাতাম না। তারা প্রায়ই অনেক দাবি নিয়ে আসত, এবং একবার একজন সাংবাদিক আমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল। যেহেতু আমাদের মিডিয়ায় সাক্ষাৎকার দেওয়ার অনুমতি ছিল না, আমি তাকে বলি আমাদের নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলতে, আমার সঙ্গে নয়। কিন্তু সে আমার কথাকে সাক্ষাৎকারের আমন্ত্রণ হিসেবে নেয় এবং তালেবান নেতৃত্ব সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করতে শুরু করে। আমি তাকে বলি যে মোল্লা বুরজান এবং মোল্লা মোহাম্মদ রাব্বানী আমাদের নেতা, কিন্তু তারা তখন ঘাঁটিতে

নেই। এরপর সাংবাদিকরা এমন কাউকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করত যে তাদের সাক্ষাৎকার দিতে পারবে, কিন্তু তালেবানরা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত।

*****

সালেহ চলে যাওয়ার পর তালেবানরা রাস্তা থেকে অধিকাংশ চেকপয়েন্ট সরিয়ে দেয়, তাও বেশিরভাগই লড়াই ছাড়াই। নাদির জান শাহ আঘা মোড়ে একটি চেকপয়েন্ট নিয়ন্ত্রণ করছিলেন এবং শুরুতে তিনি প্রতিরোধ করেন। আমরা তাকে তিনবার সতর্ক করি, কিন্তু তিনি রাস্তা ছাড়েননি। তবে লড়াই শুরু হতেই তিনি পালিয়ে যান। তার চলে যাওয়ার পর শুধুই সারকাতেব আত্তা মোহাম্মদ এবং উস্তাদ আবদুল হালিম রইলেন রাস্তার পাশে। তাঁদের বাহিনী আগের যেকোনো গ্রুপের চেয়ে শক্তিশালী ও জনবহুল ছিল।

এখনও পর্যন্ত আমরা তাঁদের এলাকায় মুক্তভাবে চলাফেরা করছিলাম, কিন্তু আমাদের মধ্যে শত্রুতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। যখনই আমরা রাস্তা দিয়ে যেতাম, তারা শত্রুতার আচরণ করত। আমরা চাইছিলাম সমস্ত সশস্ত্র গোষ্ঠী সড়ক এবং মহাসড়ক ছেড়ে দিক, এবং ভারী অস্ত্রগুলো একত্রিত করা হোক, কিন্তু সারকাতেব ও উস্তাদ তা তালেবানের হাতে তুলে দিতে রাজি ছিলেন না। মোল্লা নাকিব ও সারকাতেবের মধ্যে উত্তেজনা ছিল এবং তাঁদের বাহিনী প্রতিদিনই সংঘর্ষে জড়াচ্ছিল।

তালেবানরা একাধিকবার সারকাতেবের সঙ্গে কথা বলে তাঁকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করে, কিন্তু তিনি আমাদের সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। আমরা তিনটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে গাড়ি, কালাশনিকভ ও নিরাপদ যাত্রার প্রস্তাব দেই, যদি তিনি সরে যান। কিন্তু তিনি আমাদের প্রতিনিধিদের আটক করে তাঁর কারাগারে পাঠিয়ে দেন। আমরা তাঁকে যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছিলাম, কিন্তু পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যায়। একসময় রিপোর্ট আসে যে সারকাতেব মোল্লা মোহাম্মদ ওমরকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছেন। তিনি শহর থেকে বাড়ি ফেরার পথে তাঁর কনভয়ে হামলার পরিকল্পনা করেছিলেন। মোল্লা ওমর আর সেই রাস্তা ব্যবহার করা বন্ধ করে দেন–এটি তাঁর জন্য আর নিরাপদ ছিল না।

পুরো কান্দাহারে একসঙ্গে তিনটি ভিন্ন গ্রুপ আধা-স্বাধীনভাবে তালেবান আন্দোলন চালাচ্ছিল। মোল্লা ওমর সিদ্ধান্ত নেন আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করার। তিনি মোল্লা মোহাম্মদ রাব্বানি আখুন্দ ও মৌলভী আবদুর রাজ্জাককে একটি বৈঠকে ডাকেন। তাঁরা উভয়ে পবিত্র কুরআনের ওপর শপথ করে মোল্লা ওমরের অনুসরণ করার অঙ্গীকার করেন এবং তালেবানের তিনটি অংশ তাঁর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়।

আমরা হঠাৎ করে পাকিস্তান সীমান্তের কাছে স্পিন বোলদাক জেলা কেন্দ্রে আক্রমণ করি। কয়েকটি ট্রাক বাজারে প্রবেশ করে এবং আমাদের বাহিনী হঠাৎ ট্রাক থেকে নেমে পুলিশ দপ্তরের সামনে অবস্থান নেয়। আমরা পনেরো

মিনিটের মধ্যে জেলা দখল করি। মোল্লা আখতার জান পালিয়ে যান এবং তাঁর অধিকাংশ লোক তালেবানে যোগ দেন অথবা বাড়ি ফিরে যান।

দ্বিতীয় দিনে, আমরা মোহাম্মদ নাবির চেকপোস্ট ঘ্রা ও রুট থেকে সরিয়ে দিই এবং তালেবানরা বোলদাক থেকে মীল ব্রিজ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। শাহ বারান তাঁর চেকপয়েন্টে পৌঁছার আগেই পাইপ ও হাশিশ-সেবনকারী লোকজন সরিয়ে ফেলেন। তবে তাখতেপুর থেকে বোযো সাওকাই পর্যন্ত এলাকা মানসুরের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং তিনি ও তাঁর লোকজন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল।

আমি তখন হিন্দু কোতাইতে ছিলাম। আমাকে পনেরো জন মানুষ দিয়ে উস্তাদ আবদুল হালিমের নিকটে নারেদালাই মাকতাব এলাকায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। আমি দায়িত্ব নিতে চাইনি এবং তা এড়াতে অনেক চেষ্টা করি, কিন্তু সেদিনই তাখতেপুর দিক থেকে তীব্র লড়াই শুরু হয়, এবং আমাকে বাধ্য হয়ে নেতৃত্ব নিতে হয়।

দুপুরে সারকাতেব ও উস্তাদ আবদুল হালিম পুরনো শহরের দিক থেকে মাহালাজাত হয়ে তাখতেপুলে ট্যাংক ও দশকা পাঠায়। উস্তাদের লোকজন আমাদের শক্তি কম ভেবেছিল। তারা লোকদের বলে বেড়াত, “যদি তালেবানদের লাশ থেকে পাগড়ী দরকার হয়, তাহলে কাল এসে যত খুশি নিয়ে নিও।”

তারা দুটো ট্যাংক ও একটি দাশাকা নিয়ে কারাগারের সামনে অবস্থান নেয়। আমাদের কাছে মাত্র একটি আরপিজি ও কিছু কালাশনিকভ ছিল। তারা আমাদের অস্ত্রে ছাপিয়ে গিয়েছিল এবং আমাদের দ্রুত ভালো অস্ত্র দরকার ছিল। আমি হিন্দু কোতাই ফিরে যাই ৮২ মিমি কামান খোঁজার জন্য। ফিরে দেখি মোল্লা নাকিব ও মোল্লা বুরজান একসঙ্গে বসে আছেন। আমি সালাম দিয়ে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করি এবং বলি যে উস্তাদ দুইটি ট্যাংক এনেছেন, তাই ৮২ মিমি কামান দরকার।

মোল্লা নাকিব বলেন, “কখনও একজনের দুশ্চিন্তা অন্যদেরও চিন্তিত করে তোলে। তালিব! চিন্তা কোরো না! যদি তারা দুইটা ট্যাংক এনেছে, তাহলে তুমি তিনটা নাও।”

আমি বললাম, “মোল্লা সাহেব! আমাদের তো ট্যাংকই নেই!”
তিনি হেসে সামরিক কোর ভবনের দিকে ইশারা করে বলেন, “ওখানে ট্যাংকে ভরা, সবই তোমার জন্য প্রস্তুত”। তাঁর সেই উৎসাহব্যঞ্জক কথাগুলো আমি এখনো কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। আমি ফিরে যাই নিজের অবস্থানে।

উস্তাদের লোকেরা মোয়ালেম নামের এক ব্যক্তির নেতৃত্বে আমাদের কাছে প্রতিনিধি পাঠায়। তারা আমাদের এলাকা ছেড়ে দিতে বলে। আমি বুঝিয়ে বলি, আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নির্দেশ আছে, আর কথা বলতে হলে নেতৃত্বের সঙ্গে করতে হবে। কিন্তু তারা গালাগালি করে চলে যায়, বলে “কাল দেখা হবে!”

তারা চলে যাওয়ার পর আমরা তাখতেপুর দিক থেকে কোনো ধরনের গতিবিধির জন্য সতর্ক নজর রাখি। রাত প্রায় দশটা বাজে, এক দূত এসে খবর দেয় তাখতেপুর আমাদের বাহিনী দখল করেছে, এবং আমাদের সড়কে প্রহরা দিতে হবে যাতে কেউ সারপোজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করতে না পারে।

রাত বারোটার দিকে একটি গাড়ি তাখতেপুর দিক থেকে আমাদের অবস্থানের দিকে আসে। দূর থেকেই হেডলাইট দেখা যাচ্ছিল এবং লোকেরা চিৎকার করে বলছিল, "তালেবান ভাই, গুলি কোরো না! আমরা কথা বলতে এসেছি!"

আমরা অস্ত্র নামিয়ে রাখি এবং আমি গিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা জানাই। উস্তাদ আবদুল হালিম নিজেই এসেছিলেন। তিনি গাড়ির ভেতরে ছিলেন এবং জানতে চান মোল্লা বুরজান কোথায়। আমি বলি, "তিনি আমাদের সঙ্গে নেই, সম্ভবত হিন্দু কোতাইয়ে আছেন।"
তিনি বলেন, তিনি ওখানে যেতে চান, মোল্লা বুরজান বা অন্য কোনো সিনিয়র তালেবানের সঙ্গে দেখা করতে চান।
আমি বলি, আমার নির্দেশ আছে–কাউকে পেরোতে দেওয়া যাবে না।
তিনি অবাক হয়ে বলেন, "আমি উস্তাদ! আমাকে পর্যন্ত যেতে দিচ্ছ না?"
আমি বলি, "আমি জানি আপনি কে, কিন্তু আমার নির্দেশ অনুযায়ী কাউকে পেরোতে দেওয়া যাবে না।"

উস্তাদ প্রথমে রেগে যান, কিন্তু যখন দেখেন রাগে কিছু হচ্ছে না, তখন ধীরে কথা বলতে শুরু করেন। কিন্তু যতই চেষ্টা করেন, আমরা তাঁকে যেতে দেইনি। অবশেষে তিনি চলে যান। কিন্তু এক ঘণ্টা পরে আবার ফিরে আসেন, বলেন তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বার্তা আছে এবং তিনি তালেবানের বন্ধু ও দাস, এমনকি বলেন তিনি তালেবানের কুকুর পর্যন্ত। তবুও আমরা তাঁকে পেরোতে দিইনি।

তিনি চলে যাওয়ার পর আমার মনে পড়ে যায় সোভিয়েত ও তাদের পুতুল সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদের সময়কার ঘটনা। তখন উস্তাদ তালেবান ও উলামাদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন নিজের স্বার্থে। গুজব ছিল, তিনি কেবল আমাদের নাম উচ্চারণ করেন গালাগাল করার সময়। লোকেরা বলত, তিনি সাধারণ মানুষদের লুট করতেন এবং মুজাহিদদের কাছ থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে তাঁদের জিহাদে অংশগ্রহণ বন্ধ করে দিতেন।

আমরাও শুনেছিলাম যে, সে মুজাহিদিনদের সম্পর্কে সরকারকে গোয়েন্দা তথ্য দিয়েছে এবং মাঝে মাঝে তাদেরকে লজিস্টিক সহায়তাও করেছে। এটা সাধারণভাবে জানা ছিল যে, তার জব্বার নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং সে তাকে প্রায়ই দেখা করত।

সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছয়টি তালেবান ফ্রন্ট মাওলানা হাজী মোহাম্মদ ওমরের পানজওয়াইয়ের বাড়িতে একত্রিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং আমরা দ্রুত একমত হই যে উস্তাজকে নিরস্ত্র করা উচিত। কিভাবে যেন সে

সভার কথা জানতে পেরে যায় এবং আমন্ত্রণ ছাড়াই হাজী মোহাম্মদ ওমরের বাড়িতে ঢুকে পড়ে, যেখানে আমরা সবাই বসা ছিলাম। তাকে দেখে সবাই বিস্মিত হয় এবং সে কোনো ভণিতা না করেই কথা বলা শুরু করে দেয়।

সে বলল, “এটা আমাদের সবার জন্য এক ভালো সুযোগ। সম্মানিত লোকেরা এখানে একত্রিত হয়েছেন। আপনারাই ছয় তালেবান ফ্রন্টের নেতা এবং সম্মানিত উলামায়ে কেরাম। আমি আপনাদের বিনীত সৈনিক, আপনাদের খাদেম, এমনকি আপনাদের পুত্র। আপনারা যা আদেশ দেন আমি তা মেনে চলি। যদি আমাকে বন্দি করতে চান, আমি প্রস্তুত। যদি আমাকে হত্যা করতে চান, তাতেও আমি প্রস্তুত।”

তার এই বক্তব্যের পর আমরা চুপ করে বসে থাকি। কেউ কিছু বলতে সাহস করল না। সে আলোচনায় হঠাৎ করে হস্তক্ষেপ করেছিল এবং কেউ জানত না এর প্রতিক্রিয়া কী হবে। দীর্ঘ সময় ধরে ঘরটা নিস্তব্ধ ছিল, আমি তখন ভাবছিলাম – সে এই বৈঠকের কথা কিভাবে জানতে পারল? কে তাকে জানিয়েছিল? সে আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে তার কোনো কমিউনিস্টদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, এবং সে জনগণকে কষ্ট দিচ্ছে না। সে বলেছিল, কেউ একজন তার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলছে, এবং তখন আমরা তাকে বিশ্বাস করেছিলাম।

পরে আমরা জানতে পারি যে, উস্তাজ প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েত এবং আফগান সরকারের সঙ্গে কাজ করছিল। কাবুল থেকে সে নিয়মিত বেতন পেত – এর প্রমাণও ছিল। সে হাজী বাশারকে আক্রমণ করেছিল, মরুভূমি এবং রাস্তাগুলো দিয়ে সরকারি বাহিনীর সহায়তায় কেশকিনাখুদ থেকে গ্রামগুলোতে হামলা চালিয়েছিল। আমি তখন ঘটনাস্থলে ছিলাম এবং রেডিওতে তাদের কথোপকথন শুনেছিলাম।

হিন্দু কোটাইতে দাঁড়িয়ে, যখন উস্তাজ আমাদের পোস্ট অতিক্রম করার চেষ্টা করছিল, আমি মনে করছিলাম সে কীভাবে অতীতে আমাদের ধোঁকা দিয়েছিল। সেই রাতের বাকি অংশ শান্ত ছিল, এবং যখন ভোর হল – সে এবং তার লোকজন উধাও হয়ে গিয়েছিল। ট্যাঙ্ক আর যানবাহন – সবই চলে গিয়েছিল; তারা সবাই পালিয়ে গিয়েছিল। সেই একই রাতে তালেবান বাহিনী কান্দাহার বিমানবন্দর দখল করে নেয়, এবং সকাল ৯টার মধ্যেই আমাদের বাহিনী হেরাত গেট দিয়ে শহরে প্রবেশ করে। কেবল গুল আঘা শেরজাইয়ের কিছু লোক শিকারপুর বাজারে তালেবানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, কিন্তু বাকি কান্দাহার একটাও গুলি না ছুড়েই আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

তবে বাগ-এ-পুল থেকে মিরওয়াইস মিনা পর্যন্ত এলাকা এখনও সারকাটেবের নিয়ন্ত্রণে ছিল। তার লোকজন হাজী মাওলানা বুরজান আখুন্দ এবং হাজী আমির মোহাম্মদ আঘাকে আটক করেছিল এবং তারা আমাদের পানজওয়াই যাওয়ার পথ বন্ধ করে দিয়েছিল।

একটি বার্তা আসে যে আমার পরিবারের একজন সদস্য অসুস্থ এবং আমাকে দ্রুত বাড়ি ফিরে যেতে হবে। আমি আমার কমান্ড হাজী মাওলানা আব্দুল সাত্তার আখুন্দের কাছে হস্তান্তর করে একটি বাসে উঠি। যখন বাস মিরওয়াইস মিনার কাছে পৌঁছায়, আমি দেখতে পাই দশজন লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে – তাদের হাতে পিকেকে

মেশিনগান এবং গায়ে গুলির বেল্ট। তারা বাস থামায় এবং তল্লাশি শুরু করে। একজন চালককে জিজ্ঞেস করে, “বাসে কোনো তালেবান আছে কি?”

আমি আতঙ্কে জমে যাই। যদিও চালক বলে যে, সব যাত্রীই পানজওয়াইয়ের বাসিন্দা এবং বাসে কোনো তালিব নেই, আমি নিচু হয়ে বসি, নিজের পাঝ নামের পাগড়ি খুলে অন্য এক যাত্রীর পাগড়ি পরে নিই। আল্লাহ সাক্ষী – আমি তখন জীবনের জন্য ভীষণ ভয়ে ছিলাম, তবে সৌভাগ্যক্রমে তারা আমাকে চিনতে পারেনি এবং বাসটি আবার পানজওয়াইয়ের পথে রওনা হয়। আমি পানজওয়াইতে থাকি যতক্ষণ না সারকাটেব পরাজিত হয়।

কান্দাহার শহর মাওলানা নাকিব স্বেচ্ছায় তালেবানের হাতে তুলে দেন। হাজী মাওলানা ওবায়দুল্লাহকে কান্দাহার কোরের কমান্ডার, মাওলানা মোহাম্মদ হাসানকে গভর্নর, আখতার মোহাম্মদ মানসুরকে বিমান বাহিনীর কমান্ডার, শহীদ মাওলানা আব্দুস সালামকে প্রাদেশিক সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়, এবং সরকারিভাবে বিভিন্ন বিভাগ বিভিন্ন দায়িত্বে দেওয়া হয়। শহরটি তখন শান্তিতে ছিল। ছেলেদের অপব্যবহার, ব্যভিচার, লুটপাট, অবৈধ চেকপোস্ট এবং বন্দুকের শাসন – সব শেষ হয়ে যায়। সাধারণ জীবন মানুষ ফিরে পায়, এবং বহু বছর পর তারা প্রথমবারের মতো সন্তুষ্ট হয়।

*****

কান্দাহার পতনের পর, তালেবান দক্ষিণাঞ্চলজুড়ে আবার তাদের বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে থাকে। বেশ কয়েকটি আদালত খোলা হয় এবং বিচারকরা চলমান বিরোধের শুনানি শুরু করেন। আমাকে মাওলানা মোহাম্মদ ওমর নিয়োগ দেন মৌলভী পাশানাই সাহেবের আদালতে সহায়তার জন্য। তাকে আপিল আদালতের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল এবং তার অফিস ছিল আর্গ প্রাসাদে, ওলায়াত ভবনের পেছনে।

মৌলভী পাশানাই সাহেব ছিলেন তার নিরপেক্ষ রায় ও বিচারের জন্য সুপরিচিত। যারাই তার সামনে আসত– সে আত্মীয় হোক বা বন্ধু–তাদের সবাইকে একই রকম আচরণ ও রায় দেওয়া হতো। তিনি ইসলামী শরিয়াহ অনুযায়ী আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতেন। আমি অনেক মামলার কথা মনে করতে পারি, তবে দুটি ঘটনা বিশেষভাবে মনে গেঁথে আছে।

পেশমল নামক একটি জায়গার পাশে একটি পাহাড় আছে যার নাম শুকুর পাহাড়। এখানে সাধারণত হত্যা মামলার দণ্ড কার্যকর করা হতো। যখন কোনো অপরাধীকে শাস্তির জন্য পাহাড়ে তোলা হতো, আমরা এলাকা ঘিরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতাম।

তুয়ান, যাকে কুরবান নামেও ডাকা হতো, সে আমার শৈশবের গ্রাম চারশাখা-তে ঠাণ্ডা মাথায় ছুরি দিয়ে এক ব্যক্তিকে খুন করেছিল। তাকে শুকুর পাহাড়ে আনা হয়। অনেক মুজাহিদিন সেখানে জড়ো হয়েছিল এবং নিহত ব্যক্তির পিতা ও পরিবার সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

তুয়ান যখন ফাঁকা চত্বরে আনা হয়, তখন প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সবাই নিহত ব্যক্তির পিতাকে অনুগ্রহ করতে থাকে যেন তিনি ক্ষমা করে দেন।

উলামাগণ ক্ষমার ফজিলত বর্ণনা করলেন, অন্যরা টাকা দিলেন, এবং কিছু কমান্ডার অস্ত্র দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এক কমান্ডার অপরাধীর পক্ষ থেকে পঞ্চাশটি কালাশনিকভ রাইফেল এবং কিছু টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেন, কিন্তু নিহত ব্যক্তির পিতা তাকে ক্ষমা করতে রাজি হননি।

ডিউটিরত কর্মীরা তাকে একটি ছুরি দেন, এবং তুয়ানকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তার সামনে নিয়ে আসা হয়। নিহতের পিতা ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে যান, হাতা গুটিয়ে নেন। তিনি প্রথমে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসেন, তারপর উচ্চস্বরে বলেন আল্লাহু আকবর, এবং ছুরিটি তুয়ানের গলায় রাখেন।

এরপর তিনি ছুরি উঠিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করেন:
"দেখো! আল্লাহ আমাকে এই ক্ষমতা দিয়েছেন। কেউই তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না, আল্লাহ ছাড়া। তুমি সেই ব্যক্তি, যে আমার ছেলেকে বিনা কারণে নির্মমভাবে হত্যা করেছিলে। শরিয়াহ অনুযায়ী, আল্লাহ আমাকে প্রতিশোধ নেওয়ার কিংবা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ক্ষমা করার অধিকার দিয়েছেন। ক্ষমা আল্লাহর কাছে প্রতিশোধ অপেক্ষা অধিক প্রিয়। আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম, যেন আল্লাহ আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন। বিচার দিবসে এখন তিনিই প্রতিশোধ নেবেন।"

তিনি ছুরিটি ছুঁড়ে ফেলে দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সবাই তাকবির ধ্বনি দিতে শুরু করে, কেউ গুলি ছোড়ে, কেউ আবার নিহত পিতার হাত-পা চুমু দিতে এগিয়ে আসে। কেউ একজন তুয়ানের হাত খুলে দেয়, কিন্তু সে পাঁচ মিনিটের মতো কথা বলতে বা নড়াচড়া করতে পারেনি।

লোকেরা তাকে নতুন জীবন পাওয়ার অভিনন্দন জানায় এবং বলে:
"আল্লাহ দয়া করেছেন। তোমার কর্মের জন্য অনুতপ্ত হও এবং জীবনে আর কখনো এমন কিছু চিন্তাও করো না।"

আমি বিশ্বাস করেছিলাম, লোকটা আর কখনো অপরাধ করবে না। কিন্তু কিছুদিন পরই সে আবার খুন করে। আমি আরও শুনেছিলাম যে, এক ডাকাতির সময় সে নিজেই নিহত হয়েছিল।

*****

আরেকটি ঘটনা যেটির বিচার মৌলভী পাশানাই সাহেব করেছিলেন, সেটি ছিল একটি গোটা পরিবার ও তাদের এক অতিথিকে হত্যার মামলা।

মোহাম্মদ নবি নামের এক ব্যক্তি, যিনি গিরদি জঙ্গল ক্যাম্পে থাকতেন, তার সাবেক স্ত্রীর বোনের স্বামীর বাড়িতে (যাকে বাজা বলা হয়) বেড়াতে যান। তার স্ত্রীর বোন ও স্বামী তাকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান। সন্ধ্যা নামার পর আরেকজন অতিথি আসে এবং রাতের খাবার পরিবেশন করা হয়। রাত গভীর হলে মোহাম্মদ নবি ও অন্য অতিথি থাকার সিদ্ধান্ত নেন এবং অতিথিকক্ষে ঘুমাতে যান, আর বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা নিজেদের ঘরে চলে যান।

রাত গভীর হলে, মোহাম্মদ নবি–যিনি পেশায় একজন অভিজ্ঞ কসাই ছিলেন–একটি চাপাতি নিয়ে অন্য ঘুমন্ত অতিথিকে গলা কেটে হত্যা করেন। এরপর তিনি ঘরের ঘরে গিয়ে পুরো পরিবারকে হত্যা করেন–মোট **১১** জন: একজন নারী, দুইজন পুরুষ এবং আটজন শিশু, যার মধ্যে ছয় মাস বয়সী একটি শিশুও ছিল।

শেষে তিনি সব মরদেহ টুকরো টুকরো করে কেটে নিচতলায় নিয়ে রাখেন।

তাকে বালুচিস্তানের পানজপাই ক্যাম্প থেকে মুজাহিদিনরা গ্রেফতার করে কান্দাহারে আনে। সেখানে সে নিজের অপরাধের স্বীকারোক্তি দেয়, কিন্তু কখনো বলে না কেন সে এমন ভয়াবহ কাজ করেছিল। আদালতের শুনানিতে এবং জেলে থাকাকালীন মোহাম্মদ নবি বারবার বলত যে, তাকে হত্যা করে ফেলা উচিত, কিন্তু কখনো সে কারণ বলত না কেন সে তার বাজার পরিবারকে নির্মমভাবে কেটে ফেলেছে।

সে বলত, "আমি চাই আমাকে মেরে ফেলুন।"
সে বলত, "আমি রাতে ঘুমাতে পারি না। আমি স্বপ্নে দেখি সেই ছোট ছোট শিশুগুলো, যাদের অঙ্গ আমার হাতে, চারপাশে রক্ত ছড়িয়ে। তারা আসে আর বলে– 'আমরা কী করেছিলাম তোমার সাথে?'"

সে কাঁদত, "আমার হৃদয় ভারী হয়ে আছে। দয়া করে আমাকে দ্রুত মেরে ফেলুন।"
তার মৃত্যুদণ্ড হয় এবং সেটি কুশকাক ও নেলঘামের মধ্যবর্তী নদীর পাড়ে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত হয়।

নিহতদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরা তাদের মেহমানদের নিয়ে সেখানে জড়ো হন। প্রতিটি পরিবার থেকে একজন করে–মোট দুইজন–পুরুষকে বেছে নেওয়া হয় প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য। তারা ছিলেন নিহতদের ভাই।

মোহাম্মদ নবি-কে নদীর পাড়ে আনা হলে কেউ তাকে ক্ষমা করার জন্য কিছু বলেনি। মৌলভী পাশানাই সাহেব উলামাদের অনুরোধ করেছিলেন যেন তারা ক্ষমা প্রার্থনার জন্য চেষ্টা করেন ও তার জন্য দোয়া করেন, কিন্তু কেউ কিছু বলেনি। এমনকি মোহাম্মদ নবি-র নিজ পরিবারের কেউ তার মৃতদেহ নেওয়ার জন্যও আসেনি।

আমি মৌলভী সাহেবের কাছে যাই। আমি অনুরোধ করি যেন মোহাম্মদ নবি শেষবারের মতো দুই রাকাত নামাজ আদায় করতে পারে এবং কালেমা পাঠ করতে পারে।

অনুমতি পাওয়ার পর আমি মোহাম্মদ নবি-র কাছে যাই। আমি তাকে বলি, “তোমার আত্মীয়দের ভাইরা এসেছে, তারা প্রতিশোধ নেবে। এখন কাবার দিকে ফিরে শেষবার নামাজ আদায় করো, ঈমানের কালেমা পাঠ করো।”

কিন্তু মোহাম্মদ নবি সোজা আমার দিকে তাকিয়ে বলেন,
“আমাকে এখনই মেরে ফেলো। আমি এখনও দেখতে পাচ্ছি ঐ অঙ্গহীন শিশুগুলোকে আমার হাতে। আমি নামাজ পড়তে পারি না, কালেমা পড়তেও পারি না।”

তার কথা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে যাই। আমি অনেক চেষ্টা করি তাকে বোঝানোর, কিন্তু সে শুধু এক কথা বলে যায়, “মেরে ফেলো আমাকে।”

অবশেষে মৌলভী সাহেব বলেন, তাকে ছেড়ে দিতে। আমি তাকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম যখন সে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়–ভিক্টিমদের পরিবারের হাতে।

সে মরলো–নামাজ না পড়ে, কালেমা না পড়ে।

নিহতদের পরিবার আনন্দে চিৎকার করে উঠল, কেউ কেউ পাগড়ি ছুঁড়ে দিল আকাশে।
আমার কাছে মোহাম্মদ নবি ছিল প্রমাণ–যে মানুষ পাষাণ হয়, সে এমনকি দোয়া বা কালেমা পাঠ করেও মরতে পারে না। আল্লাহ যদি নিজে কাউকে হিদায়াত না দেন, তাহলে কোনো অভিজ্ঞতা বা কষ্ট তাকে সঠিক পথে আনতে পারে না।

*****

কিছু সময় কেটে গেলে আমি ফারাহ প্রদেশের দেলারাম এলাকায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। তখন অধিকাংশ তালেবান যোদ্ধা কাবুলের দিকে অগ্রসর হয়েছিল বা পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল। এই সুযোগে ইসমাইল খান আমাদের চমকে দিয়ে মার্চ ১৯৯৫ সালে পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণ করে বসেন।

আমি সাঙ্গেলান-এ মোতায়েন ছিলাম, যেখানে আমরা তার প্রথম আক্রমণ প্রতিহত করি। দ্বিতীয়বার তার বাহিনী মারাত্মকভাবে পরাজিত হয় এবং আমরা তাদের দেলারাম থেকে আব-এ-খুরমা পর্যন্ত ধাওয়া করে ফিরিয়ে দিই–এই জায়গাটি শিনদান্ড ও ফারাহ নদীর মাঝামাঝি অবস্থিত।
আব-এ-খুরমার যুদ্ধে আমার পায়ে আঘাত লাগে, এবং আমাকে চিকিৎসার জন্য কান্দাহার শহরের চায়না হাসপাতালে পাঠানো হয়।

যখন একটু সুস্থ হলাম, তখন আমি আবার মৌলভী পাশানাই সাহেবের আদালতে ফিরে যাই। যদিও আমি তখনও দুর্বল ছিলাম এবং পায়ের ক্ষত সম্পূর্ণ সারেনি, তবুও আমি তাকে দেখতে যাই। আমার ফেরার পর তিনি

একবারও আমাকে দেখতে আসেননি, তাই ভাবছিলাম হয়তো আমি তাকে কোনোভাবে অসন্তুষ্ট বা রাগান্বিত করেছি।

অফিসে পৌঁছালে দেখি সব বিচারপতিই সেখানে উপস্থিত। হাজী বাবা, মৌলভী আহমদ সাহেব ও মৌলভী ওবায়দুল্লাহ সাহেব সবাই বসে আছেন মৌলভী পাশানাই সাহেবের সঙ্গে। আমি ঘরে ঢুকতেই তিনি একটু ঠান্ডাভাবে আমাকে সম্বোধন করেন।

তিনি বলেন,
"আবদুস সালাম! তুমি অনেকদিন আমার সঙ্গে কাজ করছো এবং আমি তোমার ওপর সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করেছি। তাহলে কেন তুমি হাজী আমানুল্লাহকে ব্যবসার লাইসেন্স দিয়েছো?"

হাজী আমানুল্লাহ ও তার ভাই হাজী ইব্রাহিম-এর মধ্যে একটি গুরুতর ব্যবসায়িক দ্বন্দ্ব ছিল। তারা কান্দাহার, কোয়েটা, কাবুল এবং পেশোয়ারে বড় বড় মার্কেট ও অফিসের মালিক ছিল। মৌলভী পাশানাই এই মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাদের ব্যবসা স্থগিত করে রেখেছিলেন।

পাশানাই সাহেব তখন এতটাই দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন যে প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। আমি তার বেশিরভাগ বিচারসংক্রান্ত নথিপত্র প্রস্তুত করতাম, লিখে দিতাম, তারপর তিনি সেগুলো স্বাক্ষর করতেন। এই কাজে তিনি খুব কম লোককেই ভরসা করতেন।

আমি তখন দেলারাম-এ ছিলাম এক মাস চার দিন, আর এই সময়ের মধ্যে মৌলভী ওবায়দুল্লাহ আমার দায়িত্ব সাময়িকভাবে পালন করছিলেন।

ওবায়দুল্লাহ হাজী আমানুল্লাহকে একটি ব্যবসার লাইসেন্স লিখে দেন ও স্বাক্ষর করেন, এবং পরে সেই চিঠি মৌলভী সাহেবের কাছে নিয়ে যান–তিনি না বুঝেই তা স্বাক্ষর ও সিল করে দেন। পরে হাজী ইব্রাহিম জানতে পারেন তার ভাই আবার ব্যবসা শুরু করেছে, এবং তিনি অভিযোগ নিয়ে মৌলভী সাহেবের কাছে আসেন।

তখন মৌলভী সাহেব বলেন, তিনি এমন কোনো লাইসেন্স দেননি। তিনি ওবায়দুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলে, সে বলে আমি এই লাইসেন্স দিয়েছি। অথচ তখন আমি দেলারামে ছিলাম–এই ঘটনা আমি করিনি, তবু মৌলভী সাহেব সন্দেহ করলেন যে আমি-ই দায়ী।

আমি কোনো দিনও তার বিশ্বাস বা মর্যাদার ক্ষতি করিনি। অথচ তখন মনে হলো, তিনি আমাকে দোষী মনে করছেন। আমাকে কিছু বলার সুযোগও দিলেন না।

আমি বললাম:
"মৌলভী সাহেব! গত বহু বছর ধরে আমি কখনও এমন কিছু করিনি যা আপনার সম্মান বা বিশ্বাসের ক্ষতি করে। এখন কেন করব? আমি এই চিঠির বিষয়ে কিছুই জানি না, আর এটি আমি দিইনি।"

তিনি একটি ফোল্ডার থেকে চিঠিটি বের করে আমাকে দিলেন:
"এই চিঠিই!" — বললেন তিনি।

আমি চিঠিটি দেখেই বুঝে যাই সমস্যা কোথায়। আমি একটি বড় ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে এসে বলি, আপনি নিজে দেখুন এই লেখাগুলো। এরপর আমি প্রশ্ন করি:

"মৌলভী সাহেব, আপনি কি এই লেখাটি আমার হাতের লেখা বলে চিনতে পারছেন? আপনি তো দশ বছরের বেশি সময় ধরে আমার লেখা দেখে আসছেন। এটা কি আমার লেখা?"

তিনি মনোযোগ দিয়ে লেখাগুলো দেখে বললেন:
"না, এটা তোমার লেখা নয়।"

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম:
"তাহলে আপনি কি জানেন এটা কার লেখা?"
তিনি চিনতে পারলেন না।

তখন আমি বললাম:
"এই লাইসেন্স লিখেছেন মৌলভী সাহেব ওবায়দুল্লাহ–যিনি এখন আপনার পাশেই বসে আছেন।"

এই কথা শোনার পর মৌলভী পাশানাই প্রচণ্ড রেগে যান। তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে ওবায়দুল্লাহকে ঘুষি মারেন, লাথি দেন, দুহাত দিয়ে আক্রমণ করে দেন। গালাগালি করতে করতে তাকে অফিস থেকে বের করে দেন।

ওবায়দুল্লাহ পরে একটি পদত্যাগপত্র পাঠান। কিন্তু এই ঘটনার পর আমি মনে করি, এখন পাশানাই সাহেবের সঙ্গে কাজ না করাই ভালো। আমি গত দশ বছরের সম্মান যেন হারিয়ে না ফেলি।

তিনি পরে বহুবার আমাকে ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন, হাজী ওবায়দুল্লাহ আখুন্দ ও মরহুম হাজী আব্দুস সাত্তার আখুন্দ-কে পর্যন্ত পাঠান। কিন্তু আমি আর ফিরে যাইনি।

ADMINISTRATIVE RULE

আমি তখনও আমার আঘাত থেকে পুরোপুরি সেরে উঠিনি যখন আমাদের বাহিনী ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে ইসমাইল খানের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে এবং হেরাতে প্রবেশ করে। তখনও আমি সেরে উঠছিলাম, এবং সামান্য কিছু কাজ করতাম সামরিক কোর ভবনে–কখনো কখনো লজিস্টিকসের কাজ, আবার কখনো রেডিও অপারেটরের দায়িত্ব।

একদিন বিকেলে আমি রেডিও রুমে কাজ করছিলাম, তখন মৌলভী মোহাম্মদ ওমর আমাকে তার অফিসে ডেকে পাঠালেন।

"আজ রাতে বাড়ি গিয়ে তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। আগামীকাল আমরা রওনা দিব" ,
তিনি বললেন।

আমি তাকে কোথায় যাবো বা কতদিনের জন্য যাবো জিজ্ঞাসা করিনি, বরং বাড়ি ফিরে সামান্য কিছু জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম। পরদিন সকালে যখন আমি ঘাঁটিতে ফিরি, তখন চার-পাঁচটি জিপ প্রস্তুত ছিল এবং আমরা সঙ্গে সঙ্গে কান্দাহার ছেড়ে যাত্রা করি। আমরা মেওয়ান্দ হয়ে আরঘানদাব নদী পার হয়ে লস্কর গাহর পথে রওনা দেই। গেরেশকে পৌঁছে আমরা সামরিক ডিভিশনের সদরদপ্তরে যাই, যেখানে মৌলভী মীর হামজা আখুন্দ আমাদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান এবং আমাদের খাবার ও চা পরিবেশন করেন।

দুপুরের খাবারের পর একটি কাছাকাছি মাঠে দুটি হেলিকপ্টার অবতরণ করে। মৌলভী মোহাম্মদ ওমর সাহেব প্রথম হেলিকপ্টারে উঠলেন, আর শহীদ হাজী মৌলভী ইয়ার মোহাম্মদ আখুন্দ এবং আমি দ্বিতীয়টিতে উঠলাম।

হেলিকপ্টার দুটি উড়ে গেলো এবং হেলমান্দ ও ফারাহের উপর দিয়ে হেরাত প্রদেশের দিকে এগিয়ে গেল। আমরা ফারাহর বাকওয়া মরুভূমির উপর দিয়ে উড়ে গেলাম এবং এরপর পশ্চিমের সমভূমি দেখতে পেলাম, যার মাঝামাঝি থেকে পাহাড় শুরু হয়। হেরাতের কোর ভবনের পাশে একটি ছোট মাঠে হেলিকপ্টার দুটি অবতরণ করল। একটি কাফেলা আমাদের বাগ-এ-আজাদি এবং গভর্নরের অতিথিশালায় নিয়ে গেল। সেখানে অনেকেই আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি সভা অনুষ্ঠিত হলো, যেখানে মৌলভী মোহাম্মদ ওমর সাহেব হেরাতে বিভিন্ন সরকারি পদে নিয়োগ দিলেন।

হাজী মৌলভী ইয়ার মোহাম্মদকে হেরাতের গভর্নর হিসেবে, মৌলভী আবদুল সালামকে হেরাতের সেনা কোর কমান্ডার হিসেবে, মৌলভী সিরাজুদ্দিনকে সামরিক ডিভিশনের (ফেরকা) কমান্ডার হিসেবে, শহীদ মৌলভী মাজুল্লাহকে প্রাদেশিক পুলিশ প্রধান হিসেবে এবং আমাকে ব্যাংকসমূহের দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়। দ্বিতীয় দিন গভর্নর আমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমার নতুন পদে পরিচয় করিয়ে দেন।

ইসমাইল খান আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে শাসন করতেন এবং হেরাত ছিল তার রাজধানীস্বরূপ। যুদ্ধবাজ, কমান্ডার এবং গোত্রপতি যারা কেন্দ্রীয় সরকার অনুপস্থিত অবস্থায় ক্ষমতা গ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে একমাত্র ইসমাইল খানই তার অঞ্চলের জনগণের সেবা করেছিলেন। 'পশ্চিমের রাজপুত্র' নামে পরিচিত তিনি, সীমান্ত বাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব ব্যবহার করে শহর এবং আশপাশের এলাকা উন্নয়ন করেছিলেন।

হেরাতের ব্যাংকসমূহের দায়িত্ব নেওয়ার পর আমি প্রথমেই সেখানে বিদ্যমান সম্পদ ও অর্থের হিসাব করতে একটি জরিপ পরিচালনা করি। হেরাতে মোট চারটি ব্যাংক ছিল, যেগুলোর সবগুলোই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে পরিচালিত হতো। আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'পশতানি তিজারতি ব্যাংক' ছিল একটি জাতীয় ব্যাংক, যা উন্নয়ন ও শিল্প খাতে ঋণ প্রদান করত এবং এর বিশাল আর্থিক মজুদ ছিল। হেরাতের ব্যাংকিং ব্যবস্থা অক্ষত ছিল এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক আধুনিক। লোকজন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং ঋণের মাধ্যমে ব্যবসা শুরু করতো বা বিনিয়োগ করত। শুধু হেরাতেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ৪০ বিলিয়ন আফগানি, তিন লাখ মার্কিন ডলার এবং কিছু পাকিস্তানি রুপি মজুদ ছিল। ভল্টে আমরা পুরাতন মুদ্রা, সোনা, রুপা এবং সামান্য প্লাটিনামও খুঁজে পাই।

ব্যাংকে কর্মরত সাধারণ কর্মচারীরা বিশ্বাসযোগ্য মানুষ ছিলেন এবং তারা একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছিলেন। কিছু গোয়েন্দা সংস্থার লোকও ব্যাংকে কাজ করতেন, তবে তাদের অনেকেই পূর্বতন কমিউনিস্ট ছিলেন। প্রথম ক' দিনে ব্যাংক এবং গোয়েন্দা বিভাগে কর্মরত অধিকাংশই আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন এবং তাদের অবস্থান ও দায়িত্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন। এর মাধ্যমেই আমি জানতে পারি যে ইসমাইল খানের ভাইও ওই ব্যাংকে কাজ করতেন।

তাকে নিয়ে প্রমাণ ছাড়াই অভিযোগ তোলা হয় যে তিনি এখনও তার ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং তাকে তথ্য সরবরাহ করতেন। আমি ভেবেছিলাম তারা পরিচয় দিতে এসেছে, কিন্তু এটা আমার কাছে অদ্ভুত লেগেছিল যে তারা শুরুতেই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললো।

ইসমাইল খান সম্পর্কে আমি যা জানতাম, তাতে তাকে আমি গভর্নরের চেয়ে রাজা বেশি মনে করতাম। মানুষ এত দ্রুত তার পৃষ্ঠ ফিরে নিলো দেখে আমি অবাক হলাম। কিছুদিন পর থেকেই প্রতিদিন কেউ না কেউ এসে আমাকে বোঝাতে চাইতো যেন আমি তার ভাইকে বন্দি করি। এতে আমি ভাবতে লাগলাম—আমি আসলে কাদের সঙ্গে কাজ করছি এবং তাদের ওপর কতটা ভরসা করা যায়।

আমি মোহাম্মদ আনোয়ার, ইসমাইল খানের ভাই, তাকে আমার অফিসে ডেকে পাঠালাম। তিনি উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিলেন এবং বুঝতে পারছিলেন না কেন তাকে ডাকা হয়েছে। আমি তাকে সম্ভাষণ জানিয়ে চা দিতে বললাম এবং জানালাম আমি কেবল পরিচিত হতে চাই এবং আশ্বস্ত করতে চাই যে কেউ তাকে বা তার পরিবারকে হয়রানি করবে না।

আমি বললাম, “মোহাম্মদ আনোয়ার, আপনি ইসমাইল খানের ভাই, কিন্তু আপনি আমাদেরও ভাই। বিশ্বাস করুন, আমরা আপনার বিরুদ্ধে কোনো বিদ্বেষ পোষণ করি না। আপনি আপনার কাজ চালিয়ে যান। যদি কোনো সমস্যা হয় আমাকে বলবেন, আমি যতটা পারি সাহায্য করবো।”

আমি প্রায় দুই বছর হেরাতের ব্যাংকের দায়িত্বে ছিলাম। এই সময়ে তিনি অন্য সবার মতোই কাজ করতেন এবং আমি কাউকে তাকে বিরক্ত করতে দিইনি।

আমি হেরাতে থাকতে পছন্দ করতাম। ইসমাইল খান অবকাঠামোতে প্রচুর বিনিয়োগ করেছিলেন এবং যদিও শুরুতে মানুষ আমাদের ভয় পেত, তারা ছিল বন্ধুবৎসল ও আন্তরিক। তারা নিজেদের দেশ ও জনগণের জন্য কাজ করতে আগ্রহী ছিল। তারা শান্তিপ্রিয় এবং শিক্ষাকে মূল্য দিত। তারা মূল্যবোধ ও নীতিকে সম্মান করত এবং ব্যবসায় পারদর্শী ছিল। তারা বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করত এবং তালেবান তাদের সর্বোচ্চ সেবা দেওয়ার চেষ্টা করত–নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং আইন রক্ষা করে।

প্রায় দুই বছর পর আমি বাড়ি ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। আমার স্ত্রী আমাকে খবর পাঠিয়েছিলেন যে আমাদের সন্তান অসুস্থ। আমি গভর্নরের কাছে গিয়ে তাকে অনুরোধ করলাম যেন ব্যাংকে আমার বদলে কাউকে দায়িত্ব দেয়া হয়, কিন্তু তিনি আমাকে যেতে দিতে চাননি এবং নতুন কাউকে নিয়োগও দেননি।

সরকারি অনুমতি ছাড়াই আমি হেরাত ছাড়ার প্রস্তুতি নেই। আমার সহকারীকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে অফিস থেকে একটি গাড়ি নিই এবং বাড়ি ফিরে যাই। কান্দাহারে ফিরে এসে আমি সেই গাড়িটি একটি সরকারি দপ্তরে ফেরত দিই এবং হাজী খুশকিয়ার ক্যালার কাছে সালেহানে আমার বাড়িতে যাই।

আমি দীর্ঘদিন ধরেই সরকারি দপ্তরে কাজ ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবছিলাম এবং চাচ্ছিলাম আমার পিতার পথ অনুসরণ করে মসজিদের ইমাম হিসেবে কাজ করতে, যাতে আমি কুরআন ও ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদান করতে পারি। আজও, এই জীবনই আমাকে সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি দেয়। এ এক জ্ঞানভিত্তিক মর্যাদার জীবন, যা ক্ষমতার বিপদ ও লোভ থেকে দূরে। ছোটবেলা থেকেই আমি সবচেয়ে খুশি থাকতাম যখন পড়াশোনা ও শেখার মধ্যে থাকতাম। সরকারি পদে কাজ করা মানে দুর্নীতি ও অন্যায়ের মাঝে জীবনযাপন করা, আর সেখানেই মানবজাতির দুঃখ নিহিত।

*****

হেরাত থেকে ফেরার পর আমি সিদ্ধান্ত নিই যে আমি এক মাস বাড়িতে থাকবো, বিগত কয়েক বছরের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে চিন্তা ও আত্মপর্যালোচনার জন্য। এ সময় আমার ভাই–যিনি ইতোমধ্যে পড়াশোনা শেষে বাড়ি ফিরেছেন–মসজিদে আমার স্থানে ইমামতি করতেন। কিন্তু আমি মসজিদে ফিরবার আগেই মোল্লা মোহাম্মদ ওমর আমার জন্য একটি গাড়ি পাঠালেন। এখন তার উপাধি পরিবর্তিত হয়েছে–তিনি এখন “Amir ul-Mu’mineen”।

আমরা তার অফিসে বসি, তিনি আমার স্বাস্থ্যের খোঁজ নেন এবং আমার পরিবারের কথা জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, "এক মাস বিশ্রাম নেওয়াটা ভালো হয়েছে। বিশ্রাম প্রয়োজন। কিন্তু এখন তোমার কাজের কাছে ফিরে যাওয়া উচিত।"

কাবুল ইতোমধ্যে তালেবানের দখলে চলে গেছে এবং মোল্লা সাহেব, Amir ul-Mu'mineen, আমাকে জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত করতে চান। তিনি আমার জন্য একটি আনুষ্ঠানিক নিয়োগপত্র লেখেন। যদিও আমি আর সরকারের জন্য কাজ করতে চাইছিলাম না, তবু আমি তাকে না বলতে পারলাম না। সাঙ্গিসারে আমি তার প্রতি আনুগত্য ও অনুসরণের শপথ নিয়েছিলাম, তাই যদি তিনি আমাকে কাবুলে চান, তাহলে আমি যাব।

আমি কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে পরিবারকে বিদায় জানালাম এবং কাবুলের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। যখন আমি হেরাতে ছিলাম, তালেবান কাবুলে প্রবেশ করেছিল এবং আমি পৌঁছানোর সময় মোল্লা মোহাম্মদ রাব্বানি এবং আবদুর রাজ্জাক শহরটি নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিলেন এবং হিজব-ই-ইসলামির কমান্ডার গুলবউদ্দিন হেকমতিয়ার এবং আহমদ শাহ মাসউদের মধ্যে চলমান লড়াইয়ের অবসান ঘটিয়েছিলেন। তালেবানদের অনেক সহযোদ্ধার মতো, আমারও কাবুলে এটাই প্রথম সফর।

তালেবান শরিয়াহ আইন প্রয়োগ করা শুরু করেছিল: নারীরা আর সরকারি দপ্তরে কাজ করতেন না এবং শহরজুড়ে পুরুষেরা দাঁড়ি রাখা শুরু করেছিলেন। শহরে জীবন স্বাভাবিক হতে শুরু করেছিল। মানুষ বাজারে ফিরে আসছিল এবং প্রতিদিনই নিরাপত্তার উন্নতি হচ্ছিল, যদিও তখনও কারফিউ বহাল ছিল। কিন্তু যুদ্ধ শহরের উপর প্রভাব ফেলেছিল এবং অনেক মানুষ মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল। আগের প্রশাসনের কিছুই অবশিষ্ট ছিল না: অধিকাংশ অফিস লুট করা হয়েছিল এবং সরকারি বিভাগগুলো ছিল সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল। শহরের অনেক অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং অনেক মন্ত্রণালয় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল।

ভাগ্যক্রমে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ভবনটি অক্ষত ছিল। যখন আমি দায়িত্ব নেওয়ার জন্য সেখানে পৌঁছাই, তখনো কোনো বাজেট নির্ধারিত ছিল না এবং কেউই মন্ত্রণালয়ের ব্যয়ের ব্যাপারে কিছু জানত না। অধিকাংশ অফিস ফাঁকা ছিল; আগের অনেক কর্মকর্তা উত্তরাঞ্চলীয় জোটের (Northern Alliance) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং কাবুল ত্যাগ করেছিলেন। অনেকে জানতেনই না যে মন্ত্রণালয় আবার কাজ শুরু করেছে, তাই কেউ কেউ কাজেও আসতেন না।

এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে নতুন ও অপরিচিত একটি শহরে বসবাস শুরু করে কাজ শুরু করা আমার জন্য কঠিন ছিল। আমি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও বিভক্তির মধ্য দিয়ে পথ তৈরি করতে বাধ্য হই, কিন্তু নতুন হলেও বেশি সময় লাগেনি, আমি পদোন্নতি পেয়ে প্রশাসনিক উপপ্রতিরক্ষা মন্ত্রী হয়ে যাই। এতে আমি মন্ত্রণালয়ের সকল আর্থিক ও সরবরাহসংক্রান্ত বিষয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হই। কিছু সময়ের জন্য আমি প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেছি।

কাবুল প্রদেশের মীর বাচা কোট জেলায় মোল্লা ওবায়দুল্লাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, আহত হলে তিনি চিকিৎসার জন্য পাকিস্তানে যান। সেই সময় আমি টানা নয় মাস প্রতিস্থাপক মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করি, যখন সেনাপ্রধান মোল্লা ফজল আখুন্দ এবং তার সহকারী মোল্লা খান মোহাম্মদ ও মোল্লা মোহাম্মদ নাঈম আখুন্দ সামরিক বিষয়ে তত্ত্বাবধান করতেন।

আমরা মন্ত্রণালয়ের জন্য দুটি বাজেট তৈরি করি; বার্ষিক বাজেটটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থায়িত হতো এবং তা ব্যয় হতো বেতন পরিশোধ, প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং অন্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে স্থানান্তর সংক্রান্ত লেনদেনে। দ্বিতীয় বাজেট ছিল একটি স্বতন্ত্র বাজেট, যা মূলত কাশে কান্দাহার থেকে পাঠানো হতো এবং তা ফ্রন্টলাইনে থাকা সামরিক ইউনিটগুলোর জন্য জ্বালানি, রসদ ও অন্যান্য সরবরাহে ব্যয় হতো। উদাহরণস্বরূপ, কুন্দুজে অবরুদ্ধ তালেবান বাহিনীকে প্রতি সপ্তাহে বিমানযোগে জ্বালানি ও প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করা হতো। কাবুলের কাছাকাছি টাগাব ও নেজরাব থেকে শুরু করে লাগমান পর্যন্ত এবং বামিয়ানে জালরেজের কাছাকাছি অবস্থানেও সরবরাহ পৌঁছে দেওয়া হতো স্থলপথে।

১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত, যখন বামিয়ান তালেবানদের দখলে আসে, ফ্রন্টের জন্য সাপ্তাহিক বাজেট ছিল প্রায় ৩ লাখ ডলার। তবে প্রায়ই আমরা যথেষ্ট অর্থ পেতাম না এবং কম অর্থেই কাজ চালাতে হতো। অর্থ উত্তোলন বা স্থানান্তরের জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, কার্যকর মন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী–তিনজনের স্বাক্ষর প্রয়োজন হতো। এই প্রক্রিয়া আমরা চালু করেছিলাম অর্থের গন্তব্য সুনিশ্চিত করতে এবং মন্ত্রণালয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে। অন্যান্য ব্যয়–যেমন ভ্রমণ খরচ, সামরিক গোয়েন্দা বাজেট, সামরিক অভিযানের অতিরিক্ত কর, তালেবানের সঙ্গে মিত্র কিছু কমান্ডারের রসদ ব্যয়, বা আহত সৈন্যদের চিকিৎসার খরচ–এই দ্বিতীয় বাজেট থেকেই বহন করা হতো।

*****

যদিও আমরা একটি কার্যকরী ব্যবস্থা চালু করতে সক্ষম হয়েছিলাম, তবুও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বহু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিল। সামরিক বাহিনী নিয়মিত অভিযোগ করত যে তারা যথাযথভাবে রসদ পাচ্ছে না। আমার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে কর্মরত অবস্থায় সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিগুলোর একটি ছিল উত্তরে তালেবান বাহিনীর সঙ্গে মালিকের বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি। মালিক তালেবানদের মাজার-ই-শরীফে তার উত্তরাঞ্চলীয় ঘাঁটিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং সেখানে একটি বিশাল বাহিনী পাঠানো হয়। তারা কাবুলের উত্তরে সালাং টানেল অতিক্রম করে পুল-ই-খুমরিতে পৌঁছানোর পর, আবদুল বাসির সালাঙ্গি তালেবানদের উপর গুলবাহার ও জেবাল-উস-সেরাজে আক্রমণ করেন–১৯৯৭ সালের শুরুর গ্রীষ্মে। কিছু অংশকে সালাং এলাকাতেও আক্রমণের মুখে পড়তে হয়।

সড়কপথ বন্ধ হয়ে যায় এবং প্রায় ৬,০০০ তালেবান আটকা পড়ে, খেনজান ও পুল-ই-খুমরির মাঝখানে শত্রুবাহিনীর দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায়। একদিকে ছিল মাসউদের বাহিনী, অপরদিকে মালিক এবং সৈয়্যদ মনসুর নাদিরী। তারা গুলি ফুরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করে। রসদ কমে যাওয়ায় এবং খাবার না থাকায় তারা আর অবস্থান ধরে রাখতে পারেনি এবং বাঘলানে পিছু হটে আশ্রয় নেয় বশির বাঘলানীর কাছে।

স্থানীয় জনগণ ও সাবেক কমান্ডার–যেমন আরবাব হাশেম খান ও আরিফ খানের সহায়তায় তালেবান বাহিনী কুন্দুজের দিকে একটি করিডোর খুলে নিতে সক্ষম হয় এবং এরপর বহু বছর ধরে সেখানে প্রতিরোধ গড়ে রাখে, যতক্ষণ না আমাদের বাহিনী উত্তরাঞ্চল দখল করতে সক্ষম হয়।

আমাদের কুন্দুজে রসদ পাঠানোর প্রধান উপায় ছিল আকাশপথে। ইয়ারগানাক থেকে বিমান উড়ে আসত এবং কুন্দুজের ছোট্ট এয়ারস্ট্রিপে নামার চেষ্টা করত, যদিও সেটি ছিল নিরবচ্ছিন্ন হামলার আওতায়। বিমানগুলো যখন অবতরণের জন্য এগিয়ে আসত, তখন তাদের ওপর আরপিজি ও রকেট ছোড়া হতো। অনেক পাইলট বিধ্বস্ত হতেন অথবা জরুরি অবতরণ করতে বাধ্য হতেন, এবং কিছুদিন পর তারা আর উড়তেই চাইতেন না। এমনকি কখনো কখনো বিমান অবতরণ না করেই কাবুল ফিরে যেত। তখন আমরা ঘোষণা দিই যে, যেসব পাইলট কুন্দুজে অবতরণ করতে পারবে, তাদের পাঁচ লাখ আফগানি পুরস্কার দেওয়া হবে। এরপরে দেখা গেল, প্রতিটি পাইলটই এমনকি সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও সফলভাবে অবতরণ করতে পারছে। এই আকাশপথে সহায়তাই ছিল কুন্দুজে তালেবানদের জীবনরেখা; জরুরি রসদ আনা হতো এবং মৃত বা আহত তালেবানদের সরিয়ে নেওয়া হতো।

আরেকটি উপায় ছিল স্থলপথে, শত্রুপক্ষের লাইন পেরিয়ে খাদ্য, জ্বালানি ও অন্যান্য উপকরণবাহী গাড়িগুলো চালানো–এর জন্য মাসউদ ও মালিকের কমান্ডারদের ঘুষ দিয়ে পথ পাস করানো হতো। তাকহার ও মাজার-ই-শরীফের অন্যান্য পরিচিত কমান্ডারদের সঙ্গেও একই কাজ করা হতো। কুন্দুজে পাঠানো অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ ছিল জ্বালানি। গোলাবারুদের জন্য, উত্তরাঞ্চলে অবস্থানকারী তালেবান কমান্ডাররা শত্রুপক্ষের নিম্নপদস্থ কমান্ডারদের কাছ থেকে অস্ত্র কিনতেন। দিনের বেলা যারা তালেবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত, তারা রাতের বেলা তাদের ঘাঁটি থেকে গোপনে বের হয়ে আমাদের কাছে গোলাবারুদ বিক্রি করত। এইভাবে গুলি ও শেল কেনা ছিল সস্তা এবং নিশ্চিত করত যে কুন্দুজে তালেবানদের একটি নিয়মিত ও পর্যাপ্ত সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় থাকছে।

তবে মাটির উপর বাস্তব পরিস্থিতিতে তালেবানদের সফলতার পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন মোল্লা দাদুল্লাহ আখুন্দ, যিনি কুন্দুজে তালেবান বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন। যারা তখন ঘটনাগুলোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তারা এখন একমত যে যদি তিনি না থাকতেন, তাহলে সেই ৬,০০০ তালেবান নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হতেন–যেমনটা তারা মাজার-ই-শরীফে হয়েছিল। এই এক পা-ওয়ালা কমান্ডার নিজেই প্রতিটি সামরিক অভিযানের নেতৃত্ব দিতেন, সৈন্যদের মধ্যে সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ শুরু করতেন এবং প্রথমেই শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে আক্রমণে যেতেন। তার কমান্ডের ধরন ছিল এত কঠোর যে কেউ পালানোর সাহস করত না বা দায়িত্বে অবহেলা করত না।

তিনি তার সৈন্যদের বলতেন, "পুরুষের মতো মরো, কিন্তু শত্রুর হাতে আত্মসমর্পণ করো না! মাজারে অন্যদের মতো আত্মহত্যা করো না। কেবল তোমাদের সাহস ও আত্মবিশ্বাসই তোমাদের বাঁচাতে পারবে। কেউ যদি যুদ্ধ করতে চায়, তাহলে সে পিছু হটতে পারবে না, আর যদি কেউ ফিরে আসে, আমি নিজে তাকে গুলি করে মারব"।

তার এই হুমকি সবাই জানত; একবার তিনি এক পিছু হটা তালেবানকে পায়ে গুলি করেছিলেন পিস্তল দিয়ে, আর সেই দিন থেকে তার অনুমতি ছাড়া কেউ আর পিছু হটেনি। তিনি ছিলেন এক সাহসী তরুণ যিনি কখনোই

ভয় চিনতেন না। হয়তো তার মতো আরও কেউ ছিল, কিন্তু তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি উত্তরের জোটের প্রধান মাসউদকে পামির পর্বতমালায় আটকে রাখতে পেরেছিলেন। সেই কমান্ডাররা এমনকি তার কণ্ঠস্বরও সহ্য করতে পারত না।

*****

চলমান আন্দোলনের প্রাথমিক কয়েক বছর মূলত আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল সম্প্রসারণে সামরিক অভিযানেই ব্যস্ত ছিল, তবে আমাদের কৌশলের একটি অংশ সবসময়ই আলোচনার গুরুত্বকে প্রাধান্য দিয়েছিল এবং অন্যান্য কমান্ডারদের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে চেয়েছিল। এই কৌশল ২০০১ সালে আমাদের পতনের আগ পর্যন্ত বহাল ছিল। আমি নিজেও দুইবার আহমদ শাহ মাসউদের গোষ্ঠীর সঙ্গে শান্তি আলোচনায় অংশ নিয়েছিলাম–একবার সরাসরি মাসউদের সঙ্গে এবং আরেকবার তার প্রতিনিধিদের সঙ্গে।

প্রথমবার, মাসউদ আমিরুল মুমিনীন (তালেবান নেতা মোল্লা ওমর)-কে ফোন করে বলেন যে তিনি আলোচনার মাধ্যমে দ্বন্দ্ব মীমাংসা করতে চান। তারা ফোনে সংক্ষিপ্তভাবে কথা বলেন এবং সিদ্ধান্ত হয় আমি তার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করব। যদিও আমার বন্ধুবান্ধব ও পরিবার এতে আপত্তি করেছিল, আমি বাগরাম হয়ে 'সারাক-এ-নও' অঞ্চলে যাই। এটি ছিল মাসউদের নিয়ন্ত্রিত এলাকা; অনেকে আমাকে বলেছিল যেন নিরপেক্ষ কোনো স্থানে দেখা করার চেষ্টা করি, কিন্তু মাসউদ সেটা প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে তালেবান অন্যত্র দেখা করলে তাকে হত্যা বা বন্দি করতে পারে। আমি তাকে জানাই যে আমি পানশিরে যাব এবং ইনশাআল্লাহ আমরা একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছাব।

বাগরামের কাছে আলোচনাগুলো প্রায় চার ঘণ্টা স্থায়ী হয়, যার অধিকাংশ সময় আমি মাসউদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েই কাটাই। আমি রাতের মাঝামাঝি কাবুল থেকে কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে রওনা হই। মাসউদ এবং তার লোকজন রাস্তার একপাশে অপেক্ষা করছিল। আমরা আমাদের পাতু বিছিয়ে–চাঁদের আলোতেই দিকনির্দেশনা নিয়ে–গাছতলায় বসে আলোচনা করি।

তিনি শান্তির জন্য কিছু পরিকল্পনা এনেছিলেন, কিন্তু তার মধ্যে একটি ছিল যৌথ সামরিক জোট গঠনের প্রস্তাব। মাসউদের সঙ্গে সাক্ষাতের আগেই মোল্লা ওমর আমাকে বলেছিলেন যে তিনি মাসউদকে রাজনৈতিক বা বেসামরিক ক্ষেত্রে পদ দিতে রাজি, কিন্তু সামরিক দায়িত্ব ভাগাভাগি করাটা বিপজ্জনক হবে। মোল্লা সাহেবের মতে, মাসউদকে সামরিক ক্ষমতা দিলে সমস্যা আরও বাড়বে। কিন্তু মাসউদ বারবার সামরিক ক্ষমতা ভাগাভাগির গুরুত্বের ওপর জোর দেন।

তিনি বলতেন, "আমরাও পবিত্র জিহাদে অংশ নিয়েছি! আমাদের সমান অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে।" কিন্তু মোল্লা সাহেবের যুক্তি ছিল, "আমরা তোমাদের সম্মান করি। আমরাও মুজাহিদ, আমরাও জিহাদ করেছি, কিন্তু সামরিকভাবে আমাদের একটি ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্ব দরকার।"

আমাদের আলোচনার একটি উদ্দেশ্য ছিল বন্দি বিনিময় নিয়ে সমঝোতা, কিন্তু মাসউদ এই বিষয়টিকে একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক বোঝাপড়ার সঙ্গে যুক্ত করেন, ফলে আলোচনা কোনো ফল ছাড়াই শেষ হয়। আমরা শুধু ভবিষ্যতে আবার আলোচনা চালিয়ে যাব বলে একমত হই। বিদায়ের সময় আমি তাকে বলেছিলাম যে ব্যক্তিগতভাবে একজন মুজাহিদ হিসেবে আমি তার জিহাদকে সম্মান করি, ঠিক যেভাবে আফগান জনগণও জিহাদে অংশ নিয়েছিল।

আমি বলেছিলাম, "আমরা দুজনই আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এই পবিত্র দায়িত্বে অংশ নিয়েছি এবং ত্যাগ স্বীকার করেছি। কিন্তু একজন মুজাহিদ হিসেবে বলছি, একতা মানে কে নেতৃত্ব দেবে–উত্তর না দক্ষিণ–তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা নয়। একতা মানে জাতির স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া। দেশের চাহিদাকে গুরুত্ব না দিলে জিহাদের নাম ও মুজাহিদদের সততা ও নীতিবোধের সুনাম ক্ষুণ্ন হবে। এখন পর্যন্ত যা ঘটেছে, তাও যথেষ্ট ক্ষতিকর ছিল।"

কয়েক মাস পর মাসউদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমার দ্বিতীয় বৈঠক হয়। পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় তিনি আর সরাসরি সাক্ষাতে রাজি হননি। মোল্লা সাহেব আমাকে আলোচনার দায়িত্ব দেন এবং আমি মৌলভী আগা মোহাম্মদ ও মৌলভী আবদুল হাই-কে সঙ্গে নিই। আলোচনা তালেবান ও মাসউদের বাহিনীর মধ্যবর্তী 'নো ম্যানস ল্যান্ড'-এ অনুষ্ঠিত হয়।

মাসউদ মৌলভী আতাউল্লাহ ও আরেকজন প্রতিনিধি পাঠান, যার নাম আমার মনে নেই। আলোচনার পরিবেশ ছিল ইতিবাচক, কিন্তু এবার তারা একটি নতুন বিষয় তুলে ধরেন–উলামাদের নিয়ে একটি যৌথ পরিষদ গঠনের প্রস্তাব। তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী, উভয় পক্ষ থেকেই পঞ্চাশজন আলেম মনোনীত হতেন যাতে পরিষদে ভারসাম্য বজায় থাকে। মাসউদ ভয় করতেন আবার যেন হাবিবুল্লাহ কালাকানী ও নাদির খানের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না হয়, তাই তিনি ক্ষমতায় থাকতে চাইতেন।

আমাদের দৃষ্টিতে বিষয়টি ছিল সহজ। আমরা বলেছিলাম, আলেমরা ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং শরিয়াহ্ সম্পর্কিত বিষয়ে মতামত দেন, যার জ্ঞান তাদের রয়েছে। তাদের ভূমিকা ইসলামি শাসনে ঘাটতি খুঁজে তা সংশোধনে সহায়তা করা এবং সমস্ত কার্যক্রম ও পরিকল্পনাকে শরিয়াহ্‌র আলোকে সঠিক রাখা। যদি তারা উলামা পরিষদের মাধ্যমে সামরিক ক্ষমতা ভাগাভাগির কথা বলেন, তবে সেটা স্পষ্টভাবেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং শরিয়াহ্ সংশ্লিষ্ট নয়।

আমি আবারও ব্যাখ্যা করে বলেছিলাম, "সামরিক ক্ষমতার বিভাজন সংঘর্ষ ও রক্তপাত বাড়াবে এবং মোল্লা সাহেব এর সঙ্গে একমত হবেন না।" তারা আবারও বন্দি বিনিময়ের বিষয়টিকে তাদের রাজনৈতিক উচ্চাশার সঙ্গে যুক্ত করেন। আমি অনেক চেষ্টা করেও আলোচনাকে এই বিষয়ে ফিরিয়ে আনতে পারিনি। আমি স্পষ্টভাবে বলেছিলাম যে, বন্দি বিনিময়কে রাজনৈতিক দাবির সঙ্গে যুক্ত করা নিষ্ঠুর ও অবিবেচকের কাজ। তবুও তারা তা প্রত্যাখ্যান করেন।

এই দ্বিতীয় বৈঠকে আমরা দুটি সেশন করি। চারিকারের প্রধান ইমাম এই আলোচনায় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে অংশ নেন, কিন্তু আবারও আলোচনার কোনো দৃশ্যমান ফল আসেনি, শুধুমাত্র ভবিষ্যতে আলোচনার আশাই থেকে যায়।

এই আলোচনার সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক ছিল–উভয় পক্ষই জানত যুদ্ধ কোনো সমাধান নয়, এটি ধ্বংসাত্মক এবং কোনো পক্ষেরই উপকারে আসে না। যুদ্ধ আফগানিস্তানের শত্রুদেরই লাভবান করে এবং গৃহযুদ্ধ জাতিগত ব্যবস্থারও পতনের কারণ হয়ে ওঠে। সবাই জানত আফগান জনগণ যুদ্ধ থেকে ক্লান্ত ও শান্তি চায়, কিন্তু তারপরও যুদ্ধ চলতে থাকে এবং কোনো সমাধান পাওয়া যায়নি।

যদিও উভয় পক্ষেরই বিদেশি সমর্থকরা যুদ্ধকে উসকে দিয়েছিল, আসল কারণ ছিল সেই ব্যক্তিরাই যারা এতে অংশ নিয়েছিল। আমি প্রায় দেড় বছর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে কাজ করার পর অব্যাহতি দিই। আমি আমার কাজে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, এবং কিছু বিষয় যা আমাকে তদন্ত করতে বলা হয়েছিল তা আমার মনে অস্বস্তি সৃষ্টি করেছিল।

আমাকে মন্ত্রণালয়ের আর্কাইভ থেকে সেই সব আফগান কমিউনিস্টদের খুঁজে বের করতে বলা হয়েছিল, যারা কমিউনিস্ট শাসনে আফগানদের হত্যার জন্য পদক বা সম্মাননা পেয়েছিল। শোমালির ঘটনার ওপর একটি তদন্তও চলছিল, যার ফলাফল আমাকে সন্তুষ্ট করেনি। এসব কঠিন ও পরিশ্রমসাধ্য কাজ আমাকে মানসিকভাবে প্রভাবিত করেছিল, তাই আমি পদত্যাগ করি। আমি দায়িত্ব হস্তান্তর করে ঘরে ফিরে আসি।

MINES AND INDUSTRIES

আমি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পদত্যাগ করার পর প্রায় তিন মাস কাবুলে আমার বাড়িতেই ছিলাম। পরে জানতে পারি, আমার পুরোনো বন্ধু মতিউল্লাহ এনাম শেরপুরের লজিস্টিক বিভাগে কাজ করছেন। আমি সাইকেল নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এবং কিছু পড়াশোনা করতে যাই।

এই সময়টা অনেকভাবে কঠিন ছিল, বিশেষ করে আর্থিকভাবে। কিন্তু মন্ত্রণালয়ে থাকার সময়ের চেয়ে তখন অনেক বেশি সুখী ছিলাম। নিজেকে স্বাধীন মনে হচ্ছিল, কেউ আমাকে বিরক্ত করত না। তবে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে দীর্ঘদিন কাজ করার পর আবার সাধারণ জীবনে ফিরে আসাটা সহজ ছিল না। চাকরি ছাড়ার পর রাজনৈতিক এবং আর্থিক উভয় দিক থেকেই কঠিন সময় পার করছিলাম। মাঝে মাঝে নিরাপত্তা নিয়েও দুশ্চিন্তা হতো। তবু আমি একটি সাধারণ ও নির্ভার জীবন যাপন করতে চেয়েছিলাম। মাঝে মাঝে বন্ধু-বান্ধবরা ওয়াজির আকবর খান মসজিদের সামনে আমার বাসায় এসে খোঁজখবর নিত, অনেকে অর্থ সাহায্যও করত। আমি বেশিরভাগ সময় নিজের ঘরেই থাকতাম, আর নিয়মিত মসজিদে নামাজ পড়তাম।

এক সকালে, ফজরের নামাজ পড়ে মসজিদ থেকে বের হতেই এক তালিব আমার কাছে এসে বলল, “আজ মাওয়েন সাহেব আপনার বাড়িতে নাশতার জন্য আসবেন।” আমরা তালেবানের ডেপুটি লিডার মোল্লা মোহাম্মদ রাব্বানিকে 'মাওয়েন সাহেব' বলে সম্বোধন করতাম।

আমি বাড়ি ফিরে গিয়ে চা ও নাশতার আয়োজন করলাম। হাজী মাওয়েন মোল্লা মোহাম্মদ রাব্বানি সাহেব ঠিক সূর্য ওঠার সময় এসে পৌঁছালেন। তিনি একজন ধৈর্যশীল ও সদয় মানুষ ছিলেন, ধীরে কথা বলতেন। তিনি বসে আমার পরিবার, কাজকর্ম ও স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিলেন। এরপর জিজ্ঞেস করলেন, কেন আমি গত তিন মাসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাইনি। আমি দুঃখ প্রকাশ করে বললাম, আমি পড়াশোনায় ব্যস্ত ছিলাম এবং জানতাম উনি ব্যস্ত মানুষ–তাই সময় নষ্ট করতে চাইনি।

মোল্লা মোহাম্মদ রাব্বানি বললেন, তিনি আমার বিষয়টি আমিরুল মোমিনিন মোল্লা মোহাম্মদ ওমর সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং তাঁরা দুজনেই চেয়েছেন আমি যেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ফিরে যাই। তাঁকে অসম্মান করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ আমি তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করতাম। কিন্তু আবার মন্ত্রণালয়ে ফিরে যাওয়ার কথা চিন্তাও করতে পারছিলাম না। তিনি কথা শেষ করলে আমি কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম, তারপর খুব সতর্কভাবে বললাম:

“হাজী মাওয়েন সাহেব! আপনি জানেন আমি আপনাকে খুব সম্মান করি। কিন্তু আমার কাজের বিষয়ে আমি সত্য কথাটাই বলব। আমার মনে হয় আমিরুল মোমিনিন বর্তমানে আমার উপর সন্তুষ্ট নন। আমি জানি না কেন, আর জানার প্রয়োজনও বোধ করি না, কিন্তু এরকম পরিবেশে আমার পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়। আমি কখনোই টাকা, পদ বা ক্যারিয়ারের জন্য কাজ করিনি, তাই সিদ্ধান্তটা আমারই নেওয়া উচিত। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে কাজ করার সময় যেসব সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলাম, সেগুলোর এখনও কোনো সমাধান হয়নি। সেই সমস্যাগুলোর

মুখোমুখি হতে আবার সেখানে ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সেই কারণেই তো আমি পদত্যাগ করেছিলাম। আমি ক্লান্ত। এখন পড়াশোনায় মন দিতে চাই, আর দুনিয়ার বিষয়-আশয়ে জড়াতে চাই না।”

মোল্লা মোহাম্মদ রাব্বানি বললেন, আমি যেন ধৈর্য ধারণ করি এবং তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন আমার পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার জন্য। “আমরা আবার দেখা করব” , তিনি বললেন বিদায় নেওয়ার সময়। “খুব শিগগিরই।”

কয়েকদিন পর তিনি আমাকে ফোন করলেন। বললেন, আমি যেন কান্দাহারে গিয়ে মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের সঙ্গে দেখা করি এবং নিজেই তাঁর সঙ্গে কথা বলি। আমি যেতে চাইনি। নানা অজুহাত দেখিয়ে যাত্রা পিছিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু মোল্লা রাব্বানি জোর দিয়েই বললেন, “তুমি নিজে যাবে, না আমি নিয়ে যাবো।”

পরদিন আমি কাবুল থেকে আড়িয়ানা এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে কান্দাহার যাই এবং সরাসরি মোল্লা মোহাম্মদ ওমর সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাই।

আমি বিমানবন্দর থেকে সরাসরি গভর্নরের দফতরের পেছনে তাঁর অফিসে যাই। তিনি তখন কয়েকজন দেহরক্ষীর সঙ্গে ঘরে বসে ছিলেন। আমরা অভিবাদন বিনিময় করি, কিন্তু তিনি তাড়াতাড়ি মূল বিষয়ে চলে আসেন।

“তোমাকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ফিরে যেতে হবে” , তিনি বললেন। আমি বললাম, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। তিনি আমার কথা উপেক্ষা করে বললেন, “তুমি মন্ত্রণালয়ে ফিরে যাবে, নইলে আমি তোমাকে জেলে পাঠাবো”। আমি কিছুক্ষণ চুপচাপ ভাবলাম, তারপর তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, আমি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ফিরে যাবো না; আমি প্রস্তুত নই। আপনি যদি আমাকে কারাগারে পাঠাতে চান, তাহলে সেটা আপনি করতে পারেন।

মোল্লা মোহাম্মদ ওমর অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন। “ঠিক আছে” , তিনি বললেন, “তুমি যদি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে না ফিরতে চাও, তাহলে তোমাকে বেসামরিক কোনো মন্ত্রণালয়ে কাজ করতে হবে।” এরপর তিনি আমাকে ৪ লক্ষ পাকিস্তানি রুপি সমমূল্যের একটি চেক দিলেন। তিনি জেনেছিলেন আমি ঋণে ডুবে আছি। কিন্তু আমি বিনীতভাবে ক্ষমা চেয়ে সেই টাকা ফিরিয়ে দিলাম।

তিনি বললেন, আমি যেন আবার কাবুল ফিরে যাই। হাজী মাওয়েন সাহেব সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

*****

কাবুল ফিরে এসেও আমি এখনও ভেতরে ভেতরে অস্থির ছিলাম। সরকারের কাজে ফেরার কোনো ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু জেলে যাওয়াও তো বাস্তবিক কোনো বিকল্প ছিল না। আর আমি সাঙ্গিসারে শপথ করেছিলাম, যে কোনো পরিস্থিতিতেই মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের পাশে থাকব। কাবুলে ফিরে দুই দিনের মাথায় আমাকে খনিজ ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। আমিরুল মোমিনিন স্বাক্ষরিত একটি ফরমান রেডিওতে ঘোষণা করা হয়। কয়েক দিন পর স্বাধীন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কিছু সদস্য আমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে মন্ত্রণালয়ে পরিচয়

করিয়ে দেন। মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ছিলেন মৌলভী আহমদ জান সাহেব এবং প্রথম উপমন্ত্রী ছিলেন মৌলভী মোহাম্মদ আজম এলমি। আমি পূর্ব থেকেই দুজনকে চিনতাম। তাঁরা ভালোমানুষ এবং ধার্মিক ছিলেন।

আমি নতুন পদে সহজেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারলাম এবং কিছুদিনের মধ্যেই কাজটা উপভোগ করতে লাগলাম। কিছুদিন পরেই খনিজ ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে একটি নতুন "হালকা শিল্প মন্ত্রণালয়" যুক্ত করা হয়, আর এই যৌথ মন্ত্রণালয়ই তখন আফগান অর্থনীতি পুনর্গঠনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয়। অনেকে আশা করেছিল যে এই মন্ত্রণালয় ভবিষ্যতে আফগানিস্তানের উন্নয়ন ও পুনর্গঠনে মুখ্য ভূমিকা রাখবে। তবে বাস্তবে আমাদের সক্ষমতা ছিল অত্যন্ত সীমিত। প্রাদেশিক পর্যায়ে মন্ত্রণালয়ের অনেক শাখা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করত কিংবা ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহৃত হতো।

প্রাদেশিক গভর্নরদের সঙ্গে রাজধানীর মন্ত্রণালয়গুলোর বিরোধ লেগেই থাকত। গভর্নররা প্রাদেশিক দপ্তরগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখতে চাইতেন, আর কাবুলের মন্ত্রণালয়গুলো কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করত। তালেবানরা তখন দেশের প্রায় ৯০ শতাংশ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করত, কিন্তু অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ছিল প্রকট। বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার নিজেদের মতো কাজ চালাত, কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয় ও গভর্নরদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ছিল সর্বত্র। এসব সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি এবং এই দ্বন্দ্বগুলো থেকেই গেছে ২০০১ সালে ইসলামিক আমিরাত পতনের আগ পর্যন্ত।

মন্ত্রণালয়ে আমার প্রথম কদিন ছিল দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার সময়। আফগানিস্তানের প্রাকৃতিক সম্পদের বেশিরভাগই দেশের উত্তরাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত। তখনকার সময়ে রাসায়নিক কারখানা, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, গ্যাস ও তেল শোধনাগার, সিমেন্ট কারখানা, কয়লা খনি, মার্বেল ও রত্ন শোধনাগার, লবণ খনি ও অন্যান্য ভারী শিল্পের বেশিরভাগই উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত ছিল এবং এগুলো নানা জিহাদি কমান্ডারের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। যুদ্ধ এবং অবহেলার কারণে সবকটি শিল্পই ধ্বংসপ্রাপ্ত ও পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল।

মাজার-ই-শরিফের কুদু বারক কারখানার উৎপাদন ৮০ শতাংশের বেশি কমে গিয়েছিল। সংশ্লিষ্ট কমান্ডাররা ন্যূনতম মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ করত না, কেবল সম্পদ লুটপাট করত। উদাহরণস্বরূপ, যে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ১৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা, তা তখন মাত্র ৬ মেগাওয়াট দিচ্ছিল। রাসায়নিক কারখানায় যেখানে ৪,০০০ বস্তা সার উৎপন্ন হবার কথা, সেখানে ৭০০ বস্তাও তৈরি হচ্ছিল না। আরেক উদাহরণ ছিল সার-ই-পুলের তেলক্ষেত্র। স্থানীয় কমান্ডাররা রাতের আঁধারে পালাক্রমে যতটা সম্ভব তেল ও গ্যাস উত্তোলন করত, কোনো প্রকার কারিগরি মানদণ্ড অনুসরণ না করেই। উত্তরাঞ্চলের জেলাজুড়ে শত শত নতুন কূপ খনন করা হয়েছিল, কিন্তু এতে পরিবেশ ও ভূগঠনের ওপর যে বিরূপ প্রভাব পড়ছিল, সে বিষয়ে কোনো চিন্তা করা হয়নি। আমি মন্ত্রণালয়ে যোগ দেওয়ার সময়, এসব কূপ ছিল বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত। ভূমিকম্পে অনেক কূপ ধসে পড়েছিল। দোস্তমের অধীনস্থ কমান্ডাররা অত্যন্ত অপেশাদারভাবে উচ্চচাপে তেল উত্তোলন করেছিল। ফলে কূপগুলোতে পানির অনুপ্রবেশ শুরু হয় এবং কখনো কখনো মাটির নিচে কম্পন অনুভূত হতো, যা প্রমাণ করত ভূপৃষ্ঠের কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বাকি শিল্প কারখানাগুলোর অবস্থাও ছিল প্রায় একই রকম। তাই আমরা পুনর্গঠনের কাজ শুরু করি। যদিও আমাদের সম্পদ ছিল খুব সীমিত, তবুও কিছুদিনের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা যেতে লাগল।

আমিরুল মোমিনিন আমাকে আরেকটি দায়িত্বও দিয়েছিলেন–উত্তরাঞ্চলের শিল্প ব্যবস্থার মহাপরিচালক। আমি সময়ের অর্ধেক কাবুলে এবং বাকিটা উত্তরাঞ্চলে কাটাতাম। এক অর্থে আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয় ও প্রাদেশিক দপ্তরগুলোর মধ্যে একটি সেতুবন্ধন হয়ে উঠেছিলাম। আমার প্রথম দায়িত্বগুলোর একটি ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। আমি প্রতিটি প্রদেশে রেডিও সেট বিতরণের সিদ্ধান্ত নিই এবং বাধ্যতামূলক দৈনিক উৎপাদন প্রতিবেদন পাঠানোর সময়সূচি চালু করি।

সার-ই-পুলের উৎপাদন ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ধীরে ধীরে আগের পর্যায়ে ফিরে আসে। ইটভাটা, বরফ কারখানা ও পানির প্লান্ট পুনর্নির্মাণ করা হয়। ইঞ্জিনিয়াররা পুরনো কূপগুলো পরীক্ষা ও মেরামত করেন। গ্যাস সরবরাহ নেটওয়ার্ক শেবারগান থেকে মাজার-ই-শরিফ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। সিমেন্ট উৎপাদন বাড়ে, এবং গোটা উত্তরাঞ্চলে শিল্প কারখানাগুলো আবার চালু হয়। নতুন শোধনাগারের জন্য বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে চুক্তি সই হয়।

*****

তুর্কমেনিস্তান, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান হয়ে আন্তর্জাতিক গ্যাস পাইপলাইনের পরিকল্পনার প্রাথমিক ভিত্তি তৈরি হয়েছিল, কিন্তু ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ দেশটিতে তথাকথিত "সন্ত্রাসীদের" উপস্থিতির কারণ দেখিয়ে ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে সেই পরিকল্পনা থমকে যায় ও স্থগিত হয়। তবুও, ১৯৯৯ সাল নাগাদ আমাদের মন্ত্রণালয় জাতীয় কোষাগারে ৩.৫ মিলিয়ন ডলার জমা দেয়, যে অর্থ পূর্বে ব্যক্তিগত পকেটে চলে যেত।

আফগানিস্তানের সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে এর প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেলের মজুত, যা শুধু দেশের জন্য নয়, বিশ্বব্যাপী চাহিদাসম্পন্ন। আসলে, এটি মূলত পশ্চিমা উন্নত দেশগুলোর–বিশেষ করে আমেরিকার সীমাহীন ভোগবাদী অর্থনীতির–চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন। ইউনোকল (Unocal) নামের একটি মার্কিন কোম্পানি আফগানিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানের গ্যাস ও তেলের সম্পদের নিয়ন্ত্রণ পেতে চেয়েছিল, এবং তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল ব্রিডাস (Bridas) নামে একটি আর্জেন্টাইন কোম্পানির সঙ্গে।

ব্রিডাস তুলনামূলকভাবে বেশি উপযুক্ত বলে মনে হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত তারাই চুক্তি পায়। তবে ইউনোকল ও কিছু ইউরোপীয় কোম্পানি আফগানিস্তানের বিদ্যমান তেলসম্পদ পরিশোধনের অধিকার সংরক্ষণ করে। ইসলামিক এমিরেট অফ আফগানিস্তান–বিশেষত খনিজ ও শিল্প মন্ত্রণালয়–সকল কোম্পানির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে আলোচনা চালিয়েছিল। ব্রিডাস ১৯৯৭ সালের মার্চে কাবুলে এবং পরে কান্দাহারে অফিস খোলে। ইউনোকলও তাদের কান্দাহার কম্পাউন্ডে প্রাথমিক কাজ শুরু করেছিল।

আফগানিস্তানের পক্ষ থেকে আমরা এমন একটি সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম যা দেশের চাহিদা পূরণ করবে এবং উন্নয়নে সহায়ক হবে। আমরা ভাবতাম, উভয় কোম্পানির মধ্যে চুক্তি ভাগ করে দিলে দেশের জন্য উপকারী

হবে, কিন্তু ইউনোকল একচেটিয়া চুক্তির দাবি করেছিল। আমার ধারণা, তারা ভেবেছিল ইসলামিক এমিরেট বিদেশি চাপ সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু আমরা দেশের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলাম এবং স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। চুক্তিতে ব্রিডাস থাকত, আর ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো সাবকন্ট্রাক্টর হিসেবে কাজ করত।

কান্দাহারে একটি নতুন শোধনাগার নির্মাণ শুরু হয়েছিল। এ সময় একটি গ্রিক কোম্পানি স্যাটেলাইট চিত্র বিশ্লেষণে $১ মিলিয়ন বিনিয়োগ করে এবং কান্দাহার ও হেলমন্দে উল্লেখযোগ্য সম্ভাব্য তেলক্ষেত্র আবিষ্কার করে। এই জরিপের ফলাফল প্রকাশের পর ইউনোকলের অনমনীয় মনোভাবের জন্য তারা কি আফসোস করেছিল? আমার ধারণা, ইউনোকল পরে ভাবতে শুরু করেছিল যে ইসলামিক এমিরেটকে প্রকল্প সম্পন্ন করার সময় দেওয়া উচিত, কারণ তারা ভেবেছিল আমাদের অব্যবস্থাপনায় শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থ হবে। পরে আমেরিকা জাতিসংঘের মাধ্যমে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং যেসব কোম্পানি আফগানিস্তানে কাজ করতে আগ্রহী ছিল, তাদেরকেও বাধা দেয়।

ইরান, যার তিন পক্ষের সঙ্গেই সীমান্ত রয়েছে, আমাদের পরিকল্পনা ভণ্ডুল করতে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছিল। তারা আফগানিস্তানকে অস্থিতিশীল করতে এবং বিনিয়োগকারীদের ভয় দেখাতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, গ্যাস পাইপলাইনটি আফগানিস্তান নয়, বরং ইরানের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক। কিন্তু কাজাখস্তানের প্রেসিডেন্ট নূর সুলতান নজরবায়েভ এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ছিলেন এবং পূর্ব পরিকল্পনামাফিক আফগানিস্তান হয়ে পাইপলাইন যাওয়ার পক্ষে অবস্থান নেন। তুর্কমেনিস্তানের নেতারও আফগানিস্তান সংক্রান্ত আগ্রহ ছিল।

আমি একবার মনে করি, আমরা নজরবায়েভের অতিথিশালায় দুপুরের খাবারের সময় একটি বৈঠক করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, আফগানিস্তানকে তিনি দুটি উপহার দেবেন–প্রথমত, কিছু প্রদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবেন; দ্বিতীয়ত, তেল ও গ্যাস পাইপলাইন আফগানিস্তানের মধ্য দিয়েই যাবে, যদিও এতে নিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় অনেক বছর লেগে যেতে পারে।

অন্যদিকে, ইরান ইসলামিক এমিরেটের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নর্দার্ন অ্যালায়েন্সকে আর্থিক, গোলাবারুদ এবং লজিস্টিক সহায়তা দিতে শুরু করে।

*****

আমি যখন মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ছিলাম, তখন আমরা কাবুল, মাজার-ই-শরীফ, হেরাত, কান্দাহার এবং জালালাবাদে শিল্প পার্ক নির্মাণ করি এবং ছোট-বড় চার শতাধিক প্রকল্পের জন্য জমি অনুমোদন করি। আমাদের অন্যতম প্রধান সমস্যা ছিল ইরান ও পাকিস্তানের সঙ্গে উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্ক। আফগানিস্তানে নিজস্ব বাজার খুবই সীমিত ছিল এবং আমাদের উৎপাদনের বেশিরভাগ অংশই প্রতিবেশী দেশগুলোতে রপ্তানি করতে হতো। যদিও আমরা কিছু কারখানা পুনর্গঠন করতে এবং কিছু নতুন শিল্প স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলাম, তবুও কাঁচামালের জন্য আমাদের নির্ভর করতে হতো পাকিস্তান ও ইরানের ওপর। যখন তারা কাঁচামালের ওপর রপ্তানি শুল্ক আরোপ

করতে শুরু করল, তখন আমাদের নবগঠিত শিল্পগুলোর কার্যকারিতা একরকম বন্ধ হয়ে গেল; কারণ আফগানিস্তানে উৎপাদনের খরচ তখন আমদানির চেয়ে বেশি হয়ে পড়ে।

এই একই অবস্থা তৈরি হয়েছিল আমদানি করা পণ্যের ক্ষেত্রেও। যতবার আমরা কোনো পণ্য নিজেরাই উৎপাদনের উপযোগী হতাম, পাকিস্তান তখন তাদের কোম্পানিগুলোর জন্য কর-ছাড় দিত, যাতে তারা একই পণ্য উৎপাদন করে আমাদের শিল্পকে ধ্বংস করে দিতে পারে। আবার কখনো তারা কম মানের, সস্তা কাঁচামাল ব্যবহার করে খারাপ মানের পণ্য তৈরি করত, যা আমাদের পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারত না। উদাহরণস্বরূপ, সার নিয়ে যদি বলি–আফগানিস্তান শিল্পমান অনুযায়ী ৪৬ শতাংশ নাইট্রোজেনযুক্ত সার উৎপাদনে সক্ষম হয়েছিল। পাকিস্তান ও ইরানও একই মানের সার দাবি করে তা সস্তায় বিক্রি করছিল। অধিকাংশ আফগান কৃষক এই সস্তা সার কিনে নিচ্ছিল। আমরা এই সার পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে দেখি, এতে ঘোষিত ৪৬ শতাংশের পরিবর্তে মাত্র ২০ শতাংশ নাইট্রোজেন ছিল। এর ফলে বহু কৃষকের জন্য মারাত্মক ক্ষতি হয়, ফলন কমে যায়, শস্য রোগাক্রান্ত ও পোকামাকড়ে আক্রান্ত হয়। এটাই ছিল ফসল কমে যাওয়ার মূল কারণ।

শিগগিরই অনেক আফগান নাগরিক প্রতিবেশী দেশগুলোর ঘি, প্লাস্টিক ও লোহা-এর মান নিয়ে অভিযোগ করতে শুরু করে। এই সব পণ্য আমাদের দেশীয় প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে উৎপাদন করা সম্ভব ছিল, তবে এর জন্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষে অনেক বড় বিনিয়োগ প্রয়োজন ছিল, যা আমরা করতে পারিনি। কেবল কয়লা, লবণ ও মার্বেল খনি উন্নত করা গিয়েছিল। এই পণ্যগুলো অনেক সময় আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যের চেয়েও কম দামে বিক্রি হতো। রুখাম মার্বেল পাকিস্তানে রপ্তানি করা হতো, যেখানে তা পালিশ করে উল্লেখযোগ্য লাভে পুনরায় বিক্রি করা হতো। পরে আমরা নিজেরাই কান্দাহার, হেরাত, কাবুল ও জালালাবাদে মার্বেল পালিশের কারখানা স্থাপন করি।

আমাদের মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেট খুবই সামান্য ছিল; প্রকৃতপক্ষে, এতে বিশেষ কিছু করার সুযোগ ছিল না–বিশেষ করে মৌলিক শিল্প গড়ে তুলতে যেখানে বিপুল অর্থ ও সম্পদের প্রয়োজন। তালেবান সরকারের বাৎসরিক মোট বাজেট ছিল প্রায় ৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর অধিকাংশই সামরিক খাতে ব্যয় হতো। অবশিষ্ট অর্থ থেকে আমাদের মন্ত্রণালয়ের জন্য উন্নয়ন বাজেট ছিল ৭০ থেকে ৭৫ বিলিয়ন আফগানি, যা তৎকালীন হিসাব অনুযায়ী মাত্র প্রায় ৭ মিলিয়ন ডলার। এই বাজেট কোনো গুরুতর উন্নয়ন প্রকল্প শুরু করার জন্য একেবারেই যথেষ্ট ছিল না; যেন গরম পাথরের ওপর একফোঁটা পানি পড়ে আর তৎক্ষণাৎ উবে যায়।

পেছনে ফিরে তাকালে আমি এখনো বিশ্বাস করি, সীমিত সময় ও অর্থের মধ্যে আমরা যে কাজগুলো করতে পেরেছিলাম তা ছিল সত্যিই অসাধারণ। আমাদের কার্যক্রমের সাফল্য অনেকাংশেই নির্ভর করেছিল মন্ত্রণালয়ের কর্মীদের ওপর। মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, পরিচালক ও কর্মচারীরা সবাই অত্যন্ত উৎসাহী ছিল এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে অনেক পরিশ্রম করেছিল। অর্থ প্রকল্পে ব্যয় হতো, ব্যক্তিগত পকেটে যেত না। একটি আর্থিক পরিষদ গঠন করা হয়েছিল, যাতে অর্থ, খনিজ ও শিল্প, এবং পরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা থাকতেন এবং পরিকল্পনা মন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রতি সপ্তাহে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা হতো এবং সমাধান খোঁজা হতো। আমি খনিজ ও শিল্প মন্ত্রণালয়ে আঠারো মাস কাজ করেছি।

আমি আমার কাজ উপভোগ করতাম এবং নিজের পদে পারদর্শী ছিলাম। সে সময় প্রায় প্রতিটি মন্ত্রীই চাইতেন আমি যেন তাদের মন্ত্রণালয়ে যোগ দিই, এবং অনেক অনুরোধ ও প্রস্তাব আসত আমাকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রেসিডেন্সি বা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে স্থানান্তর করার জন্য।

অবশেষে আমীরুল মোমিনীন সিদ্ধান্ত নিলেন যে আমি যেন পরিবহনবিষয়ক স্বতন্ত্র সাধারণ প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করি। তিনি একটি আনুষ্ঠানিক ফরমান জারি করলেন, যাতে আমি প্রশাসনের যেকোনো বিষয় পরিবর্তন করার পূর্ণ ক্ষমতা পাই। আমাকে অনেক সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়েছিল।

পরিবহন ব্যবসা প্রতিটি শহরের স্থানীয় অফিসগুলোর মাধ্যমে পরিচালিত হতো। কিছু প্রদেশে তালেবান স্থানীয় দপ্তরের নিয়ন্ত্রণ করত এবং লাভ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিত, আবার কিছু জায়গায় এই অফিসগুলো বেসরকারি খাতে পরিচালিত হতো। সরকারের কোনো স্পষ্ট ব্যবস্থা ছিল না, আর আমার পূর্বসূরি কোনো কার্যকর সমাধান বের করতে পারেননি। অনেক বেসরকারি পরিবহন অফিস স্থানীয় তালেবান কমান্ডারদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ত যারা নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর চেষ্টা করত। আর সবসময় এইসব দ্বন্দ্বের ভুক্তভোগী ছিল সাধারণ মানুষ। এই অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে অনেকেই কাবুলের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কাছে এসে আমাদের সমাধানের অনুরোধ করত।

সবাই জানত যে প্রশাসন গুরুতর সমস্যায় জর্জরিত, এবং আমি কাজ শুরুর আগেই এ সম্পর্কে অবগত ছিলাম। আল্লাহ সাক্ষী, আমি দায়িত্ব গ্রহণ করার সময় গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ছিলাম। পূর্বসূরিরা যেখানে ব্যর্থ হয়েছেন, আমি কীভাবে পরিবর্তন আনব? আমি কীভাবে স্থানীয় তালেবান কমান্ডারদের সঙ্গে নাগরিক প্রশাসনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখব?

নতুন পদে দায়িত্ব নেওয়ার পর আমি কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন সমস্যা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করি। আমি আফগানিস্তানের প্রধান প্রধান পরিবহন দপ্তরগুলো পরিদর্শন করি এবং ইউনিয়ন প্রধানদের সঙ্গে আলোচনা করি, কর্মীদের কাছ থেকে সমাধান ও পরিকল্পনা শুনি।

খুব শিগগিরই পরিবহন ইউনিয়নগুলোর মধ্যে আরেকটি সমস্যা প্রকাশ পায়—ব্যাপক দুর্নীতি। চালকরা অভিযোগ করতে শুরু করে। পরিবহন খাতে ঐতিহ্যগতভাবে একটি রোটেশন পদ্ধতি চালু ছিল, যাতে প্রত্যেক চালক পালাক্রমে কাজ পেত। কিন্তু এখন কিছু পরিবহন এজেন্ট চার-পাঁচটি গাড়ি ব্যবহার করে শুধু আত্মীয়স্বজনদের কাজ দিচ্ছিল এবং অন্যদের কাজ থেকে বঞ্চিত করছিল। ঘুষ দিয়ে চুক্তি নেওয়াও সাধারণ হয়ে উঠেছিল। তালেবান এজেন্টদের দাম কমাতে বাধ্য করেছিল, যার ফলে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে দুর্নীতি বেড়ে গিয়েছিল। কাজ হওয়ার কথা ছিল ন্যায় ও সুবিচারের ভিত্তিতে, কিন্তু বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যে কিছু লোক লাভবান হচ্ছিল আর অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল।

শেষ পর্যন্ত কাবুলে ফিরে আমি একটি সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করি। আমার ভ্রমণকালে যা দেখেছিলাম তার ভিত্তিতে আমি একটি তৃতীয় পথ গ্রহণ করি—যেটা পরিবহন এজেন্টদের আয় রক্ষা করে, আবার জনসাধারণের সমস্যাও সমাধান করে। আমি একটি নতুন আইন প্রণয়ন করি, যার মাধ্যমে সমস্ত পরিবহন

এজেন্টকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয় এবং সম্পূর্ণ পরিবহন খাত সরাসরি আমার প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে আসে। আমি এমন বিভাগীয় ব্যবস্থাপক নিয়োগ দেই যারা প্রতিদিন তাদের বিভাগের আয় একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে জমা দিতেন। এই লেনদেনগুলো নথিভুক্ত হতো, যা রোটেশন পদ্ধতিকে শক্তিশালী করত এবং নিশ্চিত করত প্রত্যেক চালক তার পালা পায়। আমরা নিরপেক্ষ কমিশনার নিয়োগ দেই, যারা নিজেরাই তালেবানের তত্ত্বাবধানে থাকতেন।

যদিও এখনো কিছু এজেন্ট ছিল যারা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ব্যবহার করে নিয়ম ভাঙত, তবুও ৯০ শতাংশের বেশি এজেন্ট নতুন ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করতে বাধ্য হয়। সুপারিশ, বন্ধুত্ব, হুমকি বা ঘুষের মাধ্যমে আর ব্যবসা করা যেত না।

নতুন এই ব্যবস্থায় হাজার হাজার মানুষ পরিবহন খাতে চাকরি পায় এবং অভিযোগ বন্ধ হয়ে যায়। চালক ও অন্যান্য কর্মচারীর আয়ও বাড়ে। তবে কিছু বেসরকারি এজেন্ট অভিযোগ করে, কারণ তাদের স্বার্থে আঘাত লেগেছিল। যদিও আইন সকলের উপকারে আসে, তারা কেবল নিজেদের লাভের কথা ভাবত। মাঝে মাঝে তাদের দেখে মনে হতো যেন তারা চোর, যারা সুবিচার বা ন্যায্যতায় আগ্রহী নয়।

এই পরিস্থিতিতে, সমস্ত বিভাগ সরকারী নিয়ন্ত্রণে নেওয়া অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিল। পরিবহন খাতে বেড়ে চলা সমস্যা দূর করতে হলে প্রথমে আমাকে স্থানীয় তালেবান কমান্ডার এবং বেসরকারি এজেন্টদের নিয়ন্ত্রণে আনতে হতো। এটি ছিল কঠিন কাজ, এবং তালেবান কমান্ডাররাও ঠিক ততটাই অভিযোগ করছিল যতটা বেসরকারি এজেন্টরা। এই কমান্ডাররা বলছিল, জনগণ অভিযোগ করছে না কারণ তারা বেসরকারি এজেন্টদের কাছ থেকে টাকা পাচ্ছে, আবার কেউ কেউ বলছিল, তারা অতীতে দেশের জন্য যুদ্ধ করেছে, তাই এখন তারা অর্থ পাওয়ার অধিকার রাখে। কিন্তু নতুন ব্যবস্থা সকলের ওপরই প্রযোজ্য ছিল—তালেবান কমান্ডার ও বেসরকারি এজেন্ট উভয়ের জন্য।

সব মিলিয়ে, আমার পরিকল্পনার প্রথম ধাপ সফল হয়েছিল এবং জনগণ পরিবর্তনে সন্তুষ্ট ছিল।

আমি যখন তাদের নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হলাম, তখন পরিকল্পনা করেছিলাম বিভাগগুলো আবার বেসরকারি খাতে ফিরিয়ে দেওয়ার। ধারণা ছিল, একবার একটি কার্যকর ব্যবস্থা স্থাপন করা গেলে, যেসব এজেন্ট ভবিষ্যতে নিয়ন্ত্রণ নেবে তারা নিয়ম মেনে চলবে এবং পরিবহন প্রশাসন তাদের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করতে পারবে। আমার প্রশাসনে থাকা অবস্থায় আমি এই প্রথম ধাপ শেষ করতে সক্ষম হই।

তবে এই নতুন ব্যবস্থা চালু করার মাত্র তিন মাস পর, আমীরুল মোমিনীন আমাকে পাকিস্তানে আফগানিস্তানের নতুন রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দেন।

*****

A MONUMENTAL TASK

২০০০ সালের কথা, আমি জালালাবাদ ও কুনারে গিয়েছিলাম পরিবহন ব্যবস্থার পর্যালোচনা করতে। তখনই প্রথম শুনলাম যে আমাকে রাষ্ট্রদূত হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। আমরা কেবল কাবুল থেকে বের হয়েছি, এমন সময় আমি রেডিওতে ঘোষণা শুনি। আগের নিয়োগগুলোর মতোই, আমির উল-মু' মিনীন আমার সঙ্গে কোনো আলোচনা করেননি, ফলে এই মনোনয়ন আমার জন্য একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল।

আল্লাহ সাক্ষী, আফগানিস্তান ছাড়ার ব্যাপারে আমি খুবই অখুশি ছিলাম। তখন ইসলামাবাদে রাষ্ট্রদূতের পদটি কাবুলের তালেবান কর্মকর্তাদের কাছে অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত ছিল। বেতন ভালো ছিল, আর জীবনমানও আফগানিস্তানের তুলনায় অনেক উন্নত ছিল। কিন্তু আমার দেশ এখনও ধ্বংসস্তূপে পরিণত, এমন অবস্থায় ইসলামাবাদের আরামদায়ক জীবন আমাকে আকর্ষণ করেনি।

ইসলামাবাদে আমাদের দূতাবাসের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ছিল। আমেরিকার অনুরোধে জাতিসংঘ আফগানিস্তানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল, যা ইসলামিক আমিরাত ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সম্পর্ক আরও জটিল করে তোলে। সে সময়ে দূতাবাসই ছিল আমাদের যোগাযোগের একমাত্র কেন্দ্র। খুব কম বিদেশি আফগানিস্তানে যেতেন, আর যেসব বিদেশি কূটনীতিক আফগানিস্তানের সঙ্গে কাজ করতেন, তারা সবাই ইসলামাবাদ হয়ে যেতেন।

শুধু পাকিস্তানের কাবুলে দূতাবাস ছিল এবং কান্দাহার, হেরাত ও জালালাবাদে তাদের কনস্যুলেট ছিল। তারা সরাসরি আফগানিস্তানে কাজ করত। সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরব ইসলামিক আমিরাতকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিলেও দূতাবাস খোলেনি; তারা ইসলামাবাদে আফগান দূতাবাসের মাধ্যমে যোগাযোগ চালিয়ে যেত। ফ্রান্স, জার্মানি, ব্রিটেন ও আমেরিকার মতো দেশগুলো ইসলামাবাদ থেকেই আফগানিস্তান বিষয়ক উচ্চপদস্থ কূটনীতিক পাঠাত এবং আমাদের দূতাবাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখত।

এমন এক স্পর্শকাতর ও সংকটময় কূটনৈতিক পরিবেশে, যেখানে আমার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না, কাজ করা ছিল অত্যন্ত কঠিন। ইসলামাবাদে দূতাবাসের গুরুত্ব ও চলমান ঘটনাবলিতে এর ভূমিকা সম্পর্কে আমি জানতাম, আর তাই নিয়োগের খবর শুনে আমি খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি।

কাবুলে ফিরে আমি সরাসরি দক্ষিণের নিজ বাড়িতে যাই। আমি আট দিন সেখানেই থাকি, নিজেকে গুটিয়ে নিই, আর এই নিয়োগ থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে বেড়াই। আমি মোল্লা মোহাম্মদ রাব্বানিকে একটি চিঠি লিখে পাঠাই যেখানে আমি আমার সমস্যাগুলো ব্যাখ্যা করি এবং বলি যে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি আশা করছিলাম, তিনি আমার পক্ষ নেবেন। তাঁর সমর্থন ছাড়া আমির উল-মু' মিনীনকে অন্য কাউকে নিয়োগে রাজি করানো প্রায় অসম্ভব হতো। কিন্তু বহু চেষ্টার পরও, মোল্লা রাব্বানি ও মোল্লা ওমর দুজনেই আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তারা বলেন, এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে; মনোনয়ন ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে এবং একটি ফরমান জারি হয়েছে। উপরন্তু, তারা নিশ্চিত ছিলেন আমি সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠব এবং আগের মতোই ভালো কাজ করব।

যখন আমি বুঝতে পারলাম যে ইসলামাবাদে আমাকে দায়িত্ব নিতে হবেই, তখন আমি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যাই, উপমন্ত্রী আব্দুর রহমান জাহেদের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি আমার আগমন দেখে বিস্মিত হন এবং এমন ভাব করেন যেন তিনি আমার নিয়োগ সম্পর্কে কিছুই জানেন না।

জাহেদ বলেন, মৌলভী ওয়াকিল আহমদ মুতাওয়াকিল, যিনি তখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন, হয়তো ফরমানের খবর পেয়ে থাকবেন, তবে তিনি তখন কান্দাহারে ছিলেন। অবশেষে যখন আমি মুতাওয়াকিলের সঙ্গে ফোনে কথা বলি, তখন জিজ্ঞেস করি যে তিনিই কি আমাকে এ পদের জন্য প্রস্তাব করেছিলেন? মুতাওয়াকিল জানান, তিনি সত্যিই মোল্লা ওমরের কাছে আমাকে এই দায়িত্বের জন্য সুপারিশ করেছিলেন, তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মোল্লা ওমর নিজেই। পরে মোল্লা ওমর নিজেও আমাকে বলেন যে সিদ্ধান্তটি তারই ছিল। আমি হতাশ হয়েছিলাম এবং বলেছিলাম যে আমাকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, আমি এই দায়িত্ব নিতে চাই কিনা।

আমি তাঁকে বলেছিলাম, "আমি ইসলামাবাদে যেতে চাই না, এবং আমি মনে করি না যে আমি ভালোভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারব। আপনি যদি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতেন, আমি কৃতজ্ঞ হতাম।" কিন্তু তিনি জানান, এখন আর পেছনে ফেরা সম্ভব নয়।

আর কাউকে বলারও কেউ ছিল না, তাই আমি নিয়তি মেনে নিলাম যে আমাকে পাকিস্তানে যেতে হবে। তখন পাকিস্তানও আমার নিয়োগ মেনে নিয়েছিল এবং ভিসা ইস্যু করেছিল। আমার নামে একটি কূটনৈতিক পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়েছিল এবং আমার ভাগ্য চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল।

পরদিন আমি জাতিসংঘের একটি ফ্লাইটে ইসলামাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হই। বিমানে আমার সঙ্গে ছিলেন হেরাকাত-ই ইনকিলাব-ই ইসলামী দলের নেতা, মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ নবি মোহাম্মদী। তিনি সদ্য লোগার ও কাবুলে এসেছিলেন তার তরুণ পুত্রের জানাজায় অংশ নিতে, এবং পুরো যাত্রাজুড়ে আমাদের মধ্যে কথোপকথন হয়। তিনি পাকিস্তানে তার কিছু অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। অবতরণের আগে তিনি আমাকে আশ্বস্ত করেন যে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করবেন।

*****

এটাই ছিল প্রথমবার, আমি একটি জাতিসংঘের চার্টার বিমানে উঠলাম এবং প্রথমবার ইসলামাবাদ বিমানবন্দরে অবতরণ করলাম। আমরা নেমে আসার পর, একটি ছোট গাড়ি আমাকে শহরের একটি ভিআইপি গেস্টহাউসে নিয়ে গেল। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রটোকল বিভাগের এক সহকারী কর্মকর্তা এবং আফগান দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি আমাকে স্বাগত জানালেন। চা পরিবেশন করা হলো এবং প্রটোকল কর্মকর্তা ইংরেজিতে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দিলেন।

তিনি সংক্ষেপে নিজেকে পরিচয় দিয়ে বললেন, "ইয়োর এক্সেলেন্সি! আমরা আপনাকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আশা করি আপনার অবস্থানকাল আনন্দদায়ক হবে। পাকিস্তান সরকার এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আপনার যেকোনো সহায়তায় প্রস্তুত থাকবে। পাকিস্তানকে আপনার দ্বিতীয় বাড়ি ভাবুন। আপনি

এখানে সম্মানিত অতিথি।” আমি এই তরুণ প্রটোকল কর্মকর্তার নাম মনে রাখতে পারিনি, শুধু মনে আছে তিনি পাঞ্জাবি ছিলেন। বক্তব্যের পর আমাকে আফগান রাষ্ট্রদূতের সরকারি বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হয়।

তবে প্রথম কয়েকদিন আমি আমার পূর্বসূরি সাইয়্যেদ মোহাম্মদ হাক্কানির ব্যক্তিগত গেস্টহাউসে অবস্থান করি। তিনি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব হস্তান্তর করেননি, তাই আমি তাৎক্ষণিকভাবে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব গ্রহণ করিনি।

প্রটোকল অনুযায়ী, আমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নিতে হতো, পূর্ববর্তী রাষ্ট্রদূতের কাছে আমার পরিচয়পত্র পেশ করার পর। কিন্তু মৌলভী সাইয়্যেদ মোহাম্মদ হাক্কানি তাড়াহুড়ায় ছিলেন। আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা বা দায়িত্ব হস্তান্তরের আগেই তিনি পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রফিক তারারকে বিদায় জানিয়ে ফেলেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি আইনগতভাবে আর আফগানিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন না, অথচ আমি তখনও আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচিত হইনি। তবুও, আমি দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার আগেই দূতাবাসের কার্যপ্রণালি ও দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা নিতে কাজ শুরু করি। দূতাবাসের কর্মীরা–কূটনৈতিক কর্মকর্তা এবং স্থানীয় কর্মচারীরা, যাদের অনেকেই আফগান বলেই মনে হতো–আমাকে উষ্ণভাবে স্বাগত জানালেন এবং আমার নতুন কাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

আমি রাষ্ট্রদূত থাকাকালীন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে চারবার সাক্ষাৎ করি। প্রথমবার ছিল সেই অনুষ্ঠানে, যখন আমি আমার পরিচয়পত্র প্রদান করি। সাধারণত এমন সরকারি সাক্ষাৎকারের আগে কিছুদিন সময় দেওয়া হয়, যাতে সবাই প্রস্তুতি নিতে পারে। অনুষ্ঠান হওয়ার দুই দিন আগে আমন্ত্রণপত্র আসে। তাতে উল্লেখ ছিল, আমাকে সকাল ৮টায় আমার পরিবার ও স্টাফসহ দূতাবাসে উপস্থিত থাকতে হবে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য।

আমার পুত্র আবদুল মানান ও ভ্রাতুষ্পুত্র হামিদুল্লাহ আমার সঙ্গে ছিল। সঙ্গে ছিলেন কাজী হাবিবুল্লাহ ফাওজি, যিনি দূতাবাসের সচিব এবং একজন বিচারক, আর ছিলেন মৌলভী আবদুল কাদির সাহেব, সামরিক অ্যাটাশে। সকাল ৮টায় পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রটোকল বিভাগ আমাদের প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেসে নিয়ে যায়।

প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেসে রঙিন ঘোড়ার সাজানো কয়েকটি কোচ অপেক্ষায় ছিল। আমাকে মাঝের কোচে বসানো হয় এবং পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের জাতীয় সংগীত বাজানো হয়। আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজের পর আমরা প্রেসিডেন্টের দপ্তরে প্রবেশ করি। আমি আমির উল-মু’ মিনীনের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে পরিচয়পত্র প্রদান করি এবং অনুষ্ঠান শেষ হয়।

প্রেসিডেন্ট আমাকে পুনরায় স্বাগত জানান এবং শুভেচ্ছা বার্তা দেন। তিনি আমাদের দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও সুসম্পর্কের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। প্রেসিডেন্টের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির মাধ্যমে, আমি এখন ইসলামী আমিরাত আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে প্রজাতন্ত্রী পাকিস্তান সরকারের কাছে নিযুক্ত হলাম। এরপর আমি দূতাবাসের সব উলামাদের আমার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাই আমার অভিষেক উদযাপন করার জন্য।

*****

আমি যখন আনুষ্ঠানিকভাবে আমার দায়িত্ব গ্রহণ করলাম, তখন দ্বিতীয়বারের মতো পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল সত্তারের সঙ্গে দেখা করি এবং আমাকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মঈনউদ্দীন হায়দারের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। তখন আমি বুঝতে পারিনি, কিন্তু আসলে আমার প্রথমেই আইএসআই-এর প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা উচিত ছিল।

পরে আমি জানতে পারি যে আইএসআই পাকিস্তান সরকারের ভেতরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরাও তাদের বাড়তে থাকা ক্ষমতা স্বীকার করত। এই গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তারা আফগানিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল এবং সোভিয়েত আগ্রাসনের আগেই আফগান রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করত। তবে, রাশিয়ানরা দাউদ খানের মাধ্যমে জহির শাহের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটানোর পর আইএসআই তাদের ক্ষমতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রকটভাবে প্রকাশ করে। যখন রাশিয়া আফগানিস্তানে অবস্থান শক্ত করছিল, তখন আইএসআই নিজেদের ক্রমবর্ধমান হুমকির মুখে অনুভব করে।

সোভিয়েতদের থামানোর প্রয়াসে, আইএসআই সেই জিহাদি নেতাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে, যারা ইতোমধ্যেই পাকিস্তানে এসে আফগানিস্তানের বাইরে থেকে সোভিয়েত-সমর্থিত সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছিল। ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে রুশদের সাবেক মিত্র দাউদ খানের বিরুদ্ধে 'সওর বিপ্লব' সংঘটনের সময়, আইএসআই ইতোমধ্যেই মুজাহিদদের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল এবং তাদের জন্য অর্থ, অভিযান ও প্রশিক্ষণের পরিমাণ দ্বিগুণ করে দিয়েছিল।

এই অঞ্চলের বাইরের বহু দেশ পাকিস্তানের সঙ্গে একমত হয়ে প্রকাশ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রমবর্ধমান প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। বহু আরব দেশও পাকিস্তানকে সমর্থন দিয়েছিল যেন কমিউনিজম ছড়াতে না পারে। ১৯৮০ সালে, আইএসআই-এর তত্ত্বাবধানে মুজাহিদরা পাকিস্তানে অফিস স্থাপন করে। মস্কো যখন রেড আর্মি পাঠিয়ে আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেয়, তখন পরিস্থিতি আরও গুরুতর হয়ে ওঠে। রাশিয়ান সেনাদের আগমন আফগান জনগণের ব্যাপক পালিয়ে যাওয়ার সূচনা করে এবং কয়েক বছরের মধ্যে পাকিস্তান প্রায় ২০ লক্ষ আফগান শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়। ছোট ছোট শরণার্থী শিবিরগুলো শিগগিরই শহরে রূপ নেয় এবং আইএসআই মুজাহিদদের সহায়তায় ব্যাপক কর্মসূচি শুরু করে। মুজাহিদদের ঐক্যবদ্ধ করে একটি কৌশলগত অবস্থান গ্রহণে বাধ্য করাও আইএসআই-এর দায়িত্ব ছিল। তালেবানদের আবির্ভাব পর্যন্ত আইএসআই জিহাদি গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এমনকি সে সময় পাকিস্তানের নিম্নপদস্থ কর্মকর্তারাও আফগানিস্তানে পাকিস্তানের চেয়েও বেশি জনপ্রিয় ছিলেন।

ইসলামী আমিরাত আফগানিস্তানের একজন সরকারি প্রতিনিধি হিসেবে এই বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থা থেকে স্বাধীনতা বজায় রাখা আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কিন্তু তাদের প্রভাব পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকালে আমি চেষ্টা করেছি এমন হতে না যে অতিরিক্ত মিষ্টি হয়ে গিলে খাওয়া যায়, আবার অতিরিক্ত তেতো হয়ে থুতু ফেলা হয়। আমি সবসময় প্রকাশ্যভাবে কাজ করার চেষ্টা করেছি, গোপনে নয়, এবং প্রধানত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করেই সম্পর্ক গড়েছি।

একদিন আইএসআই-এর পরিচালক জেনারেল মাহমুদ আমাকে মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ জানান। এটি ছিল একটি আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ এবং দূতাবাসের কয়েকজন কূটনীতিক আমার সঙ্গে যান। এই ভোজ অনুষ্ঠিত হয় রাওয়ালপিন্ডির আইএসআই সদর দপ্তরের গেস্টহাউসে। জেনারেল মাহমুদ এবং তাঁর ডেপুটি জেনারেল জৈলানী দুজনেই পাঞ্জাবি বলে মনে হলো। সেখানে আরও উপস্থিত ছিলেন 'আফগান ডেস্ক' -এর বিভিন্ন কর্মকর্তা, যেমন ব্রিগেডিয়ার ফারুক, কর্নেল গুল, মেজর হামজা ও মেজর জিয়া। আফগান ডেস্কের প্রধান কর্মকর্তারা সম্ভবত পশতু ছিলেন।

এটাই ছিল প্রথম ও শেষবার, আমি আইএসআই কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করি এবং তাদের 'কালো অফিস' এ প্রবেশ করি। যদিও পরে তারা আফগানিস্তানে আমাদের বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা করেছিল, আমি তাদের থেকে দূরেই থাকি। আমার জীবনে গোপনচরবৃত্তি বা অন্ধকার জগতের কর্মকাণ্ডের চেয়ে আমি খুব কম জিনিসকেই ঘৃণা করি। আমার দৃষ্টিতে গুপ্তচরবৃত্তি একটি নোংরা পেশা, এবং এর জন্য এক বিশেষ ধরনের মানসিকতা দরকার।

আমি স্মরণ করি, যখন আমি কাবুলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিসেবে কাজ করতাম, তখন আইএসআই নিয়মিত আমার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইত। তারা আমাকে নানা কিছু প্রস্তাব করেছিল, কিন্তু আমি কোনো কিছুকেই গুরুত্ব দিইনি। আমার পুরো মেয়াদকালে আমি শুধু একবার তাদের সুযোগ দিই, একটি উপজাতীয় বিরোধ নিয়ে। তারা দক্ষিণ-পূর্ব পাকতিয়া প্রদেশে সীমান্তে সংঘর্ষ নিয়ে জরুরি বার্তা নিয়ে আসে। কিন্তু বাস্তবে তাদের উদ্দেশ্য ছিল আফগান ভূমি দখল করে সীমান্ত সরিয়ে নেওয়া। শেষ পর্যন্ত সীমান্ত আগের জায়গাতেই ছিল এবং অভ্যন্তরীণভাবে একটি চুক্তি হয়।

রাষ্ট্রদূত থাকাকালীন সময়ে আমি কখনোই আইএসআই-এর সঙ্গে সম্মতি বা অসম্মতি প্রকাশ করিনি। সবসময় এমন ভাষা ব্যবহার করেছি যাতে আমি কারও কাছে বাধ্য না হই। উভয় দেশের জন্যই সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বৈরী পরিবেশ আমাদের উভয়ের ক্ষতি করত এবং এই সম্পর্ক আফগানিস্তানের জন্য বিশেষভাবে উপকারী ছিল, কারণ যুদ্ধ ও গৃহবিভেদের ফলে দেশটি নিঃশেষ হয়ে পড়েছিল।

এই লাভ-ক্ষতির হিসাবটাই হওয়া উচিত দুই দেশের সম্পর্কের মূল বিবেচ্য বিষয়। আমাদের অভিন্ন মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক অবস্থান, পার্থক্যের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

অতীতের বিরোধ বা কিছু ব্যক্তির কারণে কোনো দেশকে বন্ধু বা শত্রু হিসেবে দেখা উচিত নয়। দেশের স্বার্থই হওয়া উচিত রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের দিকনির্দেশক, বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে। এই সম্পর্ক নির্ধারিত হওয়া উচিত সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, স্বাধীনতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে।

সংক্ষেপে বললে, কোনো দেশকে শত্রু বা বন্ধু হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত নয়, বরং নীতি নির্ধারণে নৈতিকতা ও আইনভিত্তিক একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উচিত। রাষ্ট্রদূত থাকা অবস্থায় এবং ব্যক্তিগত জীবনেও আমি সবসময় ইসলামের নীতিমালা ও অন্যান্য দেশের প্রতি শ্রদ্ধা অনুসরণ করে চলেছি। এটিই ছিল আমার পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি।

DIPLOMATIC PRINCIPLES

আফগান দূতাবাস ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সম্পর্ক সাধারণ কূটনৈতিক আচরণের সীমার বাইরে গিয়েছিল, যেমনটি আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের প্রতিবেশী দেশের সম্পর্কেও প্রযোজ্য। আফগানিস্তান ও পাকিস্তান শুধু একটি সাধারণ সীমান্তই ভাগ করে নেয় না, বরং প্রায় একই সংস্কৃতি, ধর্ম, জাতিগত পরিচয় এবং ভাষাও ভাগ করে নেয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসন আমাদের আরও ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিল, যখন প্রায় ত্রিশ লাখ আফগান সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে আশ্রয় নিতে এসেছিল। এত বিপুল সংখ্যক শরণার্থী আফগান দূতাবাস ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য একাধিক সমস্যা তৈরি করেছিল। নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আবাসনের ব্যবস্থা করা এবং অপরাধীদের আটক করা ছিল এক বিশাল দায়িত্ব। এরপর ছিল ব্যবসায়ীদের বিষয়, যারা পাকিস্তান ও ইরান হয়ে বাণিজ্যিক পণ্য আমদানি করত। শস্য, ফলমূল ও অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসা আরও সমস্যার সৃষ্টি করত, বিশেষ করে সীমান্ত অঞ্চলে নিরাপত্তা সংক্রান্ত।

আমি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতাম; কারণ এটি ছিল দূতাবাসের আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ কেন্দ্র। কোনো সমস্যা দেখা দিলে প্রথমে আমরা তাদের কাছে যেতাম, এবং তারপর তারা আমাদের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিত।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আফগান ডেস্ক ছিল, যার মাধ্যমে সকল লিখিত যোগাযোগ পরিচালিত হতো, তবে আমি সাধারণত আজিজ খান-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতাম, যিনি ছিলেন এশিয়ান ডেস্কের পরিচালক। তিনি একজন পশতু ছিলেন এবং পূর্বে আফগানিস্তানে কর্মরত ছিলেন, ফলে তিনি আমাদের সমস্যাগুলো সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন।

কখনো কখনো আমি উপমন্ত্রী কিংবা মন্ত্রী নিজেও সাক্ষাৎ করতাম কোনো নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে। আজিজ খান প্রায়ই আমাকে পরামর্শ দিতেন যে কিছু বিষয়ে সরাসরি আইএসআই-এর সঙ্গে যোগাযোগ করাই ভালো হবে। তবে অনেক সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আজিজ খানের আচরণের পেছনের যুক্তি আমার কাছে অস্পষ্ট মনে হতো। একবার তিনি আমাকে ফোন করে বললেন তার অফিসে আসতে। আমি গেলে তিনি জানালেন, একজন ব্যক্তি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান — তিনি ছিলেন আব্দুল সমাদ হামিদ।

দুই দিন আগে আমি শুনেছিলাম যে আব্দুল সমাদ হামিদ পাকিস্তানে এসেছেন; তিনি ইসলামাবাদের ম্যারিয়ট হোটেলে অবস্থান করছিলেন। আমি ইতিমধ্যেই তার কক্ষ নম্বর জানতে পেরেছিলাম এবং তাকে আমার বাসায় রাতের খাবারে আমন্ত্রণ জানাতে চেয়েছিলাম। তিনি ছিলেন আফগানিস্তানের একজন পরিচিত ও সম্মানিত ব্যক্তি, তাই তার সঙ্গে দেখা করতে আমি আগ্রহী ছিলাম। কিন্তু আজিজ খানের মাধ্যমে এই অনুরোধ আসার পর আমি সিদ্ধান্ত বদলালাম।

আমি ভান করলাম যেন তাকে চিনিনা এবং আজিজ খানকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি পাকিস্তানের কোনো মন্ত্রী বা কমিশনার? তিনি বিস্ময়ে বললেন, "আপনি তাকে চেনেন না?" তিনি অবাক হয়ে বললেন, "তিনি আফগানিস্তানের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব। তিনি তো দেশের উপ-প্রধানমন্ত্রী ছিলেন!" এরপর তিনি আমাকে আমার দেশের বিষয়ে কম জানার জন্য সমালোচনা করলেন।

আমি ধৈর্য ধরে বললাম, "মি. আজিজ খান! অবশ্যই আমি তাকে চিনি। তিনি তো আমাকে চিনে থাকতে পারেন!" আমি আরও যোগ করলাম, "আমার জ্ঞান আফগানিস্তান সম্পর্কে কম নয়। কিন্তু তিনি সরাসরি আমাকে কেন যোগাযোগ করছেন না? তিনি জানেন দূতাবাস কোথায়। তিনি কেন আপনার মাধ্যমে যোগাযোগ করছেন? আমি জানি তিনি খ্যাতিমান ও সম্মানিত ব্যক্তি, কিন্তু তিনিও তো আফগানিস্তানেরই মানুষ!"

আজিজ খানের সঙ্গে সেই কথোপকথনের পর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আব্দুল সমাদ হামিদের সঙ্গে দেখা করব না। যদি কোনো সাধারণ মানুষ না জেনে এমন কিছু করত, তাহলে তা বুঝতে পারতাম। কিন্তু আমি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আমন্ত্রণ পাওয়ার প্রয়োজন বোধ করিনি। এভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত নয়।

আমি বহুবার পররাষ্ট্র মন্ত্রী আব্দুল সাত্তার-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। তিনি একজন সৎ ও ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি প্রায়ই আফগানিস্তান নিয়ে তার উদ্বেগ আমার সঙ্গে ভাগ করে নিতেন। তিনি বলতেন, অনেক দেশ আফগানিস্তান সম্পর্কে সন্দিহান, এবং আমাদের উচিত তাদের উদ্দেশ্যগুলো সম্পর্কে আরও মনোযোগী হওয়া। "আপনাদের কূটনৈতিক কর্মকাণ্ড আরও সক্রিয় করতে হবে," তিনি বলতেন। "এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলুন, বিশেষ করে আমেরিকাকে নিয়ে। আরও কূটনীতিকদের সঙ্গে দেখা করুন এবং তাদের মন পরিষ্কার করতে সাহায্য করুন।"

কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হতো, তিনিও আফগানিস্তানের সঙ্গে কীভাবে আচরণ করতে হবে, তা বুঝতেন না। একবার রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন এবং আমার সঙ্গে এক বৈঠকের ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন। যদিও তিনি সরাসরি কিছু বলেননি, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রুশ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠক করা আমার পক্ষে উপকারী হবে না। আমি আজিজ খানকে বলেছিলাম যে আমি নিরপেক্ষ স্থানে, অনুবাদকসহ, রুশ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা করতে প্রস্তুত। কিন্তু আজিজ খান জোর দিয়ে বললেন বৈঠক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েই হওয়া উচিত এবং তিনি নিজেও তাতে উপস্থিত থাকবেন। আমি জানালাম, আমি আগ্রহী নই — ফলে বৈঠক আর হয়নি।

আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও আমেরিকার মধ্যে ত্রিপাক্ষিক আলোচনাও পাকিস্তান দ্বারা ব্যাহত হয়। আমাকে এই বৈঠকের ব্যাপারে জানানোই হয়নি, এবং আমি এতে সম্মতি দিইনি। পাকিস্তান আমেরিকান কূটনীতিকদের বলেছিল যে আমার অনুপস্থিতি তালেবানদের আলোচনা করতে অনিচ্ছার স্পষ্ট ইঙ্গিত। অথচ, বাস্তবে আমি বৈঠকের বিষয়ে কয়েকদিন পর এক তথ্যদাতার কাছ থেকে জানতে পারি।

আমি প্রায়ই মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে বলতাম যে তিনি যেন সরাসরি আমার সঙ্গে এবং আফগান দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন — পাকিস্তান সরকার বা তার প্রশাসনের মাধ্যমে আফগানিস্তানের সঙ্গে কোনো সমস্যা

সমাধানের চেষ্টা না করেন। আমি তাকে বলতাম, “পাকিস্তান কখনোই একজন সৎ মধ্যস্থতাকারী নয়, বরং যেকোনো আলোচনায় তারা নিয়ন্ত্রণ করবে এবং চালনা করবে।” আমি এই একই পরামর্শ অন্য সব কূটনীতিক, দূতাবাস এবং জাতিসংঘকেও দিয়েছিলাম।

তৃতীয় কোনো পক্ষের কাছ থেকে পাকিস্তান প্রশাসনের মাধ্যমে কোনো সুপারিশ বা চিঠি পেলে আমি কখনো সরাসরি উত্তর দিতাম না, বরং বলতাম, যারা অনুরোধ পাঠিয়েছে তারা যেন সরাসরি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে যদি তারা আনুষ্ঠানিক উত্তর চায়।

কয়েকবার অন্যান্য সরকার বিশেষ কোনো ইস্যুতে পাকিস্তান প্রশাসনের মাধ্যমে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল, কিন্তু পাকিস্তানের সম্পৃক্ততা নিয়ে আমার সন্দেহ থাকায় বিষয়গুলো অগ্রসর হতে পারেনি বা সমাধান হয়নি। একবার একজন ফরাসি সাংবাদিককে আফগানিস্তানে গ্রেপ্তার করা হয়, এবং ফ্রান্স সরকার তার মুক্তি দাবি করেছিল। কিন্তু তারা আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ না করে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের পাঠায়। আমি তাদের পরামর্শ দিলাম যে ফরাসি সরকার যেন সরাসরি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। এরপর আরও তিন দিন লেগে যায় ফরাসি রাষ্ট্রদূত আমাকে ফোন করতে, এবং তারপর আমি সাংবাদিককে আফগান-পাকিস্তান সীমান্তে হস্তান্তর করি।

পাকিস্তানি কর্মকর্তারা সাধারণ কূটনৈতিক নীতিমালা সম্পর্কে সচেতন ছিল, কিন্তু তারা মনে করত আমরা দূতাবাসে খুবই সরল জীবন যাপন করি, তাই বোধহয় আমরা বোকাও। তদুপরি, আমেরিকা পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশকে চাপ দিচ্ছিল যেন তারা আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন না করে এবং ইসলামিক আমিরাতকে কূটনৈতিকভাবে একঘরে করে রাখে।

যখন আমি একান্তে পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের সঙ্গে থাকতাম, তখনও তারা ভয় পেত যে পাশের ঘরে কোনো আমেরিকান লুকিয়ে আছে কিনা। তারা খুব সতর্কভাবে কথা বলত এবং আমেরিকানদের সম্পর্কে সর্বোচ্চ সম্মান দেখিয়ে কথা বলত, এমনকি কেবল কথা বলার সময়ও। তারা অভিশপ্ত প্রেসিডেন্ট বুশকে “হিজ এক্সেলেন্সি, মি. বুশ” বলত, অথবা বলত “কলিন পাওয়েল সাহেব” । আমার ভালোকরে মনে আছে এটা আমার মেজাজ কতটা খারাপ করতো।

*****

যদিও আমাদের বেশিরভাগ কাজ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে চলতো, আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথেও কম কাজ করতাম না। পাকিস্তানে বিপুল সংখ্যক আফগান থাকার কারণে বহু নিরাপত্তা-সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিত — যেমন শরণার্থী বন্দিদের নিয়ে জটিলতা, স্থানীয় পুলিশের দুর্ব্যবহার এবং সীমান্তবর্তী বাণিজ্য সংক্রান্ত অভিযোগ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন মঈনউদ্দিন হায়দার, একজন সেনা জেনারেল এবং শিয়া। তাঁর মন্ত্রণালয়ই ছিল দেশের সমস্ত পুলিশ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ের দায়িত্বে। বহু আফগান শরণার্থী আমাদের দূতাবাসে এসে পুলিশের হয়রানি ও লুটপাটের অভিযোগ করতেন। অনেক সময় দর্শনার্থীদের দূতাবাসের বাইরেও হয়রানির

শিকার হতে হতো। পুলিশরা দূতাবাসের রাস্তাগুলোতে ওঁত পেতে থাকত, যেন এক ঝাঁক নেকড়ের মতো আফগানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য।

আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অভিযোগ করলেও পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয়নি। প্রতিবারই তারা একই উত্তর দিত — একটি সরকারী বিবৃতি যেখানে বলা হত, পাকিস্তানি পুলিশ কখনো আফগান শরণার্থীদের হয়রানি করে না, বরং তাদের নিরাপত্তা দেয়। অর্থাৎ, আমার অভিযোগগুলো তারা ভিত্তিহীন বলে মনে করত।

একদিন আমি আফগান শরণার্থী শিবিরের কিছু প্রবীণ এবং উলামাদের দূতাবাসে ডেকে পাঠাই কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্য। দূতাবাসে আসার পথে পুলিশ তাদের থামিয়ে টাকা আদায় করে, যদিও তারা তাদের শরণার্থী পরিচয়পত্র বহন করছিলেন। অবশেষে যখন তারা দূতাবাসে পৌঁছান, তারা রাগান্বিত হয়ে আমাকে পুরো ঘটনা বলেন। এই প্রবীণদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ছিল, তাই তাদের অপমান আমাকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। আমি তাদের একজনকে নিয়ে গাড়িতে উঠে সরাসরি সেই জায়গায় যাই, যেখানে পুলিশ তাদের আটকে রেখেছিল। সেই পুলিশ অফিসার তখনো সেখানে ছিল, যেন নতুন শিকার খুঁজছে। আমি গাড়ি থামিয়ে তাকে উঠতে বললাম। সে পালাতে চেষ্টা করে, কিন্তু আমি তাকে ধরে গাড়িতে তুলে ফেলি। তারপর আমি উলামাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া টাকা ফিরিয়ে নিই এবং সোজা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিয়ে যাই।

সারা রাস্তা জুড়ে সে পুলিশ অফিসার আমাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুনয়-বিনয় করছিল এবং প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিল যে সে আর কখনো এমন কাজ করবে না। কিন্তু আমি তাকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তর করি। আমি মন্ত্রণালয়কে প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম যে আমার অভিযোগগুলো ভিত্তিহীন নয়, এবং তারা যেন উপলব্ধি করে আফগান শরণার্থীরা প্রতিদিন কী ধরণের হয়রানির সম্মুখীন হচ্ছে। কিন্তু পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উল্টো আমাকে সমালোচনা করে এবং বলেন আমি কূটনৈতিক আচরণ লঙ্ঘন করেছি।

ইসলামাবাদে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালনের সময় আমি আরও কিছু কাজে নিযুক্ত ছিলাম, যেমন বিদেশে চিকিৎসার জন্য যাচ্ছেন এমন আফগান নাগরিকদের ভিসার জন্য পরিচয়পত্র এবং সুপারিশপত্র প্রদান। মোল্লা সেরাজউদ্দিন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কমান্ডার, জার্মানিতে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ১০,০০০ ডলার নিয়ে এক অতিথিশালায় ছিলেন। তিনি সেই টাকা অতিথিশালার আর্থিক কর্মকর্তাদের কাছে জমা রেখে নামাজ পড়তে মসজিদে যান। কিন্তু পুলিশ, যারা আগেই তাকে লক্ষ্য করেছিল এবং টাকা থাকার কথা জেনে গিয়েছিল, তাকে মসজিদের বাইরে থেকে জোর করে তুলে নিয়ে যায়। অতিথিশালায় অবস্থানকারী অন্যান্য তালেবান আমাকে ফোন করে জানান যে পুলিশের পোশাক পরা কিছু লোক তাকে অপহরণ করেছে।

আমি ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি — ভয় হচ্ছিল, হয়ত তাকে কেউ নির্যাতন করবে বা হত্যা করবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করি। কিন্তু তার আগেই সে ফিরে আসে। পুলিশ তাকে নানা রকম হয়রানি করে শহরের বাইরে ফেলে রেখে চলে যায়। এ ঘটনা একধরনের সন্ত্রাসবাদের মতো ছিল এবং আমরা এ নিয়ে তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলাম। এই ঘটনা সংবাদপত্রেও উঠে আসে, এবং সেখানে মোল্লা সেরাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি এক বালকের সাথে অশ্লীল আচরণের অভিযোগ করা হয়।

প্রতিদিন অভিযোগগুলো আরও উদ্ভট রূপ ধারণ করে। শেষমেশ মনে হলো এই ইস্যু আর না টানাটানি করাই ভালো।

পরিস্থিতি পরিষ্কার করার বদলে, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশি রিপোর্টের পক্ষেই অবস্থান নেয় এবং পুলিশদের পক্ষ নিয়ে ঘটনাটিকে ধামাচাপা দেয়। কারণ সরকার থেকে শাস্তির ভয় না থাকায়, পুলিশরা আগের মতোই আফগানদের লক্ষ্য করে চললো।

এক যুবক, যিনি স্ত্রীকে নিয়ে জার্মানিতে যাচ্ছিলেন, পুলিশের হাতে নিহত হন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী ট্যাক্সিতে করে এয়ারপোর্ট যাচ্ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর গায়ে দামি গয়না ছিল। পুলিশ গাড়িটিকে থামিয়ে স্বামীকে আলাদা করে নিজেদের গাড়িতে তোলে। কিছুক্ষণ পর যখন যুবক বুঝে যায় কী হচ্ছে, সে চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে। তার মাথা সড়কে আঘাত পেয়ে মারাত্মকভাবে জখম হয়। পুলিশ তখন তার স্ত্রীর গয়না ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়।

পাকিস্তানে সাধারণ ধারণা ছিল যে ট্যাক্সিচালকদের সঙ্গে পুলিশের যোগসাজশ থাকে। কোনো যাত্রী অর্থসহ দেখা গেলে, চালক সেই যাত্রীকে বিশেষ একটি চেকপয়েন্টের ভেতর দিয়ে নিয়ে যায় এবং পুলিশের উদ্দেশ্যে ইশারা করে, যাতে পুলিশ তাকে লুট করতে পারে।

যখন মহিলাটি দেখেন তার স্বামী রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন, তিনি চিৎকার করে কাঁদতে থাকেন। পরে কেউ একজন তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়, কিন্তু সেখানে যুবকটি মারা যায়। ওই মহিলা দূতাবাসে যোগাযোগ করেন, এবং আমরা এ নিয়ে সরকারকে লিখিত অভিযোগ দেই। যদিও অভিযুক্ত পুলিশদের সাময়িকভাবে আটক করা হয়, পরে কোনো শাস্তি ছাড়াই তারা ছেড়ে দেওয়া হয়। এমনকি নিহতের পরিবারকে 'ফিদিয়া' পর্যন্ত দিতে হয়নি।

এমন বহু ঘটনা ঘটেছে পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে। ইসলামাবাদ ও রাওয়ালপিন্ডির মধ্যবর্তী শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে পুলিশ প্রায়ই নামাজের সময় মসজিদের বাইরে অপেক্ষা করে থাকত, এবং যে কাউকে টাকার সম্ভাবনা থাকলে ধরে নিয়ে ঘুষ নিয়ে ছেড়ে দিত। তবে শুধুই শরণার্থীদের নিরাপত্তা নয়, ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দিয়েছিল।

আফগানিস্তান একটি স্থলবেষ্টিত দেশ হওয়ায় আমাদের সমস্ত আমদানি ইরান ও পাকিস্তান হয়ে প্রবেশ করে। আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুসারে ট্রানজিট দেশগুলো এইসব পণ্যের ওপর কোনো কর আরোপ করতে পারে না। কিন্তু পাকিস্তান এই আইন লঙ্ঘন করে বহু পণ্যের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। করাচি বন্দরে আফগান ব্যবসায়ীদের বহু পণ্য আটকে পড়ে, যার অনেকগুলো পচে যায় বা মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে যায় — এতে কোটি কোটি টাকার ক্ষতি হয়।

আমরা কিছু খাদ্যপণ্য যেমন ঘি প্রভৃতি নিষিদ্ধ তালিকা থেকে বাদ দিতে সক্ষম হই। কিন্তু পুলিশ নিষেধাজ্ঞাকে শুধু ঘুষ খাওয়ার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করত। পাকিস্তান অভিযোগ করত যে, এইসব পণ্য আফগানিস্তানে ব্যবহৃত না হয়ে পুনরায় পাকিস্তানে পাচার হচ্ছে এবং এতে দেশের অভ্যন্তরীণ শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

এমন বহু সমস্যার সমাধান আমি করতে পেরেছি, কিন্তু অনেকগুলো রয়ে গেছে। আফগানদের উপর পুলিশের ব্যক্তিগত হামলা দিন দিন বাড়ছিল, শুধু ইসলামাবাদ নয়, সারা পাকিস্তানেই — এমনকি বেলুচিস্তান পর্যন্ত।

যদিও দূতাবাসের কোনো আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা ছিল না, শরণার্থীরা সবসময় আমাদের কাছেই সাহায্য চাইত। একবার আমি পেশোয়ারের গভর্নরের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম, যেন তার প্রদেশের শরণার্থীদের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করা যায়। তিনি আমাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানান, কিন্তু আমি যখন সমস্যা তুলতে শুরু করি, তিনি বললেন, "আফগানিস্তানে এখন সরকার ও নিরাপত্তা রয়েছে। তোমাদের লোকজন নিজেদের দেশে ফিরে যেতে পারে। আমরা আর তাদের দায়িত্ব নিতে পারবো না।"

তিনি কঠোর সামরিক ভঙ্গিতে কথা বলছিলেন। তবে তার বক্তব্য অনেক সময় কেন্দ্র সরকারের অফিসিয়াল নীতির সঙ্গে মিল খেত না।

এই ধরনের ঘটনার পর আমি আবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গিয়ে তাদের সাথে দেখা করি। এক ঘন্টার মত আলোচনা শেষে, মন্ত্রী আমাকে যেটা বললেন তা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই। তিনি বলেন, "পুলিশ শুধু শরণার্থীদের না, দেশের সবাইকেই হয়রানি করে। যে কারো টাকা থাকলে আর আত্মরক্ষা করতে না পারলে, তাকেই তারা টার্গেট করে।"

আমি বললাম, "আপনি তো পুলিশের প্রধান, আর আপনি নিজেই বলছেন আপনি কিছুই করতে পারবেন না। তাহলে আমি কার কাছে অভিযোগ করবো?"

সেই সাক্ষাতে তিনি আমাকে পাকিস্তান চাওয়া কিছু 'ওয়ান্টেড' লোকের একটি তালিকা দেন, যাদের তিনি বললেন আফগানিস্তানে আছে। তালিকার শুরুতেই ছিল সাইফুল্লাহ আখতার এবং মৌলভী মুহাম্মদ কাসেম। আমি তালিকাটি দেখে বলি, "জেনারেল সাহেব, আমি দুঃখিত। কিন্তু এই তালিকাটি আপনি তাদেরকেই দিন যাদের নাম এতে আছে।" তিনি বললেন, "আপনি তো আফগানিস্তানের প্রতিনিধি, আর তারা তো আফগানিস্তানে আছে। আমি আর কার কাছে যাবো?"

আমি হেসে বললাম, "জেনারেল সাহেব, আপনি যাদের কথা বলছেন, তারা তো এখানে, আপনার চোখের সামনে চলাফেরা করছে। গতকালই সাইফুল্লাহ আখতার আমার অফিসে এসেছিল। আর মৌলভী কাসেম I-7 এলাকার এক মাদ্রাসায় দস্তারবন্দি অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। তার সঙ্গে পাঁচজন সশস্ত্র দেহরক্ষী ছিল। সে বক্তৃতাও দিয়েছে"।

জেনারেল হকচকিয়ে গেলেন। তার কপাল বেয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ল। তিনি বললেন, “এটা কি সত্যি?” আমি বললাম, “বিশ্বাস করুন, এটাই সত্যি।” এরপর তিনি আর কখনো ওই তালিকা বা এ ধরনের কিছু নিয়ে আমাকে কিছু বলেননি।

মঈনউদ্দিন হায়দার বুঝতেই পারেননি পাকিস্তান একটি দ্বিমুখী রাষ্ট্র। তিনি শিয়া সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রশাসনের ভেতরের কিছু গোষ্ঠী এসব বিষয় ধামাচাপা দিতে চেষ্টা করে এবং তাঁকে বলে যে অপরাধীরা অনেকেই আফগানিস্তানে আছে। যদিও তাঁর অধীনে জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার নাগরিক শাখা এবং পুরো পুলিশ বিভাগ ছিল, তবুও পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল সীমিত।

একবার আমরা একসাথে ব্যক্তিগত বিমানে কান্দাহার যাচ্ছিলাম। সারা রাস্তা আমরা ধর্ম ও রাজনীতি নিয়ে তর্ক করি। তিনি বলেন, মোল্লারা নিজেদের মতে ধর্মের ব্যাখ্যা দেন, যা কোরআন বা শরিয়াতে নেই। তিনি বলেন, উদাহরণস্বরূপ, অজু করার ব্যাপারটি কোরআনে নেই, কিন্তু মোল্লারা মানুষকে তা করতে বলেন।

আমি বললাম, “আপনি কি কখনো কোরআন পড়েছেন?” তিনি বলেন, “অবশ্যই! আমি একজন মুসলমান এবং শিক্ষিত মানুষ।” আমি বললাম, “আপনার শিক্ষার কথা বলছি না, কিন্তু আপনি যা বললেন, তা থেকেই বোঝা যায় আপনি কোরআন ঠিকমতো জানেন না।” আমি পাইলটকে জিজ্ঞেস করি, তাঁর কাছে কোরআন আছে কিনা। তিনি একটি কপি দেন, আমি সেই আয়াতটি দেখাই যেখানে আল্লাহ অজু করতে বলেছেন।

আমি তাঁকে বললাম, আসল সমস্যা অজু নয়, বরং শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যকার মতভেদ — সুন্নিরা পা ধোয়ার পক্ষপাতী, কিন্তু শিয়ারা শুধু পা মোছার কথা বলেন। আমি বললাম, আপনি প্রথমে ব্যাপারগুলো বুঝুন, তারপর মন্তব্য করুন।

মঈনউদ্দিন হায়দার সোজাসাপ্টা মানুষ ছিলেন। অনেক সময় আমার কথায় সহমত হতেন। যেমন, আফগান বন্দিদের বিষয়ে আমরা একমত হই যে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের যৌথ একটি কমিশন গঠন করা হবে, যারা বন্দিদের পরিদর্শন করে নির্দোষদের মুক্তি দেবে, আর অপরাধীদের জন্য আলাদা সিদ্ধান্ত হবে।

কিন্তু ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর এই পরিকল্পনাও ভেস্তে যায়।

*****

পাকিস্তানি সরকারের সাথে কেবল সম্পর্ক রাখাই ছিল না আমার রাষ্ট্রদূতের কাজ। ইসলামি আমিরাতের স্বার্থ রক্ষার জন্য আমি মন্ত্রণালয়গুলোর বাইরেও সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েছিলাম এবং রাজনৈতিক দল, খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব এবং অন্যান্য কূটনীতিকদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছিলাম। শুধুমাত্র সরকারের সাথে যোগাযোগ রাখলেই চলত না, পাকিস্তানে আফগানিস্তান এবং আফগান শরণার্থীদের নিয়ে চলমান রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং আলোচনার নেতৃত্ব দেওয়াও ছিল জরুরি।

আন্তর্জাতিক পরিসরে আফগানিস্তানের সাথে অন্যান্য দেশের সম্পর্ক মজবুত করতে আমি নিয়মিত দূতাবাস, কূটনীতিকদের সাথে বৈঠক করতাম, দাতব্য সংস্থা এবং জাতিসংঘের কার্যালয় পরিদর্শন করতাম, এবং সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে সংবাদ সম্মেলন করতাম। পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সাথে, খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব, সম্মানিত উলামাগণ, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য শ্রেণির লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমি দুই দেশের মাঝে সহযোগিতা এবং সংযোগ বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট ছিলাম, যাতে তারা সেইসব বিষয়ে সচেতন হন যা আফগানদের মতো তাদেরও উদ্বেগের বিষয়।

রাষ্ট্রদূত হিসেবে আমি পাশতুনখাওয়া, জামিয়াতে উলামা-ই ইসলাম, বেরেলভি ও পাঞ্জপিরিয়ান, সিপাহ-এ-সহাবা, শিয়া সম্প্রদায়সহ অন্যান্য ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের সাথেও সাক্ষাৎ করতাম। তবে আমি কখনোই তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি বা পারস্পরিক দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়িনি। যদি আলোচনার বিষয় হয়ে উঠত তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, আমি ধৈর্য ধরার উপদেশ দিতাম, তবে স্পষ্ট করেই বলতাম যে ইসলামি আমিরাত কিংবা আমি এসব বিষয়ে জড়িত নই।

দূতাবাসের পক্ষে পাকিস্তানের সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অবশ্যই একেক দলের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ধরণ ভিন্ন ছিল; ইসলামি আমিরাতের সাথে উলামা-ই ইসলাম, পিপলস পার্টি ও মুসলিম লীগের সম্পর্ক ছিল আরও ঘনিষ্ঠ, কারণ আমাদের মধ্যে মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, ভাষা ও আঞ্চলিক স্বার্থের মতো অনেক মিল ছিল। এই কারণে বেলুচ ও পাখতুনদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল বেশি হৃদ্যতাপূর্ণ, কারণ তাদের সংস্কৃতি ও ইতিহাস আমাদের সঙ্গে মিল ছিল; কিন্তু পাঞ্জাবি ও সিন্ধি জনগণের সঙ্গে ততটা ঘনিষ্ঠতা ছিল না।

তবুও আমরা সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছি। আমাদের অনেক উলামা ও তালেবান সদস্য পাকিস্তানেই পড়াশোনা করেছিল এবং এখনো পাকিস্তানের উলামাদের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় ছিল। একমাত্র দল যারা আমাদের সঙ্গে কখনোই একমত হয়নি এবং সবসময় আমাদের বিরোধিতা করেছে, তা হলো মাহমুদ খানের পাশতুনখাওয়া পার্টি, যারা দীর্ঘদিন ধরে উলামাদের বিরুদ্ধে লড়ে গেছে। যদিও ওয়ালি খানের আওয়ামী ন্যাশনাল পার্টি পাশতুনখাওয়া পার্টির মতোই ছিল, আমরা মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেছি।

একবার আওয়ামী ন্যাশনাল পার্টির কয়েকজন সদস্য আমাকে তাদের এক অধিবেশনে আমন্ত্রণ জানান, তালেবান নিয়ে প্রশ্নোত্তরের জন্য। সেখানকার আলোচনা ছিল ব্যাপক। আমার কাছেও অনেক প্রশ্ন ছিল, কারণ তাদের সব প্রশ্নই ছিল পশতু ও পশতুনদের নিয়ে। মনে হচ্ছিল এই আলোচনা শেষই হবে না। আমি চেষ্টা করেছিলাম তাদের বোঝাতে যে, যদিও পশতুনরা আমাদের চিন্তায় আছে, আফগানিস্তান কেবল পশতুনদের দেশ নয়–এখানে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীরাও আছে, যারা তালেবানদের মতোই দেশের অংশ।

তালেবানদের রাষ্ট্রদূত হিসেবে, আমি এবং আমার সহকর্মীরা মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের প্রচার করেছি। আমাদের কাছে এর মানে ছিল সব মুসলিম–আপনি কোন গোত্র বা দেশের, কিংবা কোন মাজহাবের অনুসারী তা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। যারা এইভাবে সংকীর্ণভাবে চিন্তা করে তারা কখনো মহান হতে পারে না। অনেক তালেবান একই

জাতিগোষ্ঠীভুক্ত ছিল, আর এই কারণেই অনেকে ভুলভাবে ধরে নেয় যে তালেবান আন্দোলনে জাতিগোষ্ঠীর ভূমিকা ছিল। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল নিছক কাকতালীয়; আন্দোলনের উৎপত্তি হয়েছে যে গোত্রের ভেতর, তারা সহায়তা করেছিল বটে, তবে আন্দোলনের বিকাশে তাদের আলাদা কোনো ভূমিকা ছিল না।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার পর ইসলামাবাদে একটি যৌথ আফগান-পাকিস্তানি প্রতিরক্ষা পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানের সব রাজনৈতিক দল এতে অংশগ্রহণ করেছিল, যার মধ্যে ছিল পিপলস পার্টি এবং মুসলিম লীগ। যদিও আমাদের সরাসরি সাক্ষাৎ হয়নি, তবুও রাজনৈতিক দলের ঊর্ধ্বতন নেতাদের মধ্যে বৈঠক হয়েছিল, যাদের মধ্যে ছিলেন চৌধুরী শুজাত হুসেইন, ইজাজুল হক ও অন্যান্য পরিচিত ব্যক্তিত্ব।

সব মিলিয়ে, আমরা সব ইসলামি ও ধর্মীয় দলের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখতাম, বিশেষ করে যারা জিহাদের নামে প্রতিষ্ঠিত অথবা জিহাদকে সমর্থন করত। আমরা ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছি মৌলভী ফজলুর রহমানের জামিয়াতে উলামা-ই ইসলাম, মৌলভী সামিউল হকের জামিয়াতে উলামা-ই ইসলাম, কাজী হুসেইন আহমদের জামায়াতে ইসলামী, শাহ আহমদ নুরানী সাহেব এবং ড. আসরার আহমদের দলের সাথে। এই ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ফলে তালেবানরা সারাদেশজুড়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আমি বিশ্বাস করি, সে সময় পাকিস্তানের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ ইসলামি আমিরাতকে সমর্থন করত। পাকিস্তানের স্বৈরাচারী সরকার–যার প্রধান নির্বাহী ছিল পারভেজ মুশাররফ–আমাদের এই সহযোগিতা ও পাকিস্তানের ভেতরে আমাদের প্রভাব নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিল। পাকিস্তানি কর্মকর্তারা আফগানিস্তানের প্রতি এই জনসমর্থনে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল।

কখনো কখনো তারা প্রকাশ্যে আপত্তিও জানাতো, কিন্তু আমাদের সব কাজ ছিল আইনের আওতায়। আমাদের কোনো কর্মকাণ্ডই কোনো ব্যক্তি বা দেশের বিরুদ্ধে ছিল না। আমি পাকিস্তানের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে অবাধে ভ্রমণ করতাম–করাচি, লাহোর, কোয়েটা ও পেশোয়ারে–মানুষের আমন্ত্রণে, যেখানে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দল, উপজাতি প্রধান এবং উলামাদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক বৈঠক করতাম। কখনো কখনো আমি পাকিস্তানের উপজাতীয় এলাকাগুলোতেও যেতাম যেখানে অধিকাংশ পশতুনরা বাস করে, বা কাশ্মীরের পার্বত্য এলাকায়ও ভ্রমণ করতাম।

আমি কখনো আমার গন্তব্য কারো কাছে বলতাম না এবং অধিকাংশ সফর গোপন রাখতাম যাতে পাকিস্তানি সরকারের সন্দেহ এড়ানো যায়। পাকিস্তানের মুসলমানরা তালেবানদের প্রতিনিধি হিসেবে আমাকে এবং অন্যদের সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী ছিল। তারা তালেবান এবং ইসলামি আমিরাত সম্পর্কে জানতে চায়, আর আমি তাদের সঙ্গে আমাদের ধারণা ও মতামত বিনিময় করতাম। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের উদ্যোগে আয়োজিত সভায় তারা আমাদের আমন্ত্রণ জানাতো। আমরা আন্তর্জাতিক সম্মেলনেও অংশ নিতাম যেমন কারতাবা ও দেওবন্দের সম্মেলন যেখানে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলমান একত্রিত হতেন। সেখানে আমরা আফগানিস্তানের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতাম এবং মুসলমানদের ঐক্য প্রচার করতাম।

আমি দস্তারবন্দি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছি যেখানে তালেবানদের সম্মানসূচক পাগড়ি প্রদান করা হতো। তবে সব সম্মেলনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল দেওবন্দে অনুষ্ঠিত সম্মেলন। এটি ছিল জামিয়াতে উলামা-ই ইসলামের নেতা মৌলভী ফজলুর রহমানের উদ্যোগে, এবং পেশোয়ারের চার-পাঁচ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত এক স্থানে

অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনের আয়োজন করে জামিয়াতে তালাবা-ই ইসলাম। প্রায় বিশ লক্ষ মুসলমান একত্রিত হয়েছিল ঐ সম্মেলনে। আমি শুধু শেষ দিনের জন্য উপস্থিত থাকতে পেরেছিলাম, কিন্তু ইসলামি আমিরাতের পক্ষ থেকে আমি একটি বক্তৃতা দিয়েছিলাম এবং আমিরুল মুমিনিনের একটি রেকর্ডকৃত বার্তা শ্রোতাদের শোনানো হয়েছিল।

আমার সঙ্গে আফগানিস্তানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, মন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীগণ ঐ সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন। মন্ত্রী পরিষদের উপ-প্রধান মৌলভী আব্দুল কাবিরও এই সম্মেলনে অংশ নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পাকিস্তান সরকার তাকে এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে অংশগ্রহণে বাধা দিয়েছিল। তারা সবসময়ই আমাকে বলতো যেন আমি দেশের দুর্গম এলাকায় ভ্রমণ না করি, কারণ তারা সেখানে আমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে না। ১১ সেপ্টেম্বর এবং আমেরিকার নিষ্ঠুর হামলার পর তারা এই সতর্কবার্তা আরও উচ্চস্বরে জানাতে লাগল।

******

আফগানিস্তান এবং পাকিস্তান সরকারের মধ্যে যেসব সমস্যা তৈরি হয়েছিল, তার অধিকাংশের জন্য পারভেজ মুশাররফ দায়ী। ১৯৯৯ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পর শুরুতে তিনি আফগানিস্তানের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি মোল্লা মোহাম্মদ রাব্বানীকে পাকিস্তান সফরে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান এবং তাকে সমর্থন ও সহযোগিতার আশ্বাস দেন। বিদায় অনুষ্ঠানে তিনি রাব্বানীকে আফগানিস্তানের সবচেয়ে আন্তরিক শাসক এবং আফগান জনগণের একজন ভালো ভাই বলে উল্লেখ করেছিলেন। তবে তার হৃদয়ের প্রকৃত অভিপ্রায় ও প্রতিশ্রুতির সত্যতা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

বাস্তবে, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে মুশাররফ তালেবানের সাথে ভালো সম্পর্ক গড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। আইএসআই তখন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। তালেবানরা তখন পাকিস্তানি জনগণের মধ্যেও ব্যাপক জনপ্রিয় ছিল। মুশাররফ যদি ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইতেন, তবে তার দরকার ছিল আইএসআই এবং জনগণের সমর্থন। অনেকে বলেন, নওয়াজ শরিফের সরকারের পতন এবং মুশাররফের অভ্যুত্থান সম্ভব হয়েছিল তালেবানের জনপ্রিয়তার কারণেই। এসব কারণেই মুশাররফ তালেবান নেতৃবৃন্দের প্রতি সদয় আচরণ করছিলেন এবং সমর্থন পেতে চেয়েছিলেন।

মুশাররফের অন্য উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। তিনি একজন ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি, যিনি অন্তর থেকে ইসলামে বিশ্বাস করেন না। তার কাছে ইসলাম ছিল একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার–তালেবানদের ব্যবহার করে তিনি নিজের ক্ষমতা বিস্তারের পথ খুঁজছিলেন। তিনি তালেবানকে কখনোই একটি ধর্মীয় আন্দোলন বলে মনে করেননি; বরং মনে করেছিলেন তারা একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী, যারা জনগণকে ধর্মের মাধ্যমে একত্রিত করার চেষ্টা করছে।

পাকিস্তান-ভারত সম্পর্কের অবনতি সম্ভবত মুশাররফকে তালেবানের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য করেছিল। একদিকে কাশ্মীরে জিহাদ চলছিল, অন্যদিকে আফগানিস্তানের সাথে সম্পর্ক খারাপ হলে দুই ফ্রন্টে সমস্যা তৈরি হতো।

তবে তালেবান যখন তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, তখন মুশাররফের মনোভাব পাল্টে যায়। প্রথমে তিনি আমিরুল মু' মিনীনকে পাকিস্তানে আমন্ত্রণ জানান, কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। এরপর মুশাররফ নিজে কান্দাহারে গিয়ে আমিরুল মু' মিনীনের সাথে দেখা করতে চাইলেও, তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে নিরাপত্তা, অর্থনীতি বা সাধারণ পারস্পরিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে, কিন্তু বিন লাদেনের বিষয়টি শুধুমাত্র আফগানিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার ব্যাপার—পাকিস্তান এতে জড়াবে না। ফলে মুশাররফ তার সফর বাতিল করেন।

পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মঈনউদ্দীন হায়দার অভিযোগ করেন যে কিছু পাকিস্তানি অপরাধী আফগানিস্তানে আশ্রয় নিয়েছে এবং তাদের হস্তান্তর দাবি করেন। কিন্তু তালেবান সরকার জানিয়ে দেয়, ওই ব্যক্তিরা আফগানিস্তানে নেই এবং বন্দী বিনিময়ের জন্য একটি পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে আলোচনা করতে হবে। তালেবানরা আরও জানায়, পাকিস্তান নিজেই অনেক আফগান অপরাধীকে আশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পরিবর্তে একতরফা দাবি জানাতে থাকে।

একটি বড় সংকট দেখা দেয় যখন বামিয়ান প্রদেশে বৌদ্ধ মূর্তি ধ্বংসের সিদ্ধান্ত নেয় তালেবান। মুশাররফ চাইছিলেন সেটি ঠেকাতে। তিনি মঈনউদ্দীন হায়দারকে প্রেরণ করেন, যিনি দুর্বলভাবে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন এবং মিসরের পিরামিডের উদাহরণ টানেন। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল।

২০০১ সালের শুরুতে আমিরুল মু' মিনীন একটি চিঠি পাঠান, যেটি সরাসরি মুশাররফের কাছে পৌঁছে দিতে বলা হয়। আমি পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানাই যে আমার কাছে একটি গোপন চিঠি আছে। তারা আমাকে প্রেসিডেন্ট ভবনে চিঠি পৌঁছে দিতে বলে। একদিন পর তারা চিঠি ফেরত দেয় এবং অনুবাদ করে দিতে বলে, কারণ চিঠিটি পশতু ভাষায় লেখা ছিল। আমি ইংরেজিতে অনুবাদ করে আবার জমা দিই।

চিঠিতে আমিরুল মু' মিনীন মুশাররফকে ইসলামী শরিয়াহ বাস্তবায়ন এবং একটি ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। তিনি ইসলামি সরকারের প্রয়োজনীয়তা ও দায়িত্ব ব্যাখ্যা করেন। মুশাররফ পরে জনসম্মুখে এই চিঠির কথা বলেন এবং উল্লেখ করেন যে এমনকি তার স্ত্রীও এটা সমর্থন করবেন। এতে তিনি বুঝতে পারেন, তালেবান শুধু রাজনৈতিক গ্রুপ নয়, তারা সত্যিকার অর্থেই একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে চায়। এটি তার কাছে অসহনীয় ছিল।

আমি রাষ্ট্রদূত থাকা অবস্থায় চারবার মুশাররফের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। প্রথমবার দায়িত্ব গ্রহণের সময়, দ্বিতীয়বার ওই চিঠি প্রদান করতে গিয়ে, তৃতীয়বার করাচিতে সামরিক প্রদর্শনীর সময়, যেখানে পাকিস্তান তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রদর্শন করেছিল। শেষবার করাচিতে দেখা হয়—তখন মুশাররফের চেহারায় ক্লান্তি, অবসাদ এবং

শত্রুভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। তার ভ্রাতৃত্বের মুখোশ পড়ে গিয়েছিল এবং তার প্রকৃত শত্রুতা প্রকাশ পেয়েছিল, যা শেষ পর্যন্ত আফগানিস্তান ও পাকিস্তান–দুই দেশকেই ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল।

তালেবান ও অন্যান্য মুসলিমদের প্রতি তার নিষ্ঠুর ও ভণ্ডামিপূর্ণ আচরণের সাক্ষ্য তিনি নিজেই রেখেছেন তার বই “Pakistan before everything!”!”-এ। তিনি আফগানিস্তানের মুসলমান ভাইদের বিক্রি করে দেন অবিশ্বাসীদের কাছে। অধিকাংশকে গুয়ানতানামোতে পাঠানো হয়। পাকিস্তানের ইতিহাসে এটি একটি কালো দাগ হয়ে থাকবে। ইতোমধ্যেই পাকিস্তানি জনগণের প্রকৃত কণ্ঠস্বর মুশাররফের শাসনামলকে বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে নিন্দা করতে শুরু করেছে। তার আত্মপ্রশংসামূলক বইটি অনেককে ক্ষুব্ধ করেছে এবং তা তার কলঙ্কিত শাসনের প্রামাণ্য দলিল হয়ে থাকবে।

GROWING TENSIONS

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের আগে পাকিস্তান ছিল এক খোলসমাত্র, যেখানে সরকারের ভিতরে আরেকটি সরকার আসল শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। মুশাররফ দেশ চালানোর চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু তিনি নিজেই অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

আজ যেমন, তখনো আইএসআই নিজেদের ইচ্ছামতো কাজ করত, প্রয়োজনে নির্বাচিত সরকারকে উপেক্ষা বা খণ্ডন করত। এটি একটি সামরিক গোয়েন্দা প্রশাসন, যার নেতৃত্বে থাকেন পাকিস্তানি সামরিক কমান্ডাররা। এটি বেসামরিক ও সামরিক দুই গোয়েন্দা সংস্থার সম্মিলিত রূপ। তারা বন্দি করে, ছেড়ে দেয় এবং কখনো কখনো হত্যা করে। তাদের অভিযান প্রায়ই নিজেদের সীমানার বাইরেও চলে যায়—আফগানিস্তান, ভারত কিংবা ইরানে। তারা প্রতিটি দেশে গুপ্তচরদের নেটওয়ার্ক পরিচালনা করে এবং স্থানীয় জনগণের মধ্য থেকে লোক নিয়োগ করে গোপন মিশন বাস্তবায়নের জন্য। এদের সদস্যরা দক্ষ এবং গুপ্তচরবৃত্তি থেকে শুরু করে বিস্ফোরক পর্যন্ত নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

বিদেশে লোকজনকে সাধারণ পেশাজীবীর ছদ্মবেশে পাঠানো হয়—একজন মোল্লার জন্য আরেকজন মোল্লা, একজন তাবলিগির জন্য আরেকজন তাবলিগি, উপজাতীয় ব্যক্তির জন্য উপজাতীয় ব্যক্তি, ব্যবসায়ীর জন্য ব্যবসায়ী, মুজাহিদের জন্য মুজাহিদ। তাদের নাগাল অনেক দূর অবধি বিস্তৃত এবং দেশে ও বিদেশে তাদের শিকড় গভীরে।

নেকড়ে ও ভেড়া একসাথে একটি ঝর্ণা থেকে পানি খেতে পারে, কিন্তু জিহাদের শুরু থেকেই আইএসআই আফগানিস্তানে এমনভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে, যেন মানবদেহে ক্যানসার শিকড় গেঁথে বসে; আফগানিস্তানের প্রতিটি শাসক এই নিয়ে অভিযোগ করেছে, কিন্তু কেউই তাদের নির্মূল করতে পারেনি।

আইএসআই সমাজের সব স্তরের লোকদের নিয়োগের চেষ্টা করে। তাদের লোকজন আছে দূতাবাসে, মন্ত্রণালয়ে এবং প্রদেশে। আমি সরকারে বিভিন্ন পদে কাজ করার সময় সবসময় চেষ্টা করেছি এই ফাঁদ থেকে দূরে থাকতে, কোনো বিরোধ এড়াতে যাতে তাদের লক্ষ্য না হই। আমি যখন দূতাবাসে কর্মরত ছিলাম, তখন অনেক উলামা ও অন্যরা আমার কাছে আসতেন নিজেকে ধার্মিক ও খোদাভীরু পরিচয়ে, কিন্তু তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল আমাকে আইএসআইয়ের সাথে কাজ করতে রাজি করানো।

আমি আমার নীতির প্রতি অনুগত ছিলাম এবং এমন লোকদের থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতাম, যারা আমাকে আইএসআইয়ের জালে টানার চেষ্টা করত। বহুবার আইএসআই জেনারেলদের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছি, কিন্তু নানা অজুহাতে দূরে থেকেছি। বলতাম, আমার আগে থেকেই কাজ রয়েছে বা অসুস্থ। যেসব সময় রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্বের কারণে দেখা করতেই হতো, তখনও সতর্ক ছিলাম।

অনেকবার আমাকে টাকার অফার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমি এক পয়সাও গ্রহণ করিনি, কারণ একবার তাদের ফাঁদে পড়লে আপনি আজীবন আটকে পড়বেন। বিশ্বের সব গোয়েন্দা সংস্থার একই অভ্যাস। দেখা গেছে যে কেউ একবার CIA, KGB, ISI, SIS-এর মত সংস্থার ফাঁদে পড়েছে, সে এখনো সেই ফাঁদেই আটকে আছে, শুধু নাম আর পদবী বদলে গেছে। তারা এখনো সেই একই আতান নাচছে–যা তাদের দুনিয়াতেও পরাজিত করেছে, আখেরাতেও।

অন্য মন্ত্রণালয় বা বিভাগ থেকেও কর্মকর্তারা আমার কাছে আসত দূতাবাস বা কান্দাহারে চলমান বিষয়াদি জানার জন্য। আইএসআই সরাসরি আমাকে বলত, তারা আমাকে ও দূতাবাসকে মুশাররফ বা পাকিস্তানি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যেকোনো সমস্যায় সহায়তা করবে। বারবার তারা বলত, আমার এবং আফগানিস্তানের মঙ্গল এই যে আমরা একসাথে কাজ করি। কিন্তু আমি সব সময় বিদেশ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অফিসিয়াল কাজ সম্পন্ন করতাম।

পাকিস্তানের প্রায় প্রতিটি কূটনৈতিক মিশনে আইএসআই কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকত। আমি তিনটি পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সফর করেছি। প্রথমবার আমি মোইনউদ্দিন হায়দারের সঙ্গে কান্দাহার যাই, তার উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানে আশ্রয় নেওয়া অপরাধীদের প্রত্যার্পণ, যার মধ্যে ওসামা বিন লাদেন ছিল প্রধান। দ্বিতীয়বার সফরের বিষয় ছিল বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তির ধ্বংস; হায়দার এই প্রক্রিয়া বিলম্ব করতে চেয়েছিলেন আলোচনার জন্য সময় পেতে। তৃতীয়বার এক দল উলামা কান্দাহারে আমিরুল মু’মিনিনের সঙ্গে দেখা করতে যায়। জেনারেল মাহমুদ আহমদ সেই দলে ছিলেন, যদিও আলোচনা করেননি। তিনি আড়ালে কী করতেন জানি না, তবে আলোচনার সময় সবসময় চুপচাপ বসে থাকতেন।

হায়দার যখন বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস বিলম্ব করতে বলছিলেন, তখন মাহমুদ আমার পাশে বসে বললেন, “এই গাধাটা কী বলছে?” আমি কিছু বলিনি, তবে মনে মনে ভাবলাম, দুই ব্যক্তির মধ্যে কত তফাৎ।

যদিও পাকিস্তান ও আইএসআই তালেবানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখত, তারা আমাদের বিরোধীদের সঙ্গেও সম্পর্ক বজায় রেখেছিল। ১১ সেপ্টেম্বরের আগে এবং পরে তারা এমন অনেক কমান্ডারকে সহায়তা করেছে যারা আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করছিল, অস্ত্র বহনের অনুমতি এবং রাজনৈতিক সংগঠন গঠনের সুযোগ দিয়েছিল। করজাই, আবদুল হক, মোল্লা মালাং এবং গুল আগা শিরজাই–এরা সবাই আমেরিকার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখত এবং CIA ও FBI-এর সঙ্গে কাজ করত। মার্কিন দূতাবাসের মাধ্যমে তারা অর্থ ও অন্যান্য সহায়তা পেত এবং পাকিস্তানে তাদের ছিল ব্যাপক স্বাধীনতা ও সুযোগ-সুবিধা। তারা ছিল গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডার, তবে আমেরিকার সহায়তা ছাড়া তাদের প্রভাব তেমন কিছুই হতো না।

একজন প্রাক্তন মুজাহিদ স্ট্রিট F-10-3-এ থাকতেন, যেখানে আমাদের দূতাবাসের অতিথিশালাও ছিল। আমরা দূতাবাস থেকে তার কার্যকলাপ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতাম, ফোনকল রেকর্ড করতাম এবং তার সহযোগীদের গতিবিধি ট্র্যাক করতাম। তার বাড়িতে নিয়মিত আইএসআই কর্মকর্তা আসতেন, এবং অন্যান্য বিরোধী নেতারাও সেখানে জড়ো হতেন। তিনি হেজব-ই-ইসলামি কমান্ডারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের

সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতেন–যার নেতৃত্বে ছিলেন আহমদ শাহ মাসউদ। এই পর্যবেক্ষণ থেকেই আমরা জানতে পারি, নর্দার্ন অ্যালায়েন্সকে অর্থ সহায়তা দিচ্ছে আইএসআই।

আইএসআই ও নর্দার্ন অ্যালায়েন্স অন্তত দুবার মিলিত হয়েছিল, একবার পেশোয়ারের আইএসআই দপ্তরে এবং আরেকবার ইসলামাবাদে তাদের গেস্ট হাউস নম্বর ৮-এ। আমি এসব তথ্য আমিরাতে জানিয়ে দিই। যখন জানতে পারি আইএসআই আমেরিকা, ইরান ও নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের সঙ্গে তালেবানকে মোকাবেলার জন্য একটি চুক্তি করছে, তখনই কান্দাহারে যাই।

আমি মোল্লা সাহেবকে বলি যে, "আমরা কেবল প্রতিবেশী নই, বরং আমাদের একক সংস্কৃতি ও পরিসর রয়েছে। জনগণের স্বার্থে আমাদের একটি সমঝোতায় আসতে হবে।" আমি বলি, পাকিস্তান আমেরিকা, ইরান ও নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের সঙ্গে মিলে আমিরাতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।

আমি পাকিস্তান সরকারের ভিতরে লোক নিয়োগ করি, যারা আমাদের গোপনে তথ্য দেবে। আমরা অগ্রগতি করি এবং অনেক মন্ত্রণালয় পর্যন্ত আমাদের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত হয়। আমি দূতাবাসে কয়েকজন কর্মী বদলি করি, যারা আইএসআইয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। উদ্দেশ্য ছিল তালেবান কমান্ডার ও সহযোগীদের নিরুৎসাহিত করা যাতে তারা সরাসরি আইএসআই বা CIA-এর সঙ্গে যোগাযোগ না করে।

আইএসআই যাত্রী ও গাড়িচালকদের জন্য পারমিট ও লাইসেন্স ইস্যু করত। সীমান্ত নিয়ন্ত্রণে আমি আইএসআইয়ের সঙ্গে একটি চুক্তি করি–প্রত্যেক আফগানকে দূতাবাসের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে, যাতে আমরা তাদের কাগজপত্রের কপি করতে পারি এবং তা কান্দাহারে পাঠাতে পারি।

এদিকে, বামিয়ানের প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি ধ্বংসের নির্দেশ দেন 'ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় দমন' বিষয়ক মন্ত্রী মৌলভী আব্দুল ওয়ালি। এই সংবাদ বাইরে ছড়িয়ে পড়লে সারা বিশ্বের কূটনীতিক ও প্রতিনিধি দলগুলো আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করে এবং আমাদের দূতাবাসে আসতে থাকে। একের পর এক বৈঠকের অনুরোধ আসে; এমনকি বিদেশি কূটনীতিকদের এক বিক্ষোভও হয় দূতাবাসের সামনে।

UNESCO আমাদের কাছে ৩৬টি চিঠি পাঠায়। এদের মধ্যে চীন, জাপান ও শ্রীলঙ্কা সবচেয়ে সক্রিয় ছিল। শ্রীলঙ্কা প্রস্তাব দেয় তারা মূর্তিগুলো সরিয়ে নিয়ে গিয়ে পুনরুদ্ধার করবে। শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ ধর্মগুরু পাকিস্তানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন, আফগানিস্তান যেতে চান, কিন্তু অনুমতি পান না।

জাপান সর্বাধিক প্রচেষ্টা চালায়। জাপানের প্রধানমন্ত্রী, সংস্কৃতি মন্ত্রী ও আরও ছয়জন মন্ত্রী পাকিস্তানে আসেন। তারা মূর্তিগুলো টুকরো টুকরো করে জাপানে নিয়ে গিয়ে পুনর্গঠনের প্রস্তাব দেন। অন্য এক প্রস্তাবে বলেন, মূর্তিগুলো সম্পূর্ণরূপে ঢেকে রাখবে, যাতে কেউ চিনতে না পারে, কিন্তু সংরক্ষিত থাকবে। এমনকি তারা অর্থও প্রস্তাব করে।

আমি তাদের বলি, “আপনারা বলছেন আফগানরাই নাকি বৌদ্ধ ধর্মের পূর্বসূরি! কিন্তু আমরা তো এখন উপলব্ধি করেছি এই ধর্ম ভিত্তিহীন, এবং আমরা ইসলামকে গ্রহণ করেছি।” আমি জিজ্ঞেস করি, “আমাদের মত করে আপনারাও সত্য ধর্মে কেন আসেননি?”

তারা বলেন, কাবাও তো পাথরের তৈরি এবং মানবহাতে নির্মিত। তাহলে মুসলমানরা কেন প্রতি বছর তীর্থ করে সেখানে যায়, কেন কাবাকে সম্মান করে? আমি আলোচনার ইতি টানি এবং তাদের আশ্বস্ত করি যে আমি প্রস্তাবগুলো আফগান কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাব।

এই স্মৃতিস্তম্ভ ধ্বংসের সময়টি ছিল আমার জন্য ক্লান্তিকর ও বিশেষভাবে কঠিন। আগত প্রতিনিধিদলগুলিকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমি কিছুই করতে পারছিলাম না। বুদ্ধমূর্তিগুলোর বিস্ফোরণ আফগানিস্তানের বৈদেশিক সম্পর্কের উপর আরও চাপ সৃষ্টি করেছিল। এই স্মৃতিস্তম্ভ ধ্বংসের বিষয়ে গৃহীত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আমার কোনো অংশগ্রহণ ছিল না এবং আমাকে এ নিয়ে কোনো পরামর্শও চাওয়া হয়নি। যদিও আমি বিশ্বাস করি এই ধ্বংস শারিয়াহ্‌র সীমার মধ্যেই ছিল, আমি মনে করি এই বিষয়টি শুধুই ধর্মীয় ছিল না; এই ধ্বংস ছিল অপ্রয়োজনীয় এবং সময়টিও ছিল অত্যন্ত অপটু।

কিন্তু এই মূর্তি ধ্বংসের কিছুদিন পরই আমিরাত আরও বড় ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

*****

আল হাজ্জ মোল্লা মোহাম্মদ রাব্বানী ছিলেন ইসলামি আমিরাত আফগানিস্তানের আমীরুল মুমিনীনের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যক্তি। জিহাদের সময় তিনি হিযব-ই-ইসলামি (খালিস) এর একটি ফ্রন্টে আবদুল রাজ্জাকের ডেপুটি কমান্ডার ছিলেন। কান্দাহার ও জাবুলের মুজাহিদদের মাঝে তিনি তার সাহস ও ঈমানের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় তিনি নিজেই যুদ্ধের নেতৃত্ব দিতেন এবং বহু বছর ধরে অসংখ্য অভিযান পরিচালনা করেন।

১৯৯৪ সাল থেকে তিনি তালেবান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই এই আন্দোলনের অন্যতম সম্মানিত কমান্ডারে পরিণত হন। যখন তালেবান কাবুল অবরোধ করে, তখন তিনিই অভিযানের নেতৃত্ব দেন এবং ওয়ারদাক প্রদেশ থেকে তার যোদ্ধাদের নিয়ে শহরের পতনের পর কাবুলে প্রবেশ করেন।

পরে তাকে সারপরস্তি শুরা-র প্রধান নিযুক্ত করা হয় এবং এর কিছুদিন পর তিনি মন্ত্রী পরিষদের সভাপতি হন। ১৯৯৯ সালে মোহাম্মদ রাব্বানীর স্বাস্থ্য অবনতির দিকে যেতে থাকে এবং তিনি চিকিৎসার জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) যান। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে জানা যায়, তিনি লিভারের ক্যান্সারের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছেন। লন্ডন থেকে ক্যান্সার বিশেষজ্ঞদের উড়িয়ে এনে তার অস্ত্রোপচার করা হয়। যদিও অপারেশন সফল হয়েছিল,

ডাক্তাররা জানান যে ক্যান্সার সেলগুলো পুরোপুরি অপসারণ করা যায়নি। তিনি কখনও পুরোপুরি সুস্থ হননি এবং ব্যথা নিয়ন্ত্রণে রাখতে তাকে প্রতি সপ্তাহে একটি ইনজেকশন নিতে হতো–প্রতিটি ইনজেকশনের দাম ছিল ৩৫,০০০ পাকিস্তানি রুপি।

তিনি প্রতি বছর চারবার শওকত হাসপাতাল (Shaukat Hospital) এ চিকিৎসার জন্য যেতেন। দুবাইয়ে অস্ত্রোপচারের পর মোহাম্মদ রাব্বানী আরও আড়াই বছর বেঁচে ছিলেন। একদিন হঠাৎ করে তার শরীর আবার খারাপ হয়ে পড়ে এবং তিনি দ্রুত অসুস্থ হতে থাকেন। তখন তিনি তার ভাই মৌলভী আহমদ রাব্বানী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু হাজ্জী ওহিদুল্লাহর সঙ্গে ইসলামাবাদে ফিরে আসেন। আমি পাকিস্তানি নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিমানবন্দরে তাদের গ্রহণ করি এবং সোজা সিমিজ হাসপাতালে নিয়ে যাই যেখানে তাকে ভর্তি করা হয়। এক ঘণ্টা হাসপাতালে থেকে আমি অফিসে ফিরে যাই।

আমি সাথে সাথেই ইউএই দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করি যাতে জরুরি চিকিৎসার জন্য তাকে স্থানান্তর করা যায়। আমি ব্রিটেন ও আমেরিকার দূতাবাসেও সাহায্যের অনুরোধ জানাই।

ইউএই দূতাবাস দ্রুত সাড়া দেয় এবং জানায় যে তারা একটি অ্যাম্বুল্যান্স-উড়োজাহাজ পাঠাবে রোগীকে ইউএই-তে স্থানান্তর করার জন্য। কিন্তু তারা ভুলভাবে ধারণা করেছিল যে "মহান মোল্লা" অসুস্থ, মোল্লা মোহাম্মদ রাব্বানী নয়। আমি যখন ইউএই দূতাবাসে মোহাম্মদ রাব্বানী, তার ভাই ও বন্ধুর পাসপোর্ট পাঠাই ভিসার জন্য, তখন তারা বুঝতে পারে যে রোগী সেই "বড় মোল্লা" নন, বরং মোল্লা মোহাম্মদ রাব্বানী। তখন দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত আবার আমাকে ফোন করেন এবং বলেন, তারা আগে যাঁরা তার অস্ত্রোপচার করেছিলেন সেই চিকিৎসকদের ইসলামাবাদে পাঠাবেন।

পরদিন চিকিৎসকরা বিমানবন্দর থেকে সরাসরি হাসপাতালে যান। তারা তাকে পরীক্ষা করে ম্যারিয়ট হোটেলে চলে যান এবং আমাকে ফোন করেন।

তারা বলেন, ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়েছে। আগের অস্ত্রোপচারের পর তারা রাব্বানীকে বলেছিলেন, রোগটি অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে এবং কেবল কয়েক বছরের জন্য নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে। এখন তারা বলেন, ক্যান্সার তার অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর কার্যকারিতা ধ্বংস করছে; ফুসফুস ও অন্যান্য অঙ্গ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তার যকৃৎ (লিভার) পুরোপুরি বিকল হয়ে গেছে। তারা আমাকে জানান, তাকে আর স্থানান্তর করা যাবে না, কারণ তার হাতে মাত্র সাত বা আট দিন সময় আছে। এখন আর কোথাও, এমনকি ইউএই-তেও, কোনো চিকিৎসার উপায় নেই। আমি বলি, তার ভাইকে এই খবর জানাতে, কারণ আমি নিজে সেটা বলতে পারছি না।

ব্রিটেন ও আমেরিকা আমার অনুরোধের কোনো জবাব দেয়নি। যদিও ডাক্তাররা নিশ্চিত করেছিলেন যে আর কোনো চিকিৎসা নেই, আমরা তবুও নতুন পরীক্ষামূলক চিকিৎসার খোঁজে বিদেশে খোঁজখবর চালিয়ে যাই এবং

হাজ্জী মোহাম্মদ রাব্বানীকে চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরের প্রস্তুতি নিই। কিন্তু তিনি বলেন, “নিজেদের কষ্ট দিও না। আমি আর সুস্থ হব না। আমি নিজেই তা জানি।”

আইএসআই প্রধান জেনারেল মাহমুদ, জেলানী এবং আরও কিছু কর্মকর্তা তাকে দেখতে আসেন। শওকত খানুম হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাদের রোগীর অবস্থা জানিয়েছিলেন। প্রতিদিনই তিনি আরও খারাপ হচ্ছিলেন, এবং পরিষ্কার ছিল যে তিনি আর বাঁচবেন না। অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চারপাশে তরল জমা হচ্ছিল এবং চিকিৎসকদের প্রতিদিন তা নিষ্কাশন করতে হতো। তিনি একাধিক অঙ্গ বিকলের পর্যায়ে পৌঁছান এবং ডাক্তারদের পূর্বাভাস অনুযায়ী অষ্টম দিনে সকাল ৮:৩০টায় তিনি ইন্তেকাল করেন। (ইন্নানিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন)

তার শেষ রাতে তিনি আমাকে এমন একটি উপদেশ দিয়েছিলেন যা আজও আমার মনে গেঁথে আছে। তখন মাগরিবের নামাজের সময় ছিল, হঠাৎ ফোন বাজল। আমি তার কক্ষ থেকে বের হয়ে ফোন ধরলাম যাতে তাকে বিরক্ত না করি। ফোনে কথা কিছুটা দীর্ঘ হয়ে যায়–প্রায় আধা ঘণ্টা। যখন আমি তার কক্ষে ফিরে যাই, তারা ইতোমধ্যে জামাতের সঙ্গে নামাজ পড়ে ফেলেছেন। মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মোল্লা মোহাম্মদ রাব্বানী সব নামাজ জামাতে আদায় করতেন।

আমি যখন ফিরে আসি, তিনি আমাকে ইশারায় কাছে ডাকেন। তার কণ্ঠস্বর এত দুর্বল ছিল যে আমি প্রায় শুনতেই পাচ্ছিলাম না, কথা বলতে তার অনেক কষ্ট হচ্ছিল।

তিনি জিজ্ঞেস করেন, “তুমি আমাদের সঙ্গে নামাজে অংশ নিলে না কেন?” আমি বললাম, আমি ফোনে ছিলাম এবং যাতে আপনাকে বিরক্ত না করি তাই বাইরে গিয়েছিলাম। কথোপকথনটা একটু লম্বা হয়ে যায়, আর আমি জানতাম না যে আপনারা জামাতে নামাজ পড়ছেন।

তিনি আমার দিকে তাকালেন। বললেন:
“ইবাদতের সময় হলে অন্য কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলো না। আল্লাহর হককে মানুষের হকের উপরে স্থান দাও!”

তারপর তিনি বললেন- “لاطاعته المخلوق فى معصيته الخالق”.

তিনি কখনও একা নামাজ পড়তেন না, আর আমি যতবারই তাকে নামাজে দেখেছি, সর্বোচ্চ বিনয়ের সঙ্গে আদায় করতে দেখেছি।

এটাই ছিল আমার সঙ্গে তার শেষ কথা। তিনি যখন ইন্তেকাল করেন, আমি তখন বাড়িতে ছিলাম, আর একজন আমাকে ফোন করে খবর দেয়। আমি যখন হাসপাতালে পৌঁছাই, তখন তার মরদেহ ইতোমধ্যেই মর্গে নেওয়া

হয়েছিল। তাকে একটি ফ্রিজিং ইউনিটে রাখা হয়েছিল, কিন্তু সেটি কাজ করছিল না, ফলে তার দেহ তখনো উষ্ণ ছিল।

আমি তার জানাজা ও গোসলের দায়িত্ব গ্রহণ করি। গোসল করানোর সময় আমি মোল্লা মোহাম্মদ রাব্বানীর দিকে তাকিয়ে দেখি, তার পুরো দেহ রাশিয়ান বুলেটের ক্ষতচিহ্নে ভরা। শরীরের এমন কোনো অংশ ছিল না যেখানে গুলির চিহ্ন ছিল না। আল্লাহ তাকে তখন জীবন দিয়েছিলেন এবং সেইসব যুদ্ধে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন; আর এবার ক্যান্সারের মাধ্যমে তার প্রাণ নিয়ে নিলেন।

সেদিনই তার মরদেহ জাতিসংঘের একটি বিমানে করে কান্দাহারে পাঠানো হয়, যেখানে তাকে সমাহিত করা হয়।
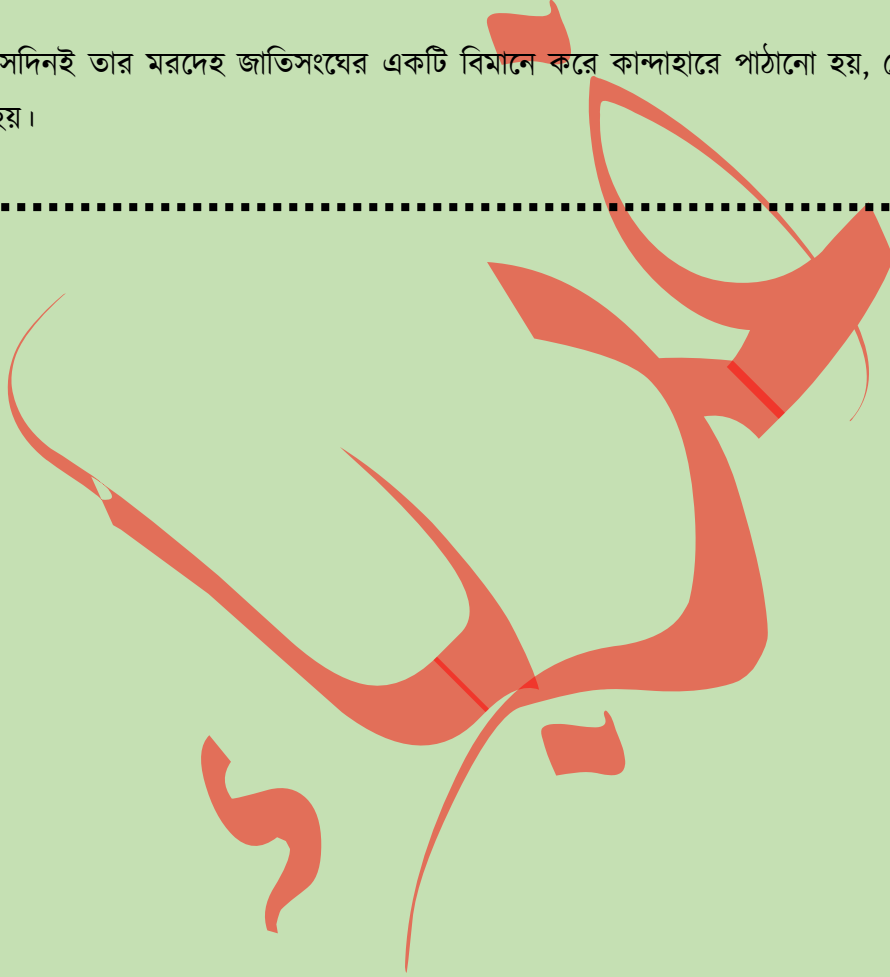
THE OSAMA ISSUE

জাতিসংঘের পাকিস্তানস্থ প্রধান দপ্তরটি ইসলামাবাদে অবস্থিত ছিল এবং তা আফগানিস্তানে সীমান্তের ওপারে কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্বও পালন করত। তখন এর নেতৃত্বে ছিলেন ফ্রান্সেস ভেনড্রেল, যিনি জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বিশেষ দূত ছিলেন।

জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থাগুলো, যেমন UNHCR বা মানবিক সাহায্য কার্যক্রমও একই কার্যালয় ব্যবহার করত। সেই সময় জাতিসংঘই ছিল ইসলামাবাদ ও আফগানিস্তানের মধ্যে একমাত্র ফ্লাইট পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ। ইসলামি আমিরাতের কূটনীতিকরা তা নিয়মিত ব্যবহার করত, যতক্ষণ না নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এই সেবাটিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

জাতিসংঘ আফগানিস্তান ও আমাদের দূতাবাসের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য কঠোর পরিশ্রম করত। তারা নিয়মিত আমাদের পরিদর্শনে আসত এবং যখনই কোনো বিদেশি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তাদের বিভাগ পরিদর্শনে আসত, তারা নিশ্চিত করত যেন তার সূচিতে আমাদের দূতাবাসের সঙ্গে সাক্ষাত অন্তর্ভুক্ত থাকে। এখন ফিরে তাকিয়ে মনে হয়, তাদের ঘনঘন পরিদর্শনের ফলেই আমাদের ওপর চাপ বাড়তে থাকে।

একবার ফ্রান্সেস ভেনড্রেলের অফিসে এক বৈঠকে তিনি উৎসাহভরে বলছিলেন, তালেবানদের উচিত আমেরিকার কাছে ওসামা বিন লাদেনকে হস্তান্তর করা এবং জাতিসংঘের সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান দেখানো। আমি বলি, এটা জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত নয়, আর এটা তাদের অধিকারও নয়; তারা কেবল আমেরিকার চাপের মুখে এমন কথা বলছে। আমি তাকে বললাম, আমি ওসামা বিন লাদেন সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতায় নেই। তবে কৌতূহলবশত জিজ্ঞাসা করলাম, কেন ইসলামি আমিরাতের উচিত হবে তাকে আমেরিকার কাছে হস্তান্তর করা? সে আমেরিকার কাছে অভিযুক্ত; কিন্তু আফগানিস্তানের সঙ্গে আমেরিকার কোনো আইনি চুক্তি নেই যা তাকে কাউকে হস্তান্তর করতে বাধ্য করে। উপরন্তু, জাতিসংঘ তো একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান, তাহলে কোনো আইনি ভিত্তি ছাড়াই কীভাবে তারা এমন অনুরোধকে সমর্থন করে?

তিনি আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলেন না, বরং বললেন, "শোনো! সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে, এবং যদি তোমরা দ্রুত হস্তান্তর না করো, আমেরিকা শক্তি প্রয়োগ করে তাকে নিয়ে যাবে।"

আমার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না যে আমেরিকা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং জাতিসংঘ তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে। কেবল সময় ও উপায় অনিশ্চিত ছিল। আমি বলেছিলাম, "আমেরিকা যুদ্ধ শুরু করতে পারে, কিন্তু সে তার উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারবে না। যুদ্ধ ওদের প্রশাসন ও আমাদেরটিকেও ধ্বংস করবে, রক্ত ঝরবে, শত্রুতা বাড়বে এবং আফগানিস্তান আবারো নিজের ভেতরে ও বহির্বিশ্বের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে।"

কিন্তু কেউ আমার কথা শোনেনি। ভেনড্রেল বহুবার আফগানিস্তানে গেছেন এবং কান্দাহারে আমিরুল মুমিনীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। কফি আনান যখন পাকিস্তানে আসেন, তিনি ম্যারিয়ট হোটেলে অবস্থান করছিলেন, সেখানেই তিনি আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুতাওয়াকিল ও দূতাবাসের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তার সফরের প্রধান উদ্দেশ্যও ছিল ওসামা বিন লাদেনকে আমেরিকার কাছে হস্তান্তরের বিষয়ে আলোচনা করা। জাতিসংঘ সবসময় আমেরিকার অবস্থানকেই উপস্থাপন করত এবং আফগানিস্তানকে দোষারোপ করত, যদিও তারা নিজেদের নিরপেক্ষ হিসেবে তুলে ধরত।

জাতিসংঘের পক্ষপাতিত্বের একটি বড় উদাহরণ হলো আফগানিস্তানে মাদকসংক্রান্ত তাদের প্রতিবেদনে। এক প্রতিবেদনে, যা সাধারণ পরিষদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিল, তারা ভিত্তিহীন অভিযোগ ও গুজব উপস্থাপন করেছিল। তালেবান সরকার তখন পুরো আফগানিস্তানে পপি চাষ ও আফিম উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করেছিল, যা ছিল নজিরবিহীন। কিন্তু ওই প্রতিবেদনে বলা হয় যে তালেবান কৌশলে উৎপাদন বন্ধ করে বিশ্ববাজারে আফিমের দাম বাড়িয়েছে, কারণ তারা আগেই বিপুল পরিমাণ কাঁচা আফিম মজুত করে রেখেছিল। এই প্রতিবেদন বিশ্বব্যাপী জনমতকে প্রভাবিত করে এবং তালেবান সরকারের মাদকবিরোধী ব্যতিক্রমী সাফল্যকে কলঙ্কিত করে তোলে, যা আজ পর্যন্ত আর কেউ করতে পারেনি।

অন্য অনেক বিষয়কেও ভুলভাবে উপস্থাপন করা হতো, যেমন ইসলামি আইনের আওতায় প্রতিশোধ বা হদ-এর প্রয়োগ, যাকে জাতিসংঘ বর্বরতা বা হত্যাকাণ্ড হিসেবে তুলে ধরত। ইসলামি আইনে, প্রতিশোধ নেওয়ার অধিকার ভুক্তভোগীর ওয়ারিসদের থাকে, বিশেষত হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে। এই নিয়ম অনুযায়ী, কেবল নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসই হত্যাকারীকে ক্ষমা করতে পারে। পুরুষ বা নারী যেই হোক, তাকে শরিয়তের আওতায় বিচার করতে হবে।

এমনই একটি ভুল ব্যাখ্যার ঘটনা ঘটেছিল 'জামিনা' নামের এক নারীর মামলায়। তিনি স্বামীকে নিজ হাতে হত্যা করেছিলেন এবং আদালতে স্বীকারোক্তিও দিয়েছিলেন। দণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল কাবুল স্টেডিয়ামে তার স্বামীর আত্মীয়দের মাধ্যমে। আজও আমি জানি না সেই দৃশ্য কীভাবে ভিডিও করা হয়েছিল এবং জাতিসংঘের হাতে পৌঁছেছিল, কিন্তু তারা তালেবানদের ওপর নিরপরাধ নারীদের হত্যা করার অভিযোগ তোলে, বিচারপ্রক্রিয়া বা অপরাধের কোনো বিবরণ না দিয়ে।

একবার জাতিসংঘ তালেবানদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যাতে বলা হয় যে তারা কমবয়সী ছেলেদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি করায় এবং শিশুদের সম্মুখভাগ রক্ষার কাজে ব্যবহার করে। এরপর এরিক ডি মুল, জাতিসংঘের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি, নিজে ফ্রন্টলাইন পরিদর্শন করেন এবং সেখানে একটিও কমবয়সী শিশু বা কিশোর খুঁজে পাননি। তার পরের প্রতিবেদনে তিনি তার আগের বক্তব্য সংশোধন করেন।

তালেবান যখনই তাদের বিমানবাহিনী ব্যবহার করত, জাতিসংঘ তখনই বেসামরিক প্রাণহানির অভিযোগে নিন্দা করত। অথচ গত কয়েক বছরে ISAF ও NATO-এর হাতে যে সংখ্যক বেসামরিক লোক নিহত হয়েছে, তা তুলনাহীন। আবার, যখন তালেবান ছয়জন বিদেশিকে আটক করে, যাদের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানে খ্রিষ্ট ধর্ম

প্রচারের অভিযোগ ছিল–যদিও তারা ভিসার আবেদনে স্বাক্ষর করেছিল যে তারা কোনো রাজনৈতিক বা ধর্মীয় কার্যকলাপে জড়াবে না–তখন জাতিসংঘ আফগানিস্তানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, কেবল ছয়জনের জন্য পুরো ২৮ মিলিয়ন মানুষের দেশের বিরুদ্ধে। এই ছয়জনের মধ্যে দুইজন আমেরিকান ছিল, এবং আমেরিকা সঙ্গে সঙ্গে বলে দেয় যে তালেবান অবৈধভাবে তাদের আটক করেছে।

এই যুদ্ধের প্রাক্কালে নানা প্রতিবেদন ও ঘটনা ঘটেছে, যেগুলো দেখে মনে হয়েছে আমেরিকাই ইচ্ছাকৃতভাবে উত্তেজনা সৃষ্টি করছে এবং আফগানিস্তান ও তালেবানদের নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করছে।

জাতিসংঘ এখন আর আগের মতো নেই। এটি এখন বিশ্বশক্তিধর দেশগুলোর একটি হাতিয়ার হয়ে উঠেছে, যারা আফগানিস্তান ও ইরাকের মতো মুসলিম দেশগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। আজ যা আমরা দেখছি, তা অতীতে কখনও দেখা যায়নি। আমেরিকা পুরো বিশ্বকে গিলে নিচ্ছে, নৃশংসভাবে বোমা মেরে ইরাক ও আফগানিস্তানে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করছে, শত শত গ্রাম ধ্বংস করছে। কীভাবে তাদের অনুমতি দেওয়া হয় যে তারা সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নামে মুসলিমদের অপমান, হত্যা ও বন্দি করে?

তারা বছরের পর বছর ধরে লোকজনকে বন্দি করে রাখে, না জানিয়ে তাদের পরিণতি, না নিয়ে যায় আদালতে। আমি নিজে সেখানে ছিলাম, আর আমার বহু বন্ধুও এখনো আছে। আমাদের কোনো অধিকার ছিল না: গুয়ানতানামো বে-তে কোনো মানবাধিকার নেই। কোনো ব্যাখ্যা নেই, কোনো বন্ধু বা পরিবারের সাক্ষাৎ নেই। কেবল ধীরে ধীরে আশা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া, আত্মাকে চেপে ধরা এক যন্ত্রণা, যেন তা কখনোই শেষ হবে না।

তবুও, সেই জাতিসংঘই, যারা আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল, আজ আমেরিকার কার্যকলাপের ব্যাপারে চুপ থাকে বা প্রকাশ্যে সমর্থন করে।

******

আফগানিস্তানে চলমান ঘটনাবলী এবং ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতার প্রেক্ষিতে, কাবুল বা কান্দাহারে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের জন্য বিদেশি কূটনীতিকদের অনুরোধ ক্রমশ কমে আসতে লাগল, এবং আমাদের দূতাবাস ধীরে ধীরে এমনভাবে কাজ করতে শুরু করল যেন সেটিই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়–শেষমেশ দুটি প্রতিষ্ঠান আর আলাদা করে চেনা যেত না। যদিও অধিকাংশ দেশ ইসলামি আমিরাতকে বৈধ সরকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি, তবুও অনেক বিদেশি কূটনীতিক নিয়মিত আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, অথবা যখনই আফগানিস্তান সংক্রান্ত কোনো সমস্যা দেখা দিত।

আমি বিদেশি কূটনীতিকদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত ছাড়া আমি অন্যান্য রাষ্ট্রদূতদের সবাইকে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেছি এবং তাদের অধিকাংশের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাদের অনেকেই ভদ্র এবং জ্ঞানী ছিলেন। তবে জার্মানি, বেলজিয়াম, কুয়েত এবং সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূতদের কথা আমার ভালো মনে পড়ে না। পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত একজন সদয় এবং বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ ছিলেন।

জার্মানি ও বেলজিয়ামের রাষ্ট্রদূতরা ছিলেন অভদ্র, নির্মম এবং উদ্ধত। তারা দু' জনই লম্বা, চওড়া কাঁধের অধিকারী এবং পক্ষপাতদুষ্ট; তারা সবসময় নারীদের অবস্থান নিয়ে কথা বলতে চাইতেন।

কুয়েতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন অত্যন্ত অহংকারী একজন ব্যক্তি। তাঁর হলদেটে গোঁফ ছিল, এবং যখনই তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতেন, মনে হতো যেন তিনি আত্মকেন্দ্রিক এবং আফগানদের প্রতি তার কোনো শ্রদ্ধা নেই। কুয়েতিরা সবসময় আমেরিকার পক্ষে থাকত; মাঝে মাঝে মনে হতো, তারা যখন 'আমেরিকা' ও 'বুশ' -এর নাম উচ্চারণ করত, তখন যেন তাদের জীবন এদের ওপর নির্ভর করে।

সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত দেখতে তরুণ ছিলেন; তিনি আগ্রহী ছিলেন, তবে দাবিদাওয়া করার অভ্যেস ছিল। তিনি প্রায়ই ওসামা বিন লাদেন সম্পর্কে কথা বলতেন। একদিন আমি আফগান হাজিদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে তাঁর দপ্তরে যাই, কিন্তু যখন আমরা মূল আলোচনায় প্রবেশ করি, তিনি বিষয়টি এড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে উচ্চস্বরে ওসামা নিয়ে কথা বলতে থাকেন। আমি তাঁর আচরণে বিস্মিত হই; একাধিকবার আমি তাঁকে বলেছিলাম যে আমি ওসামা নিয়ে কথা বলতে আসিনি এবং এটি আমার এখতিয়ার নয়—এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে অন্য কেউ। কিন্তু তিনি শুনতেই চাইলেন না।

সবচেয়ে সহানুভূতিশীল এবং করুণাজনক রাষ্ট্রদূত ছিলেন যুদ্ধবিধ্বস্ত ফিলিস্তিন থেকে আসা প্রতিনিধি। ইসলামি বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রদূতরা ভদ্র এবং ভালো মানুষ ছিলেন, কিন্তু ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত ছিলেন একজন সদয় ব্যক্তি। অইসলামি দেশের রাষ্ট্রদূতরাও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কূটনৈতিক শিষ্টাচার মেনে চলতেন এবং দূতাবাসের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতেন, যদিও আমাদের বৈধতা স্বীকার না করায় সীমাবদ্ধতা ছিল।

আমরা চীন, ফ্রান্স, ব্রিটেন ইত্যাদির দূতাবাসের সঙ্গে নির্দিষ্ট বা সমসাময়িক ইস্যুতে আলোচনা করতাম। যখন অ্যারিয়ানা এয়ারলাইন্সের একটি এয়ারবাস ছিনতাই হয়ে ব্রিটেনে অবতরণ করে, তখন ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত আসেন এবং চান যে ছিনতাইকারীদের ব্রিটেনে বিচার করা হোক। কিন্তু আমিরাত তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে। তারা বিমানের পাইলটদের সাক্ষ্য দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তবুও আমিরাত রাজি হয়নি। ব্রিটেন তখন ওসামা বিন লাদেনের ইস্যুতে আমেরিকার পাশে ছিল, এবং চাপ বাড়ছিল।

চীনের রাষ্ট্রদূত একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যিনি দূতাবাস ও আফগানিস্তানের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। তিনি আফগানিস্তান সফর করতে ও আমির উল-মু' মিনীন-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন, এবং আমি তাঁর সফর বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করি। প্রথমে তিনি কাবুলে যান, সেখানে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা দেওয়া হয়, তারপর তিনি কান্দাহারে যান মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

রাষ্ট্রদূত ব্যাখ্যা করেন, চীনের সরকার উদ্বিগ্ন যে, ইসলামি আমিরাত আফগানিস্তান সম্ভবত জিনজিয়াংয়ের মুসলমানদের সহায়তা করছে—এটি একসময় একটি ইসলামি রাষ্ট্র ছিল এবং এখন চীনের অংশ, যেখানে স্বাধীনতার জন্য এক অনিয়মিত সশস্ত্র সংগ্রাম চলে আসছে মুসলিম প্রতিরোধ গোষ্ঠী ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে।

মোল্লা মোহাম্মদ ওমর তাঁকে নিশ্চিত করেন যে, আফগানিস্তানের কখনোই চীনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের আগ্রহ বা ইচ্ছা ছিল না, এবং আফগানিস্তান কখনোই তার ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেবে না এমন কোনো কর্মকাণ্ড বা গোষ্ঠীর জন্য যারা চীনের বিরুদ্ধে কাজ করতে চায়। রাষ্ট্রদূত তাঁর সফর শেষে সন্তুষ্ট হন বলে মনে হয়েছিল। তিনি ছিলেন প্রথম অইসলামি বিদেশি রাষ্ট্রদূত যিনি মোল্লা মোহাম্মদ ওমর সাহেবকে সাক্ষাৎ করেন। চীনের রাষ্ট্রদূতের সফরের পরে ফ্রান্সেসক ভেন্দ্রেলও মোল্লা ওমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আমরা বহুবিধ বাধা থাকা সত্ত্বেও বিদেশি বিশ্বে আফগানিস্তানের সম্পর্ক উন্নত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলাম।

কিন্তু আমাদের সব প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে, পরিস্থিতি দিনকে দিন খারাপ হতে থাকে। নিষেধাজ্ঞা ও অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কঠিনতর হয়, সম্পর্ক আরও খারাপ হয় এবং একের পর এক ঘটনা ঘটে যা পূর্ববর্তী সব প্রচেষ্টা নষ্ট করে দেয়। এইভাবেই ঘটনাপ্রবাহ ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের দিকে গড়ায়, যেদিন পুরো পৃথিবী ওলটপালট হয়ে যায়।

আমাদের সবচেয়ে জটিল সম্পর্ক ছিল আমেরিকার সঙ্গে, যাদের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত বৈঠক হতো। ওসামা বিন লাদেনের বিষয়টি নিয়ে আমাদের আলোচনা ছিল অত্যন্ত কঠিন। এ নিয়ে বারবার আমেরিকান দূতাবাস অথবা আমাদের দূতাবাসে বৈঠক হতো। আমি যখন আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব নিই, তখন উইলিয়াম মিলাম ছিলেন আমেরিকার রাষ্ট্রদূত এবং পলা থেড়ি ছিলেন দূতাবাসের রাজনৈতিক বিষয়ক কর্মকর্তা।

প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ২০০১ সালে নির্বাচিত হওয়ার পর, তিনি নতুন রাষ্ট্রদূত ও সিনিয়র কর্মকর্তা নিয়োগ দেন ইসলামাবাদে। কাবির মোহাবত, একজন আফগান-আমেরিকান নাগরিক (খালিলজাদের মতো), তাঁকে নিয়োগ দেওয়া হয় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে, এবং একসময় তাঁকে অস্থায়ী দূত হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। আমেরিকা জোর দিয়ে চেয়েছিল যে আফগানিস্তান যেন ওসামা বিন লাদেনকে হস্তান্তর করে বা এমন কোনো দেশে পাঠিয়ে দেয় যে তাঁকে হস্তান্তর করতে রাজি হবে।

তালেবান পক্ষ দাবি করে যে, একটি বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওসামার মর্যাদা বজায় রাখা দরকার। এই ইস্যু দুই দেশের মধ্যে গভীর দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। আমি একবার এক সন্ধ্যায় রাষ্ট্রদূতের দপ্তরে গিয়ে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি এবং ইসলামি আমিরাতের প্রস্তাবিত তিনটি সমাধান বিশদভাবে ব্যাখ্যা করি:

১. যদি আমেরিকা দাবি করে যে ওসামা বিন লাদেন নাইরোবি ও তানজানিয়ায় বোমা হামলার জন্য দায়ী, তবে তাদের উচিত প্রমাণাদি আফগানিস্তানের সুপ্রিম কোর্টে পেশ করা। প্রমাণ পাওয়া গেলে ওসামাকে ইসলামী শরিয়াহ অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হবে।

২. যদি আমেরিকা ইসলামি আমিরাতকে স্বীকৃতি না দেওয়ায় বা আফগানিস্তানের আদালতের নিরপেক্ষতা মেনে না নেওয়ায় প্রথম প্রস্তাব গ্রহণ না করে, তাহলে তিনটি ইসলামি দেশের অ্যাটর্নি জেনারেলদের নিয়ে একটি নতুন আদালত গঠন করা যেতে পারে। বিচার হবে চতুর্থ ইসলামি দেশে। আমেরিকা সেখানে তার প্রমাণাদি পেশ করবে, এবং আফগানিস্তান আদালতের অংশীদার থাকবে ও ওসামাকে হাজির করবে।

৩. যদি আমেরিকা এই আদালতকেও বিশ্বাস না করে, তাহলে আফগানিস্তান প্রতিশ্রুতি দেয় যে ওসামার সব কার্যক্রম বন্ধ করা হবে। তাকে সকল যোগাযোগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হবে এবং সে শুধুই একজন সাধারণ আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে জীবনযাপন করবে।

আমেরিকা এই তিনটি প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করে এবং জোর দেয় যে, ওসামাকে নিঃশর্তভাবে হস্তান্তর করতে হবে এবং তাঁর বিচার হবে আমেরিকায়।

আমরা বুঝিয়ে বলেছিলাম কেন এটা সম্ভব না—প্রথমত, আমাদের মধ্যে কোনো বহিরাগত চুক্তি ছিল না। দ্বিতীয়ত, আমেরিকার একতরফা দাবি পুরো ইসলামি বিশ্বে ন্যায়বিচারের প্রতি অবজ্ঞার শামিল এবং ইসলামি বিচার ব্যবস্থার প্রতি অবমাননা। কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না আসায় এই সমস্যা শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিতই থেকে যায়।

ইমারাত বা আমেরিকার পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত না হলেও আরও কিছু সমাধানের প্রস্তাব আলোচনায় এসেছিল। একটি প্রস্তাব ছিল—আমেরিকা ও কয়েকটি ইসলামি দেশের অংশগ্রহণে একটি যৌথ আদালত গঠন করা, এবং আরেকটি ছিল—আন্তর্জাতিক আদালত, দ্য হেগ-এ বিচার অনুষ্ঠিত করা। কিন্তু এই প্রস্তাবগুলো কখনোই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়নি, কারণ আমেরিকা তাদের মূল দাবির—ওসামা বিন লাদেনকে আমেরিকার বিচার ব্যবস্থার হাতে তুলে দিতে হবে—থেকে একচুলও নড়েনি। আমেরিকা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিল, আফগানিস্তান যদি তাদের দাবি না মানে, তাহলে তারা বলপ্রয়োগে এগোবে।

ক্রিস্টিনা রোক্কা, দক্ষিণ এশিয়ার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব, ইসলামাবাদ সফরে এসে এক বৈঠকের অনুরোধ করেন। ২০০১ সালের ২ আগস্ট আমরা ইসলামাবাদে আমেরিকান দূতাবাসে সাক্ষাৎ করি। তিনি শুধুমাত্র ওসামার বিষয়েই আগ্রহী ছিলেন। বৈঠকে তিনি কূটনৈতিক শিষ্টাচারের প্রতিটি নীতি লঙ্ঘন করেন, আর তার প্রতিটি কথাই ছিল হুমকিস্বরূপ—কখনো স্পষ্ট, কখনো পরোক্ষ। সেই বৈঠক ছিল তীব্র বাকযুদ্ধের একটি পর্ব।

আমি ওসামা বিন লাদেনের ইস্যুতে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে চারবার সাক্ষাৎ করেছি, কিন্তু প্রতিবারই ফলাফল ছিল শূন্য। যদিও আমরা দু' জনেই আমাদের দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করেছি এবং আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কটাও ছিল ভালো, তারপরও এসব বৈঠক থেকে কিছুই অর্জিত হয়নি, কারণ আমাদের কারো

কাছেই সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা ছিল না। আমাদের বৈঠকগুলোর অনুমোদন ও সব সিদ্ধান্ত অন্য কেউ দিত এবং প্রতিবারই সেসব ছিল নেতিবাচক।

একদিন সকালে মার্কিন রাষ্ট্রদূত অপ্রত্যাশিতভাবে সেদিনই একটি বৈঠকের অনুরোধ জানালেন। (মার্কিনরা মাঝে মাঝে খুব ছোট বিষয়েও উত্তেজিত হয়ে যেতেন।) আমি ক্লান্ত ছিলাম এবং বিশ্রামের উদ্দেশ্যে বাসায় যাচ্ছিলাম, কিন্তু তারা জোর দিয়েই বললেন, যত দ্রুত সম্ভব দেখা করতে হবে। আসরের নামাজের পর রাষ্ট্রদূত আমার বাসায় এলেন, সঙ্গে ছিলেন পলা থেডি। তিনি উদ্বিগ্ন ও অস্থির দেখাচ্ছিলেন এবং ঘরে ঢুকেই কথা বলা শুরু করলেন, "আমাদের গোয়েন্দা রিপোর্ট বলছে, ওসামা আমেরিকার বিরুদ্ধে বড় ধরনের হামলার পরিকল্পনা করছে। এই কারণেই আমাদের এত দেরিতে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসতে হলো। আফগান কর্মকর্তাদের বলুন যেন তারা এই হামলা ঠেকায়!"

আমি সরাসরি ইমারাতের কাছে এই উদ্বেগের কথা জানিয়ে দিই, যদিও এটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পাঠানো উচিত ছিল। কিন্তু বৈঠকের তাড়াহুড়োর কথা মাথায় রেখে এবং জহির শাহের সময়ের সীমান্ত কমান্ডারের পুরনো গল্পটি মনে করে আমি সরকারি প্রটোকল ভেঙে ফেলি। তেইশ ঘণ্টা পর কান্দাহার থেকে রাষ্ট্রদূতের জন্য একটি চিঠি পাই। সেখানে লেখা ছিল, "আফগানিস্তান এখন বা ভবিষ্যতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছা পোষণ করে না। আমরা আমেরিকার বিরুদ্ধে কোনো ধরনের হামলাকে সমর্থন করি না এবং আমাদের ভূমি ব্যবহার করে কেউ যেন এ ধরনের হামলার পরিকল্পনা বা প্রশিক্ষণ না নিতে পারে তা নিশ্চিত করব।"

চিঠিটি ছিল একটি নিশ্চয়তা, যা স্পষ্টভাবে ইমারাতের অবস্থান তুলে ধরেছিল। আমি নিজে তা ইংরেজিতে অনুবাদ করি এবং মূল পশতু পাঠসহ মার্কিন রাষ্ট্রদূতের হাতে তুলে দিই। কিন্তু তবুও, এই চিঠি আমেরিকার সন্দেহ দূর করতে পারেনি।

মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে আমি শেষবার দেখি যখন তিনি বিদায় জানাতে আসেন। তিনি বলেন, আমরা যে ভালো কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলাম, তার জন্য তিনি কৃতজ্ঞ। তিনি ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, কিছুদিনের মধ্যেই এমন কিছু ঘটতে যাচ্ছে যা একটি ভয়াবহ পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে। তার বিশ্বাস ছিল, ওসামা এখনো আমেরিকার জন্য হুমকি এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখবে। আর আমেরিকাও তার হুমকি ও হামলাকে আর সহ্য করবে না। এখনই সময়, কোনো সমাধানে পৌঁছানোর–না হলে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাবে।

যদিও আমেরিকা জাতিসংঘের মাধ্যমে আফগানিস্তানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল এবং কূটনৈতিকভাবে আরও একঘরে করার চেষ্টা করছিল, তবুও ওসামা বিন লাদেনের বিষয়টি নিয়েই সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ ছিল। অনেক ব্যক্তিগত পার্টি ও গোপন বৈঠকে এই আলোচনা চলছিল–যদি তাকে হস্তান্তর করা হয়, তাহলে আমেরিকা অন্য সব দাবি তুলে নিয়ে ইমারাতকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেবে।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যখন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনে হামলা হলো, তখন সব কিছু স্থবির হয়ে গেল, এবং গোটা পৃথিবী ওলটপালট হয়ে গেল। সেই মুহূর্তে চলতে থাকা কূটনৈতিক আলোচনার প্রক্রিয়াটি ভেঙে পড়ে, এবং আমরা সবাই এর পরিণতি নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করি।

9/11 AND ITS AFTERMATH

সন্ধ্যা সাতটা কিংবা আটটার দিক হবে। আমি তখন বাসায় ছিলাম, খাবার পরিবেশনের অপেক্ষায়। ঠিক তখনই রহমতুল্লাহ দৌড়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। তার মুখে চিন্তার ছাপ স্পষ্ট–সে ফ্যাকাশে মুখে আমাকে বলল, “জায়েফ সাহেব, আপনি কি টিভিতে খবর দেখেছেন?”

আমি বললাম, “না। কী হয়েছে?”

সে বলল, “টিভি চালু করুন। আপনাকে আমেরিকায় কী ঘটছে সেটা দেখতে হবে। আমেরিকা জ্বলছে।”

আমার নিজের কোনো টেলিভিশন ছিল না তখন; দূতাবাসে একটি সেট ছিল, যা গণমাধ্যম পর্যবেক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হতো। আমি সাধারণত পৃথিবীর নানা স্থানে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর সংবাদ কাগজ ও প্রতিবেদনের মাধ্যমে জেনে নিতাম।

রহমতুল্লাহ ছিলেন আহমদ রতিব পোপালের ভাই। রতিব পোপাল আমার বাড়ির ঠিক উল্টোদিকে থাকতেন এবং তিনি হামিদ কারজাইয়ের মতোই পোপলজাই গোত্রের মানুষ ছিলেন। আমরা রহমত ফকিরের বাসায় গেলাম। সেখানে অনেক মানুষ জমায়েত হয়েছিল, দূতাবাসের অনেক সহকর্মীও ছিল। আমরা একসঙ্গে টিভিতে দেখছিলাম নিউ ইয়র্ক শহরের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের একটি টাওয়ারে আগুন লেগেছে। ভবনটির ভেতর থেকে আগুন ও ঘন কালো ধোঁয়া আকাশের দিকে উঠছিল।

এর অল্প কিছুক্ষণ পরেই আরেকটি বিমান দ্বিতীয় টাওয়ারে আঘাত হানে। সেটি যেন গুলির মতো ভবনটিতে প্রবেশ করল, আর আগুন ও ধ্বংসাবশেষ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। যারা আগুনের ওপরে আটকা পড়েছিল, তারা আকাশছোঁয়া ভবন থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ছিল–যেন আকাশ থেকে পাথর পড়ছে। দৃশ্যটি ছিল ভয়াবহ, আমি অবাক হয়ে সেই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

স্ক্রিনে তাকিয়ে আমার মাথায় তখনই ভবিষ্যতের সম্ভাব্য পরিণতির চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে। আমি বুঝে যাই, এই ঘটনার খেসারত শেষমেশ আফগানিস্তান এবং এর দরিদ্র জনগণকেই দিতে হবে। আমেরিকা প্রতিশোধ নেবে এবং তারা তাদের আক্রোশের লক্ষ্য হিসেবে আমাদের বিপর্যস্ত দেশকে বেছে নেবে।

এই চিন্তায় আমার চোখে পানি চলে আসে। কিন্তু আমার চারপাশে যারা ছিল, তারা বিস্মিত হয়ে আমার দিকে তাকাল এবং জানতে চাইল, আমি দুঃখিত কেন? সত্যি বলতে, তাদের অনেকেই খুশি ছিল। কেউ কেউ একে অপরকে অভিনন্দন জানাচ্ছিল, করমর্দন করছিল–এই দৃশ্য দেখে আনন্দিত হচ্ছিল।

এই উল্লাস আমাকে আরও চিন্তিত করে তোলে; আমি ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়ি। কীভাবে তারা এতটা সরলভাবে কেবল মুহূর্তের ঘটনাকে দেখে খুশি হতে পারে, কিন্তু তার দীর্ঘমেয়াদি পরিণতি নিয়ে একটুও ভাবছে না?

আমি সবার দিকে তাকিয়ে বললাম, "আপনারা কি ভেবেছেন, এই ঘটনার জন্য আমেরিকা ও বিশ্ব কাকে দায়ী করবে? কার উপর তাদের রাগ গিয়ে পড়বে?"

তারা বলল, তারা জানে না কে দায়ী হবে এবং এ বিষয়ে ভাবার প্রয়োজনও তারা অনুভব করছে না। তাদের কাছে আমেরিকা ছিল এক শত্রু রাষ্ট্র, যে আমাদের দেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দিয়েছে এবং আমাদের ওপর মিসাইল হামলা চালিয়েছে। স্ক্রিনে তারা যে দৃশ্য দেখছে–শক্তির প্রতীক আমেরিকা নিজের মাটিতে জ্বলছে–তারা এটিকে উদযাপনের কারণ হিসেবে দেখছে।

আমি বেশি কিছু বলিনি, কিন্তু মনে করলাম, যা সত্য বলে মনে করি, তা বলা দরকার।

চোখ মুছে আমি বললাম, "আমি আপনাদের কিছু বোঝাতে চাই না বা আপনাদের মত পাল্টাতে চাই না। কিন্তু আমি বলছি, আপনারা এই মুহূর্তটিকে মনে রাখবেন, যখন আপনারা এই ঘরে বসে এই দৃশ্য দেখছেন, কারণ আমরা এর মূল্য চুকাতে বাধ্য হবো। যুক্তরাষ্ট্র ওসামা বিন লাদেনকে দায়ী করবে–যিনি আফগানিস্তানে আমাদের অতিথি হিসেবে রয়েছেন, এটা আপনারা সবাই জানেন। আমেরিকার আজকের ভয় ও শোকের প্রেক্ষাপটে আফগানিস্তানে হামলার সম্ভাবনা খুবই বেশি। তারা হয়তো খুব শিগগিরই হামলা চালাবে।"

"ওসামা হলেন আমেরিকার 'প্রথম শত্রু', যিনি অতীতে ছোট-বড় নানা ঘটনার জন্য দায়ী হয়েছেন। আমেরিকার কাছে কোনো ইসলামী নেতাকে দোষারোপ ও অভিযুক্ত করা তাদের পক্ষে মুসলিম দেশগুলোতে হস্তক্ষেপের সুযোগ এনে দেয়, আর তাতে বিশ্বের সমর্থনও পায়। ওসামা বিন লাদেন আমেরিকার সেই উপযুক্ত ছুতো, যার মাধ্যমে তারা তাদের বৃহত্তর এজেন্ডা বাস্তবায়ন করবে। তারা নিজেদের ভুল ও ব্যর্থতাও আড়াল করতে চায়; আর ওসামার মতো ব্যক্তিকে ব্যবহার করে তারা বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত করবে। আমি ভয় পাচ্ছি–ওসামা হয়তো এই হামলার দায় স্বীকার করে বসবে এবং আমেরিকানদের সেই প্রমাণ দিয়ে দেবে, যা তারা খুঁজছে, চাইলেও বা না চাইলেও। ওসামাকে থামিয়ে রাখা সহজ নয়। আর আমেরিকা কখনোই এ ধরনের ঘটনা চুপচাপ সহ্য করে না বা প্রতিক্রিয়া না দিয়ে বসে থাকে না।"

আমি তাদের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম, যখন জাপানি বিমানবাহিনী পার্ল হারবারে মার্কিন নৌবাহিনীর ওপর আকস্মিক হামলা চালিয়েছিল। সেই হামলায় আমেরিকানদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং তারা দ্রুত প্রতিশোধ নেয়। এক মুহূর্ত দেরি না করে আমেরিকা জাপানে দুটি পারমাণবিক বোমা ফেলে– 'লিটল বয়' ও 'ফ্যাট ম্যান' –যার ফলে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ আগুনে পুড়ে মারা যায়।

আমি বলেছিলাম, আমেরিকা আমাদের দেশেও তেমনই কঠিন হামলা চালাবে। ইসলামি আমিরাত আফগানিস্তান আগে থেকেই আমেরিকার চোখে গা-জ্বালানো ছিল, এখন সারা বিশ্বও আমেরিকার পাশে দাঁড়াবে। এটাই ছিল আমার কান্নার কারণ।

কিন্তু আমার সঙ্গে থাকা লোকজন আমার দুশ্চিন্তা ভাগ করে নেয়নি। তারা বলেছিল, আমি যা বলছি তার বেশিরভাগই ভুল। তারা আমাকে একটি পশতুন প্রবাদ শোনাল, "দেখো, হামলা কোথায় হয়েছে আর যুদ্ধ কোথায় চলছে।" তাদের বিশ্বাস ছিল, আমেরিকা অনেক দূরে, তারা কিছুই করতে পারবে না।

আমি চুপচাপ নিজ বাড়িতে ফিরে এলাম–মনভরে উদ্বেগ নিয়ে, সামনের মাসগুলোতে কী ঘটতে যাচ্ছে তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে।

*****

বাড়ি ফিরে আমি দূতাবাসের রাজনৈতিক বিষয়ক প্রধান সোহেল শাহীনকে ফোন করলাম। আমরা কী ঘটেছে এবং সংবাদমাধ্যমের সামনে কী অবস্থান নেওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনা করলাম। একমত হলাম যে, পরদিন সকালে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দেওয়া হবে। অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল, আমি উপরের তলায় ঘুমাতে গেলাম। কিন্তু আমার উদ্বেগ আমাকে ঘুমাতে দিচ্ছিল না। কিছু মাস আগে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কথা বারবার মনে পড়ছিল–তারা তখন বলছিল, আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর বড় ধরনের একটি হামলা আসতে পারে, কিন্তু তখন আমি সেটি বিশ্বাস করিনি।

সেই দিনের কথাগুলো বারবার মনে পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তবু ঘুম আসছিল না। রাত একটা বাজে, আমি ছাদের দিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময় হঠাৎ আমার ফোন বেজে উঠল। ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে কান্দাহারের ইসলামি আমিরাতের দপ্তর থেকে তৈয়ব আগা আমাকে শুভেচ্ছা জানালেন এবং বললেন, আমিরুল মোমিনিন মৌলভী মোহাম্মদ ওমর সাহেব আমার সঙ্গে কথা বলতে চান। বোঝা যাচ্ছিল, তারাও কিছু ঘণ্টা আগের ঘটনাগুলো নিয়ে উদ্বিগ্ন ও নির্ঘুম ছিলেন। তৈয়ব আগা আমাকে মৌলভী সাহেবের সঙ্গে সংযুক্ত করলেন। সংক্ষিপ্ত কুশল বিনিময়ের পর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই হামলা সম্পর্কে আমি কী জেনেছি। আমি তাকে যা দেখেছি তা বললাম এবং আমার আশঙ্কাগুলোও তার সঙ্গে ভাগ করলাম।

মৌলভী মোহাম্মদ ওমর জানালেন, ইসলামি আমিরাত জনসমক্ষে কী ধরনের আনুষ্ঠানিক অবস্থান নেবে। আমাদের কথোপকথন আরও প্রায় পনেরো মিনিট চলল, তারপর আমি আবার বিছানায় ফিরে গেলাম।

পরদিন সকালেই আমি দূতাবাসে পৌঁছে মনিটরিং টিমকে নির্দেশ দিলাম যেন টেলিভিশনে সংবাদ সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করে। পাকিস্তানের প্রধান ইংরেজি পত্রিকা ডন এবং দ্য নেশন যুক্তরাষ্ট্রে হামলার বিষয়ে সারা বিশ্বের প্রতিক্রিয়া নিয়ে নানা প্রতিবেদন ছাপিয়েছে।

আমি সকাল দশটায় এক সংবাদ সম্মেলনের ডাক দিলাম। সংবাদ সম্মেলনের ঠিক আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াকিল আহমদ মততওয়াকিল আমাকে ফোন করে জানালেন, আফগানিস্তান এবং বিদেশে কর্মরত তার প্রতিনিধিরা এই বিষয়ে কী ধরনের আনুষ্ঠানিক অবস্থান নেবে।

আমরা একটি সংক্ষিপ্ত প্রেস বিবৃতি প্রকাশ করলাম:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

আমরা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং পেন্টাগনে যা ঘটেছে, তা শক্তভাবে নিন্দা জানাই। এসব ঘটনায় যারা তাদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন, আমরা তাদের দুঃখ ও শোকের ভাগীদার। যারা এই ঘটনার জন্য দায়ী, তাদের অবশ্যই বিচারের মুখোমুখি করতে হবে। আমরা চাই তারা ন্যায়ের মুখোমুখি হোক এবং আমরা চাই আমেরিকা ধৈর্য ও বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করুক।

আমরা বিবৃতির একটি কপি ইসলামাবাদে মার্কিন দূতাবাসে পাঠালাম, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ভয়ের সেই মুহূর্তে আমেরিকা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল এবং প্রতিশোধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

*****

এরপর পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে পাল্টে গেল, বিশেষ করে যখন হামলার দুদিন পর জর্জ বুশ টেলিভিশনে হাজির হলেন–রাগে ও ঘৃণায় পরিপূর্ণ মুখভঙ্গি নিয়ে। তিনি আতঙ্কিত দেখাচ্ছিলেন, গায়ে বুলেটপ্রুফ ভেস্ট, যেন একজন সৈনিক। কোনো নির্ভরযোগ্য তদন্ত রিপোর্টের অপেক্ষা না করেই তিনি ঘোষণা দিলেন যে ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার জন্য ওসামা বিন লাদেন দায়ী। ওসামা বিন লাদেনকে, তিনি বললেন, "মৃত অথবা জীবিত অবস্থায়" ধরা হবে। ইসলামি আমিরাত আফগানিস্তান তাকে আশ্রয় দিচ্ছে, সুতরাং এই অপরাধে তারা জড়িত ও দায়ী।

দুই দিন পরে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মততওয়াকিল এই বিবৃতির প্রতিবাদ জানালেন, কিন্তু আমেরিকায় আরও একটি সম্ভাব্য হামলার আশঙ্কা তখনও বিরাজমান। প্রেসিডেন্ট বুশ আকাশে আশ্রিত এক শরণার্থী হয়ে গিয়েছিলেন–এয়ার ফোর্স ওয়ান-এ চড়ে সারা আমেরিকা চক্কর দিচ্ছিলেন, নামার মতো জায়গা পাচ্ছিলেন না। তার বিমান শুধু জরুরি বৈঠক বা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার সময় কোথাও নামত। সেসব বৈঠকের স্থান গোপন রাখা হতো এবং মার্কিন নিরাপত্তা বাহিনী সেগুলোর কঠোর পাহারা দিত। প্রতিবার তিনি জনসমক্ষে আসতেন, তাকে দেখে মনে হতো যেন তিনি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন।

আফগানিস্তানের পরিস্থিতি দ্রুত খারাপ হতে থাকল, বিশেষ করে যখন জাতিসংঘ আমেরিকাকে সমর্থন জানাল এবং আফগানিস্তানকে নির্দেশ দিল যে ওসামা বিন লাদেনকে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতে হবে।

মুসলিম বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্রের ক্রোধে ছিন্নভিন্ন হয়ে ছিটকে পড়ল—কেউই বিস্তারিত কিছু না জেনে একপাশে সরে গেল, যেন কেয়ামত এসে গেছে। পুরো বিশ্ব আমেরিকার পেছনে সারিবদ্ধ হলো, আর আফগানিস্তান হয়ে উঠল দিন দিন আরও নিঃসঙ্গ। তবে ইসলামি আমিরাত আফগানিস্তান তাদের নীতি পরিবর্তন করল না, যদিও তাদেরই হামলার জন্য দায়ী করা হচ্ছিল। তারা আগের মতোই সন্দেহ প্রকাশ করল এবং যথেষ্ট প্রমাণের অভাবের দিকে ইঙ্গিত করল, যেমনটি তারা নাইরোবি ও দার এস সালাম বিস্ফোরণের পরেও করেছিল।

আফগানিস্তানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরও কঠোর হয়ে গেল, আর সম্ভাব্য যুদ্ধের গুজব প্রতিদিন জোরালো হতে থাকল। আমেরিকা বিশ্বের নানা দেশে প্রতিনিধিদল পাঠাতে শুরু করল সমর্থন চাইতে। ইসলামাবাদেও একাধিকবার প্রতিনিধি পাঠানো হলো পাকিস্তানের সমর্থন লাভের জন্য। তবে তারা আফগানিস্তানের সঙ্গে কোনো আলোচনায় গেল না, বরং যুদ্ধের আগের মাসগুলোতে আফগানিস্তানকে একঘরে করে রাখল।

আমেরিকার দাবির তালিকা প্রতিদিন দীর্ঘ হতে থাকল। প্রথমে ওসামা বিন লাদেনকে হস্তান্তরের আহ্বান জানানো হয়েছিল, কিন্তু এরপর তারা আরও দাবি যোগ করল—একটি ব্যাপকভিত্তিক গণতান্ত্রিক সরকার গঠন, মানবাধিকার, নারীর অধিকার এবং মার্কিন সেনাদের যে কোনো জায়গায় অনুসন্ধান চালানোর পূর্ণ স্বাধীনতা।

আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করছিলাম রাজনৈতিক উপায়ে এই বিরোধ মীমাংসা করতে—সংলাপ ও আলোচনার মাধ্যমে যুদ্ধ এড়ানোর আশা নিয়ে। আমার কাছে প্রেসিডেন্ট বুশ ও হোয়াইট হাউসের ব্যক্তিগত ইমেইল ঠিকানা ছিল, কারণ আমি অতীতে তাকে চিঠি লিখেছিলাম। তখন আমি তাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়লাভের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছিলাম। তবে এর মানে এই নয় যে আমি তার জয়ে আনন্দিত হয়েছিলাম। মনে আছে, আমি তখন নিজেকেই প্রশ্ন করেছিলাম—একজন মানুষের যিনি ইসলামী ও রাজনৈতিক দিক থেকে প্রশ্নবিদ্ধ, তাকে অভিনন্দন জানানোর কী প্রয়োজন?

তবুও, ১১ সেপ্টেম্বরের পর আমি আবারও হোয়াইট হাউস ও প্রেসিডেন্ট বুশের সঙ্গে সংলাপ শুরুর চেষ্টা করলাম—আশা করছিলাম, এই যোগাযোগ যুদ্ধ এড়াতে সহায়ক হবে। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনই আমেরিকার আফগানিস্তান নীতির ধারা নির্ধারণ করেছিলেন—তিনি ক্রুজ মিসাইল পাঠিয়েছিলেন ও আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন।

আমি আবারও প্রেসিডেন্ট বুশ ও হোয়াইট হাউসের উদ্দেশ্যে আফগান জনগণের পক্ষ থেকে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখলাম, যেখানে বর্ণনা করলাম আমাদের অভাব-অনটন, খরা, শরণার্থী সংকট... আমি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করলাম যুদ্ধ কীভাবে আফগান সমাজকে ধ্বংস করেছে, কীভাবে দেশে নানা শত্রু তৈরি হয়েছে, বিভাজন ও অরাজকতায় কতজন প্রাণ হারিয়েছে। আমি তাকে সাবধান হতে বললাম, যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি বিবেচনা করতে বললাম এবং অতীতের ভুল না করার আহ্বান জানালাম। আমি লিখলাম, যদি তারা এই পথেই এগোয়, তবে এর ফলাফলের জন্য শুধু আমেরিকাই দায়ী থাকবে।

আমি লিখলাম:

"এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে আমেরিকা এখন বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি, যেমনটি নিয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে আফগানিস্তান গত দুই দশকের যুদ্ধে সব কিছু হারিয়েছে। আমাদের আর কোনো শক্তি নেই–অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক–এমনকি আমাদের সেনাবাহিনীও দেশের পূর্বাঞ্চলের আইনহীন প্রদেশগুলো সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে, আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধ করাটা তো অসম্ভব। আফগানিস্তান জিহাদ ও গৃহযুদ্ধের সময়েই যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছে। আমরা আর যুদ্ধ চাই না, আমাদের সেই ক্ষমতাও নেই।"

সবকিছু বিবেচনা করে, আমি তাকে বলেছিলাম যুদ্ধ নয়–আলোচনা ও সংলাপই হোক সমাধান। চিঠির একটি কপি আমি ইসলামাবাদে মার্কিন দূতাবাস এবং মার্কিন কংগ্রেসের সদস্যদের কাছেও পাঠিয়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম, তারা যেন উপলব্ধি করে যে, একটি সামরিক সমাধান কতটা ভয়াবহ পরিণতি আনতে পারে–উভয় দেশের জন্যই।

একই সময় আমি প্রেসিডেন্ট বুশের আফগান বংশোদ্ভূত উপদেষ্টা জালমাই খলিলজাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করি। আমি তাকে বলেছিলাম, একজন আফগান হিসেবে তিনি যেন সহায়তা করেন এবং এই বিরোধ যেন যুদ্ধ পর্যন্ত না গড়ায়, সেজন্য সব রকম চেষ্টা করেন। আমি তাকে জালালাবাদ থেকে ফোন করতাম, ইসলামাবাদ থেকে নয়–যাতে পাকিস্তান আমাদের কথোপকথন শুনতে না পারে। আমি তাকে বলেছিলাম, আমেরিকার উচিত সরাসরি আফগানিস্তানের সঙ্গে কথা বলা, পাকিস্তানকে নয়। তালেবান পাকিস্তানের কথা শোনে না, পাকিস্তানের সিদ্ধান্ত মানেও না। পাকিস্তান মধ্যস্থতা করেও আফগানিস্তান বা আমেরিকার স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে না। কিন্তু প্রেসিডেন্ট বুশ অহঙ্কারে অটল ছিলেন, যুক্তি শোনেননি।

পাকিস্তানের একনায়ক শাসক বুশের প্রতি শতভাগ অনুগত হলেও, ইসলামাবাদে আমাদের দূতাবাস তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করা হয়নি। মুশাররফ চাইলেই হামলার দিনই দূতাবাস বন্ধ করে দিতে পারতেন, কিন্তু জাতিসংঘ এমনকি যুক্তরাষ্ট্রও তখনই আফগানিস্তানের সঙ্গে সংযোগের একমাত্র পথ বন্ধ করতে চায়নি। তবে পাকিস্তানও আমাদের বলেছিল ওসামাকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।

আমি কিছুদিন আগে মুশাররফের আত্মজীবনী পড়েছি, যেখানে তিনি নিজেকে একজন সাহসী ব্যক্তি, বীর সেনানায়ক হিসেবে তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন, তিনি আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পান না এবং আল্লাহ ছাড়া কেউ তাকে হত্যা করতে পারবে না। এখানে সমালোচনার খুব বেশি কিছু নেই–একজন মুসলিমের উচিত আল্লাহর ওপর আস্থা রাখা এবং জানা যে জীবন ও মৃত্যু শুধুই আল্লাহর হাতে।

তবে তার বইয়ে তিনি লিখেছেন, হামলার পর প্রেসিডেন্ট বুশ তাকে হুমকি দিয়েছিলেন। মুশাররফের বর্ণনা অনুযায়ী, যদি পাকিস্তান সহযোগিতা না করে, তবে তাকে "পাথরের যুগে" ফেরত পাঠানো হবে। বুশের হুমকি ছিল–তোমরা আমাদের সঙ্গে, না আমাদের বিরুদ্ধে, তা পরিষ্কার করো। এই হুমকির ফলে, মুশাররফ লিখেছেন,

তিনি আমেরিকাকে পাকিস্তানের ঘাঁটিগুলো ব্যবহারের অনুমতি দেন, যেখান থেকে তারা আফগানিস্তানের পবিত্র ভূমিতে বোমা নিক্ষেপ করতে পারল এবং আমাদের মানুষদের ঘরবাড়িকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে পারল।

একজন মানুষ, যিনি বলেন আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পান না, তিনি কিভাবে বুশের হুমকিতে মাথানত করেন–যখন তার চোখের সামনে আফগান সরকারের পতনের ষড়যন্ত্র চলছে এবং আফগান নারীদের, শিশুদের ও বৃদ্ধদের লক্ষ্য করে বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হচ্ছে?

আমেরিকার হামলার কয়েক মাস আগে আইএসআই আমাকে একাধিকবার যোগাযোগ করে। একবার দুজন আইএসআই অফিসার দূতাবাসে এলেন। তারা জানতে চাইলেন, ইসলামি আমিরাত আফগানিস্তানের সরকারে বিভিন্ন রাজনৈতিক পদে কারা রয়েছেন। আমি জানতাম তারা আসলে কী জানতে চাচ্ছে, তাই আমি আফগান প্রশাসনের একটি সাংগঠনিক কাঠামো তাদের দিলাম, এমনভাবে যেন বোঝাই আমি সামরিক বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ নই। তারা সন্দেহ প্রকাশ করল এবং সামরিক বিষয়ের ওপর আরও প্রশ্ন করতে লাগল, কিন্তু আমি তাদের আশ্বস্ত করলাম, এই বিষয়ে আমি উপযুক্ত ব্যক্তি নই।

আরেকবার আইএসআই আমাকে তাদের কেন্দ্রীয় দপ্তরে যেতে বলল। আমি বললাম, যেতে পারব না, তবে যদি দরকার হয়, আমি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত আছি–সেখানে আমরা যে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারি। এরপর তারা আরও একধাপ এগিয়ে বলল, আমাকে তাদের গেস্টহাউসে যেতে হবে। আমি আবারও অস্বীকৃতি জানালাম। অবশেষে জেনারেল মাহমুদ, জেনারেল জেলানী এবং ব্রিগেডিয়ার ফারুক আমার বাড়িতে এলেন–মাহমুদও তাদের সঙ্গে ছিলেন–আর আমি তাদের স্বাগত জানালাম।

তারা বিনয়ের ভাষায় কথা বলার মতো মেজাজে ছিলেন না।
জেনারেল মাহমুদ বললেন:
"আমরা জানি আপনি জানেন সামনে কী ঘটতে যাচ্ছে। আর এটাও জানি আপনি বিশ্বাস করেন পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও আমেরিকার সঙ্গে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যাবে। হয়ত আপনি ভাবছেন এটা ইসলাম বা প্রতিবেশী সম্পর্কের বিরুদ্ধে কাজ হবে, আর সেই কারণেই আপনি আমাদের অফিসে আসতে চাননি। আজ আমরা আপনাকে দুটো কথা জানাতে এসেছি: প্রথমত, আমাদের কাছে খবর আছে যে আপনি প্রেসিডেন্ট মুশাররফকে হত্যার পরিকল্পনা করছেন। এমন কোনো পরিকল্পনা থাকলে তা সফল হবে না এবং আমি জোর দিয়ে বলছি, এই ধরনের কাজ যদি থেকে থাকে, তাহলে অবিলম্বে বন্ধ করুন। দ্বিতীয়ত, আমরা দুজনই জানি আমেরিকা থেকে আফগানিস্তানে আক্রমণ এখন অনিবার্য। আমরা আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই–এই জিহাদে আপনি একা নন, আমরা আপনার সঙ্গে থাকব।"

আমি ধৈর্য ধরে তাদের কথা শুনলাম এবং তারা কথা শেষ করার পর শান্তভাবে জবাব দিলাম। আমি বললাম, "যদি কেউ মোশাররফকে হত্যার পরিকল্পনা করে থাকে, তবে সেটা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার–আমার কোনো দায় নেই তাতে। আমার তো এমন কোনো সুযোগ-সুবিধাও নেই যে আমি তাকে হত্যা করতে পারি।"

একটু বিদ্রুপাত্মক সুরে আমি বললাম, “এই ধরনের পরিকল্পনায় আপনারা ইসলামি আমিরাতকে জড়াবেন না, দয়া করে।”

“দ্বিতীয়ত,” আমি বললাম, “যদি আমেরিকা আফগানিস্তানে হামলা করে, তবে আপনারাই ভালো জানেন তারা কোন বিমানঘাঁটি ও কোন ভূখণ্ড থেকে আমাদের উপর আঘাত হানবে। আমরা পরে দেখব কতজন আফগান এই যুদ্ধে শহীদ হয়। কিন্তু, জেনারেল সাহেব, যখন আপনি আমেরিকার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন, তখন এই রক্তপাত এবং হত্যাকাণ্ডের দায় আপনাকে নিতে হবে–এই দুনিয়াতেও, পরকালেও। আপনি আফগানিস্তানের শত্রু নম্বর এক হবেন।”

আমি তখনও কথা বলছিলাম, এমন সময় জেনারেল জেলানী আমার কথা কেটে দিয়ে চিৎকার শুরু করলেন। তবুও আমি থামলাম না, বরং মাহমুদের দিকে ফিরে বললাম, “একটু অপেক্ষা করুন, জেনারেল! আপনি জিহাদের কথা বলছেন, অথচ আপনার বিমানঘাঁটিতে আমেরিকান সেনারা অবস্থান করছে, আপনার আকাশপথ ব্যবহার করে তারা আফগানিস্তানে হামলা চালাচ্ছে, এবং এই হামলার গোয়েন্দা তথ্য আপনারাই দিচ্ছেন। আপনি কীভাবে জিহাদের কথা মুখে আনেন? আপনাদের কি আল্লাহর ভয় নেই? কেন আপনারা আফগানদের জিহাদে ঠেলে দিচ্ছেন? নিজের দেশে কেন জিহাদ শুরু করছেন না? জিহাদ কি শুধুই আফগানদের দায়িত্ব? জেনারেল! দয়া করে আমাকে এমন একটা কিছুর সমর্থনের কথা বলবেন না, যার বিরুদ্ধে আপনারাই অবস্থান করছেন!”

আমি তখন খুব আবেগপ্রবণ হয়ে গিয়েছিলাম এবং রাগের বশে কথাগুলো বলছিলাম। যখন আমি জেনারেল মাহমুদের দিকে তাকালাম, দেখলাম তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াচ্ছে। জেলানী কাঁদছিলেন জোরে, আমার গলায় হাত রেখে যেন এক নারীর মতো করে কান্না করছিলেন। আমি তাদের এই প্রতিক্রিয়ায় খুবই হতবাক হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পর তারা ক্ষমা চেয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

পাকিস্তান তখন দ্বৈত সংকেত পাঠাচ্ছিল। একদিকে জেনারেল মাহমুদ আমাকে বলছিলেন যে হামলা শীঘ্রই হবে, আর অন্যদিকে পাকিস্তানের কনসুলেট কান্দাহারে আমাদের আশ্বস্ত করছিল যে আমেরিকা কখনো আফগানিস্তানে হামলা চালাবে না। তারা বলছিল, যুদ্ধের গুজব আর বুশের যুদ্ধংদেহী বক্তৃতাগুলো কেবল আমেরিকান জনগণের ক্রোধ প্রশমনের জন্য। তবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কিছু উচ্চপদস্থ মুসলিম কর্মকর্তা, যারা প্রেসিডেন্ট মোশাররফের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করতেন, আমাদের আরও বাস্তবধর্মী তথ্য দিতেন। পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কিছু কর্মকর্তার সঙ্গেও আমাদের যোগাযোগ ছিল।

সেই সময় আমি নানা মাধ্যমে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কার্যক্রম সম্পর্কে যতটা সম্ভব তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছিলাম। একবার আমি পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন যোগাযোগের মাধ্যমে মোশাররফের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুরোধও করেছিলাম, কিন্তু তিনি সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন।

আমি আমেরিকার যুদ্ধ পরিকল্পনা এবং জোট গঠনের চেষ্টার কিছু তথ্য জানতে পারি, যা মোল্লা মোহাম্মদ ওমরকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। আমি শুনেছিলাম আমেরিকা ও পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থাগুলি যৌথভাবে এমন এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যাতে প্রথমেই মোল্লা ওমর ও ওসামা বিন লাদেনের আবাসস্থলে ক্রুজ মিসাইল হামলা চালিয়ে তাদের হত্যা করা হবে। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আমেরিকা ব্যাপক বিমান হামলা চালাবে এবং তারপর আফগান মিত্রদের মাধ্যমে স্থল অভিযান চালানো হবে, যাদের অর্থ, অস্ত্র ও তথ্যসহায়তা দেবে যুক্তরাষ্ট্র।

আমাদের শত্রুরা আমাদের পরিচিত ছিল এবং আমেরিকার অভিযান বাস্তবায়নের জন্য তাদের উপরই নির্ভর করছিল। পূর্বাঞ্চলে আমেরিকার মিত্র ছিলেন আবদুল হক ও মালিক জারিন–প্রথমজন নানগারহারের একজন প্রখ্যাত মুজাহিদ ও তালেবানবিরোধী নেতা, দ্বিতীয়জন কুনারের একজন প্রভাবশালী কমান্ডার। দক্ষিণ-পূর্বে পদশাহ খান জাদরান ও কিছু ছোটখাটো নেতা ছিল, আর দক্ষিণে ছিল হামিদ কারজাই, গুল আগা শিরজাই, হামিদ আগা ও অন্যান্যরা। কেবল দক্ষিণ-পশ্চিমে আমেরিকা ও পাকিস্তান মিত্র খুঁজে পায়নি।

আমি কান্দাহারে মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম এবং গত কয়েক সপ্তাহে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছি, সেগুলো তাঁর সামনে পেশ করলাম। তিনি আমার বলা তথ্যগুলো বিশ্বাস করতে চাইলেন না। তিনি যুক্তি দিলেন, আমেরিকা যথেষ্ট কারণ ছাড়া আক্রমণ চালাবে না। যেহেতু তিনি আমেরিকার কাছে আনুষ্ঠানিক তদন্ত ও ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ চেয়েছেন, তাই প্রমাণ ছাড়া কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না।

ওমরের বিশ্বাস ছিল, আমেরিকা হামলা চালাবে এমন সম্ভাবনা ১০ শতাংশেরও কম। কিন্তু আমি বললাম, আমি প্রায় নিশ্চিত যে যুদ্ধ অনিবার্য। পাকিস্তান ও আমেরিকার মধ্যে একটি চূড়ান্ত সমঝোতা হতে চলেছে, যা আফগানিস্তানের পরিণতি নির্ধারণ করবে।

পাকিস্তান তখন কমিউনিস্ট জেনারেল ও প্রাক্তন মুজাহিদিন কমান্ডারদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করছিল, আর আইএসআই আমেরিকাকে সম্ভাব্য মিত্রদের সঙ্গে সংযুক্ত করছিল। আমেরিকা সেই কমান্ডারদের অর্থ দিয়ে, স্যাটেলাইট ফোনসহ নানা সম্পদ দিয়ে সহযোগিতা করছিল। এমনকি ইসলামাবাদে আফগান দূতাবাসের কিছু কর্মীকেও অর্থ দেওয়া হচ্ছিল গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের জন্য।

এই পরিস্থিতি পাকিস্তানের জন্য ছিল এক আশীর্বাদ, কারণ তারা খোলা হাতে আমেরিকার সহায়তা গ্রহণ করছিল। পাকিস্তান সিন্ধ ও বেলুচিস্তানে সামরিক ঘাঁটি প্রদান করেছিল, যেখানে বিপুল অস্ত্র ও গোলাবারুদ মজুত করা হচ্ছিল। পাকিস্তান ও আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থাগুলি আফগান সামরিক বাহিনী ও বিমানঘাঁটির নেতাদের সম্পর্কেও তথ্য আদান-প্রদান করছিল।

তবে আইএসআই-এর ছিল তাদের নিজস্ব গোপন পরিকল্পনা–আফগানিস্তানে প্রভাব বিস্তারের জন্য তারা ৮০-র দশকে সক্রিয় কিন্তু বর্তমানে নিষ্ক্রিয় জিহাদি কমান্ডারদের পুনর্গঠনের চেষ্টা করছিল। একই সঙ্গে, তারা তালেবান

প্রশাসনের অভ্যন্তরে নিজেদের অনুগত কমান্ডারদের বসাচ্ছিল, যাতে ভবিষ্যতে সরকার পতনে তাদের ব্যবহার করা যায়। এছাড়াও, তারা গোপনে নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের সঙ্গেও বৈঠক করছিল আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ সরকারব্যবস্থা নিয়ে।

সব কিছু মিলিয়ে আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম, যুদ্ধ আর এড়ানো যাবে না। পাকিস্তান, একসময় আমাদের ভাই, এখন আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের অধিকাংশ দেশ প্রেসিডেন্ট বুশের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমেরিকার পাশে দাঁড়িয়েছে। আমি বুঝতে পারছিলাম, শান্তির দিনগুলো শেষ হয়ে এসেছে এবং ইসলামি আমিরাত আফগানিস্তানকে টিকে থাকতে হলে এক বিশাল ও শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামে নামতে হবে।

*****

এটি ছিল অক্টোবরের একটি সকাল, যখন আমাকে উচ্চপদস্থ পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ জানাল যে রাতেই আগ্রাসন শুরু হবে। আমেরিকান সেনারা ইতিমধ্যে পাকিস্তানের সামরিক বিমানঘাঁটিতে মোতায়েন হয়েছে, তাদের বিমান আমাদের আকাশসীমায় টহল দিচ্ছে। একটি মার্কিন রণতরী, শত শত জেট ও ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রসহ, পারস্য উপসাগরে নোঙর ফেলেছে। তাদের কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত গোয়েন্দা ড্রোন আফগানিস্তানের ওপর গুপ্তচরবৃত্তি করছিল; একটি ড্রোন ইতিমধ্যেই মাজার-ই-শরীফে ভেঙে পড়েছিল।

পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতও পারভেজ মুশাররফকে একটি গোপন নথি হস্তান্তর করেন, যাতে ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার প্রমাণ এবং তালেবান সরকারের আল-কায়েদার সঙ্গে কথিত সংশ্লিষ্টতা দেখানো হয়েছিল, যেন মুশাররফ তার সরকারের আমেরিকার সঙ্গে সহযোগিতার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে পারেন। কিন্তু কেন এই তথাকথিত প্রমাণ আফগানিস্তানের পরিবর্তে পাকিস্তানকে দেওয়া হলো, তা এক রহস্যই রয়ে গেল–বিশেষত যখন আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে এ ধরনের প্রমাণ চেয়েছিলাম। বাস্তবে, এগুলো ছিল এক আরব বন্দির, আলী নামের, পুরনো স্বীকারোক্তি। তাকে দার এস সালাম হামলার সঙ্গে জড়িত বলা হয়েছিল, কিন্তু পরে তাকে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং রাসায়নিক ইনজেকশন দিয়ে পাগল করে ফেলা হয় যাতে সে আর বাস্তব জগতে ফিরতে না পারে। এই ঘটনাটি মুশাররফের জন্য গুরুতর বিব্রতকর ছিল, এবং তার সুনাম আরও ক্ষুণ্ণ হয়।

আমি এই তথ্য আমার সদর দপ্তরে পাঠিয়ে বললাম, যেন সবাই রাতের আগ্রাসনের জন্য প্রস্তুত থাকে।

দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এলো, আমি স্নায়ুচাপে ভুগছিলাম, খবর জানার জন্য উদগ্রীব ছিলাম। রাত ১০টার দিকে কান্দাহার কর্পসের সেনাপতি মোল্লা আখতার মোহাম্মদ উসমানী (বর্তমানে মৃত) আমাকে ফোন করলেন। তিনি জানালেন, "এই মুহূর্তে কান্দাহার বিমানঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হচ্ছে।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আমিরুল মুমিনীনকে জানানো হয়েছে?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তাকে জানানো হয়েছে।" এরপর বললেন, "অপেক্ষা করুন,

আরও ক্ষেপণাস্ত্র নামছে আমিরুল মুমিনীনের বাড়ির ওপর!" তিনি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তখনই ফোন লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। আমার সবচেয়ে বড় চিন্তা ছিল, যদি মোল্লা মোহাম্মদ ওমর নিহত হন! তাকে কিছু পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ আশ্বস্ত করেছিল যে কোনো হামলা হবে না, ফলে হয়ত তিনি আমাদের তথ্য গুরুত্ব সহকারে নেননি। বাস্তবে, এ ছিল না কোনো সত্যিকারের আশ্বাস—বরং তাকে অন্ধকারে রাখার একটি ষড়যন্ত্র।

এমন সময় আবার ফোন বেজে উঠল—এবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের যোগাযোগ বিভাগ থেকে। তিনি বললেন, "কাবুল বিমানঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু হয়েছে।" এরপর তিনি আমাকে মন্ত্রী মোল্লা ওবায়দুল্লাহর সঙ্গে সংযুক্ত করলেন। আমি তাকে যুদ্ধ পরিকল্পনা দিয়েছিলাম এবং তিনি আমার পরামর্শ শুনতেন। আমি তাকে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে বললাম: "এখন আর নরম বিছানা আর বিলাসবহুল প্রাসাদের সময় নয়। নিরাপদে সরে যান। আল্লাহ কী ইচ্ছা করেন, তা দেখা যাবে।" তারপর আমি ফোন কেটে দিলাম।

একটু সময় আমি চুপচাপ বসে রইলাম, মাথা দু' হাতের মধ্যে, ভাবতে লাগলাম কী হবে। কতদিন আফগানিস্তান আবার এই আগুনে পুড়বে? কিন্তু আমি নিজেকে একটি পুরোনো প্রবাদ দিয়ে সান্ত্বনা দিলাম—যদি তুমি পিছুটান দাও, তবে সব হারাও। নিজেকে বললাম, এই সময়ে দুশ্চিন্তা করে কিছু হবে না। বরং কাজ করাই ভালো।

ফোন একের পর এক বেজে চলেছে। সবাই উত্তর চাইছে, সাংবাদিকরাও চাইছে, কিন্তু আমি ফোন ধরলাম না। আমি শাহীনকে ফোন করে বললাম, "শুরু হয়ে গেছে। সাংবাদিকদের ডেকে নাও, একবারেই সব সামলানো যাবে।" সেদিন রাতে, আমি আমার বাগানে মধ্যরাতে এক সংবাদ সম্মেলন করলাম।

এভাবেই যুদ্ধ শুরু হলো।

*****

আক্রমণের আগে, আমার সঙ্গে দেখা করা আইএসআই কর্মকর্তাদের সবাইকে চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। জেনারেল জেলানিকে মাইওয়ালিতে বদলি করা হয়েছিল, আর জেনারেল মাহমুদের স্থানে আইএসআই প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেন জেনারেল ওমর। এর পর জেনারেল মাহমুদের কী হয়েছিল, তা আমি আর কোনোদিন জানতে পারিনি।

একটি শ্রেণিবদ্ধ (গোপন) প্রতিবেদনে বলা হয়, আইএসআই আফগানিস্তান সংক্রান্ত যেসব নথিপত্র আমেরিকানরা চেয়েছিল, সেগুলো পুড়িয়ে ফেলেছিল এবং তারা মোল্লা সাহেবকে জানিয়েছিল যে আমেরিকানদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে তাঁকে ও তালেবান নেতৃবৃন্দকে হত্যা করা। আইএসআই এমনকি তাঁকে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নিতে পরামর্শও দিয়েছিল।

অন্যদিকে, কিছু পাকিস্তানি কর্মকর্তা এই তথ্য উড়িয়ে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন যে আমেরিকা সামরিক চাপ বাড়াবে ঠিকই, তবে প্রকৃত কোনো হামলা বা আগ্রাসনের পরিকল্পনা নেই। মোল্লা মোহাম্মদ ওমর নিজের বাড়িতেই থেকে যান এবং ক্রমবর্ধমান ঝুঁকিকে উপেক্ষা করেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাকে আমেরিকার যুদ্ধের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলাম, মাঝে মাঝে মানচিত্র ও অন্য তথ্যপ্রমাণ দেখিয়েও বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কান্দাহার আমাদের রিপোর্টকে ভুল মনে করত। মোল্লা সাহেব বিশ্বাস করতেন, আমেরিকার আফগানিস্তান আক্রমণের পেছনে কোনো যৌক্তিক কারণ নেই, তাই হামলার সম্ভাবনাও তিনি নাকচ করে দিয়েছিলেন।

শত্রুতা শুরুর দু’ দিন পর জেনারেল ওমর আমাকে দেখতে আসেন। তার দুটি দাবি ছিল: প্রথমত, তিনি বললেন, তালেবানের একজন শীর্ষ নেতা ও প্রতিনিধি হিসেবে, আমি যেন “মৌলবাদী” তালেবানদের থেকে “মধ্যপন্থী” তালেবানদের আলাদা করতে সাহায্য করি। তিনি বলেন, এটি শেষ পর্যন্ত তালেবানেরই উপকারে আসবে এবং আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখবে। বাস্তবে, তার উদ্দেশ্য ছিল তালেবানদের ভেঙে নানা গোষ্ঠীতে ভাগ করা, যাতে তাদের দুর্বল করা যায়। আমাকে বলা হয়েছিল, আমি যেন “মধ্যপন্থী তালেবান” অংশের নেতৃত্ব দিই, আমীরুল মুমিনীন (মোল্লা ওমরের) বিরুদ্ধে। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তারা আমাকে আর্থিক ও লজিস্টিক সহায়তা দেবে।

এটিই সেই পরামর্শ, যা পরবর্তীতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামার প্রশাসন অনুসরণ করেছে। বুশ, তার ক্ষমতার সময়ে, ব্রিটেন এবং কারজাইকে সঙ্গে নিয়ে এই কৌশলটি সাত বছর ধরে প্রয়োগের চেষ্টা করেছিল। তারা মনে করে, তালেবান কেবল টাকা বা ক্ষমতার জন্য টিকে আছে–সুতরাং মনে করে, টাকা আর ক্ষমতা দিয়েই তাদের ধ্বংস করা সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে তালেবান আন্দোলন একটি ইসলামি মতাদর্শভিত্তিক সংগঠন, যারা ইত্তা’ আত (আনুগত্য), সাম’ আ (শ্রবণ), এবং সংলাপের নীতিতে অনুসৃত হয়ে পবিত্র জিহাদের পথে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের “মধ্যপন্থী” ও “চরমপন্থী” এই বিভক্তিকরণ একটি ব্যর্থ ও বেপরোয়া কল্পনা মাত্র।

দ্বিতীয়ত, তিনি আমাকে বললেন, আমি যেন গণমাধ্যমে কথা বলা থেকে বিরত থাকি এবং দূতাবাসে আর কোনো সংবাদ সম্মেলন না করি।

যদি কখনো কোনো বিবৃতি দিতে হয়, তবে আমাকে তা প্রথমে পাকিস্তান সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে, যেন তারা তা যাচাই করে এবং তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পাদনা করতে পারে। জেনারেল ওমর ও তার সঙ্গে থাকা লোকজন তাদের কথা শেষ করে চলে গেলেন। আমি কোনো জবাব দিইনি এবং নিজের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলাম। আমি বুঝতে পেরেছিলাম তারা আমাকে কী করতে বলেছে, কিন্তু বুঝতে পারিনি, তারা কীভাবে আমার নেতৃত্বে কোনো নতুন তালেবান গোষ্ঠী গঠন থেকে উপকার আশা করছিল, বা এর পরিণতি তালেবান ও মোল্লা সাহেবের জন্য কী হতে পারত। আমি সেই তথ্য নিজের মধ্যেই রেখেছিলাম।

*****

প্রতিদিন বিকেল ৪টায় আমি এক প্রেস কনফারেন্স করতাম, যাতে সারা দুনিয়াকে জানানো যায় আফগানিস্তানে কী ঘটছে। আমি সাধারণ পরিস্থিতি বা নির্দিষ্ট ঘটনাবলির উপর তথ্য উপস্থাপন করতাম এবং সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিতাম। প্রায়ই পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আজিজ খানের ফোন আসত–আমাকে চুপ থাকতে বলতেন।

বিকেল ৩টায় আমি সারা আফগানিস্তান থেকে তথ্য সংগ্রহ করতাম এবং ৩টা ৩০ মিনিটে তা প্রিন্ট করে ফেলতাম। আমি সেই রিপোর্টের একটি কপি আইএসআই এজেন্টকে দিতাম, কিন্তু সে এখনো নিজের অফিসে পৌঁছানোর আগেই আমি প্রেস কনফারেন্স শুরু করে দিতাম। এভাবে আমি তাদের কিছু করার আগেই সংবাদ ছড়িয়ে দিতে পারতাম।

আইএসআই আমাকে তিনবার আনুষ্ঠানিকভাবে সতর্ক করেছিল–তারা বলেছিল, তারা যখনই তথ্য পাচ্ছে, তখনই আমি তা সাংবাদিকদের জানিয়ে দিচ্ছি। আমি নানা অজুহাত দিতাম–বলতাম, আমি বিকেল ৩টায়ই মাত্র আফগানিস্তান থেকে রিপোর্ট পেয়েছি, এবং আমি তা শুধরে আধা ঘণ্টা পরে কপি পাঠাবো। আমি সময় বিলম্বের অজুহাত দিতাম–বলতাম, আমার তথ্য অসম্পূর্ণ ছিল, অনুবাদক আসেনি, টাইপিস্ট দেরি করেছে। এভাবে আমি তাদের সব সেন্সরের চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতাম।

নিরবিচারে হুমকি সত্ত্বেও আমি আমার কাজ চালিয়ে যেতাম। ৯ নভেম্বর, যখন মাজার-ই-শরিফ নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের হাতে পড়ে যায়, তখন আইএসআই আমাকে অনুরোধ করে যেন আমি প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোল্লা ওবায়দুল্লাহ এবং কান্দাহারের গভর্নর মোল্লা মোহাম্মদ হাসান আখুন্দের সাথে যোগাযোগ করি ও বলি যে তারা যেন পাকিস্তানে চলে আসে। আমি আইএসআই প্রতিনিধিকে বলেছিলাম, আমি তাদের শুধু ফোন করে পাকিস্তানে আসতে বলতে পারি না–তারা আমার চেয়ে উঁচু পদে আছেন। তাছাড়া, আমি তাদের পাকিস্তানে আসতে বলতে চাইনি, কারণ আমি বিশ্বাস করতাম, আইএসআই তাদের গ্রেপ্তার করতে চায়।

প্রতিমিনিটে তারা ফোন করে জিজ্ঞাসা করত, আমি কি মোল্লা ওবায়দুল্লাহ আখুন্দ বা মোল্লা মোহাম্মদ হাসান আখুন্দের সাথে কথা বলেছি কিনা। আমি বলতাম, হ্যাঁ, আমি তাদের সাথে কথা বলেছি এবং তাদের জানিয়েছি–যেই মুহূর্তে তারা পাকিস্তানের মাটিতে পা রাখবে, তখনই তাদের গ্রেপ্তার করা হবে। আমি পাকিস্তানের কোনো প্রতিশ্রুতির ওপর বিশ্বাস করতাম না। তখন ইসলামাবাদে কাজ করা ছিল খুব কঠিন–নিজের কাজ চালিয়ে যাওয়া, নিষিদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা এড়ানো এবং পরিচয়পত্র টিকে রাখার চেষ্টা–সব একসাথে করতে হতো।

আমি আমার বেশিরভাগ সময় ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ এবং আফগানিস্তান ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর নজর রেখে কাটাতাম। আইএসআইয়ের যে শেষ ব্যক্তির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, তিনি ছিলেন কর্নেল ইমাম। তিনি আফগানদের কাছে বহুল পরিচিত ছিলেন সোভিয়েতবিরোধী জিহাদের প্রথম বছরগুলো থেকে এবং তখন পাকিস্তানের হেরাতে অবস্থিত কনস্যুলেটে কর্মরত ছিলেন। আমেরিকার হামলার পর তাকে আফগানিস্তান থেকে

বহিষ্কার করা হয়। তালেবানরা তার ওপর বিশ্বাস করত না, এবং যদিও তিনি কান্দাহারে থাকার চেষ্টা করেছিলেন, তবু তাকে দেশ ছাড়তে হয়েছিল।

তিনি আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য সময় চাইলেন এবং আমরা দূতাবাসে সাক্ষাৎ করলাম। সালাম বিনিময়ের পর তিনি হঠাৎ কাঁদতে শুরু করলেন। চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল তার মুখ আর সাদা দাঁড়ির উপর দিয়ে। নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন, "সর্বশক্তিমান আল্লাহ আফগানিস্তানে কী ঘটবে তা নির্ধারণ করে থাকতে পারেন, কিন্তু পাকিস্তান দায়ী। কী পরিমাণ নিষ্ঠুরতা করেছে তারা নিজের প্রতিবেশীর উপর! আর কত আরও করবে!"

তিনি অভিযুক্ত করলেন মোশাররফকে, যিনি গত দুই দশকের সহযোগিতা, ত্যাগ ও বন্ধুত্বের অর্জনগুলো মুছে ফেলেছেন এবং জিহাদের গৌরবকে ধ্বংস করেছেন। পাকিস্তানকে এই লজ্জার ভার বইতে হবে—মোশাররফকে নয়। তিনি আবার কাঁদতে শুরু করলেন—বললেন, মোশাররফ যা করেছে, তার জন্য তারা কখনোই তওবা করতে পারবে না, এবং তারা এই অপরাধের দায়ভার বহন করবে শুধু এই দুনিয়ায় নয়, পরকালেও। এরপর তিনি সোজা চলে গেলেন, এবং আমি আর কোনো আইএসআই অফিসারের সাথে দেখা করিনি—যতক্ষণ না তারা আমাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছিল। তবে আমাকে নজরদারির মধ্যে রাখা হয়েছিল। তিনটি মোটরবাইক আর একটি গাড়ি দিনরাত দূতাবাস ও আমার বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকত।

এই ছিল পাকিস্তানের সরকার; তবে জনগণ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সারা দেশেই সহিংস মার্কিনবিরোধী বিক্ষোভ চলছিল এবং প্রতিদিন পুলিশের সাথে সংঘর্ষ হচ্ছিল; প্রতিদিনই মানুষ মারা যাচ্ছিল। পাকিস্তান সরকার বিক্ষোভ দমনে প্রাণপণ চেষ্টা করছিল। তারা বহু লোককে—ধর্মীয় নেতাদের সহ—কারাগারে পাঠিয়েছিল, কিন্তু তবুও বিক্ষোভ থামেনি, বরং আরও বেড়েই চলেছিল।

হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক আমাদের পাকিস্তান দূতাবাসে আসছিল আফগানিস্তানে যুদ্ধ করতে চেয়ে। আরও হাজার হাজার মানুষ বালুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (NWFP) দিয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশ করছিল, যোগ দিচ্ছিল একটি স্বেচ্ছাসেবক ব্রিগেডে—যার সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার—যারা মিরানশাহ দিয়ে দুরান্ড রেখা অতিক্রম করেছিল।

ইসলামাবাদ সরকার চেষ্টা করেছিল তাদের জনগণকে নিরুৎসাহিত করতে, কিন্তু পাকিস্তান তখন নিজেই দুলতে শুরু করেছিল ভিতর থেকে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল, যা সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। যখন আমি নিজেও স্বেচ্ছাসেবকদের ঢল দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তখন টেলিভিশনে এসে বলেছিলাম—মানুষ যেন আর আমাদের মাধ্যমে আফগানিস্তানে যেতে না চায়। আমি বলেছিলাম, এখন আমাদের প্রয়োজন একটি আর্থিক জিহাদ, শারীরিক জিহাদ নয়। কিন্তু তাও কাজ করেনি—মানুষ আসতেই থাকল, ইসলামি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে।

A HARD REALISATION

যুদ্ধের প্রথম দুই মাসে আমি চারবার টেলিভিশনে ভাষণ দিয়েছিলাম। প্রতিবারেই আমি একই মূল বার্তা দিতাম:

"আমার প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! আপনারা ভালো করেই জানেন, আমেরিকানরা আমাদের উপর দূর থেকে বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছে। একসঙ্গে বড় দলে জড়ো হওয়া কোনো উপকারে আসে না। এতে শুধু আপনারা বিমান হামলার ভালো লক্ষ্য হয়ে যান, এবং এর ফলে হতাহতের সংখ্যা বাড়ে। এতে উপকারের চেয়ে ক্ষতি বেশি হয়। তাই, আপাতত আমরা প্রচুর সংখ্যক লোক আফগানিস্তানে পাঠাতে চাই না, যাতে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি এড়ানো যায়। এর পরিবর্তে, আমাদের আর্থিক সহায়তা দরকার।"

আরব বিশ্ব এবং অন্যান্য ইসলামি দেশে আবেগ তুঙ্গে উঠেছিল। বহু মানুষ দূতাবাসে এসে আফগানিস্তানে যাওয়ার জন্য স্বেচ্ছাসেবী হচ্ছিলেন। আমরা সবাইকে নিরুৎসাহিত করলেও, হাজার হাজার মানুষ আমাদের সীমান্ত পেরিয়ে যাচ্ছিল। এমন অবস্থা হয়েছিল যে, আমি প্রতিদিন পাঁচ হাজার লোককে আফগানিস্তানে পাঠাতে পারতাম। লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিল।

যখন কোনো মুসলমান আমার কাছে এসে আফগানিস্তানে যাওয়ার অনুরোধ করতেন, আমি তাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে নিতাম এবং তার জীবন, আচার-আচরণ ও পেশা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম। শক্তপোক্ত, সুদর্শন তরুণেরা আসতেন। তারা আমার সাহায্য চাইতেন, কিন্তু তাদের হৃদয়ে কী ছিল? কোন আবেগ তাদের এখানে নিয়ে এসেছিল?

তাদের অন্য কোনো পথে নিতে বোঝানো আমার জন্য কঠিন ছিল, যাতে তাদের বিশ্বাসে আঘাত না লাগে। ইচ্ছে করত, যদি এমন একটি বাহিনী থাকত, যারা ইসলামের ও ইসলামী বিশ্বাসের পক্ষে লড়বে, যেখানে তাদের আবেগ বাস্তবায়িত হবে, আশা পূর্ণ হবে এবং যা সঠিক উদ্দেশ্যে নিয়োজিত থাকবে। দুঃখের বিষয়, আজ ইসলামী বিশ্বের বাহিনীই ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রথম দিককার আক্রমণের পরপরই মানুষ আমিরাতের জন্য অর্থ সংগ্রহ শুরু করেছিল। পাকিস্তানের প্রতিটি শহরে অনুদান সংগ্রহ চলছিল; কেউ সরাসরি আফগানিস্তানে আনছিল, আবার কেউ কেউ করাচি, কোয়েটা, লাহোর ও পেশোয়ারে আমাদের অফিসে দিচ্ছিল। প্রচুর অর্থ জমা হচ্ছিল। আমরা যে অর্থ গ্রহণ করছিলাম, তার জন্য রসিদ দিতাম যাতে লেখা থাকত অর্থটি কিসের জন্য: শিক্ষা, শরণার্থী অথবা এতিমদের জন্য। যেটাই অনুদান আসত, সেটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো। কেউ আমাদের একশো পাকিস্তানি রুপি দিত, কেউবা দশ লক্ষ। আমাদের কাছে সব সমান ছিল। সবাই তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দিত, নিঃস্বার্থভাবে এবং সংহতির চেতনা থেকে। বহু মুসলিম বোন তাদের গয়না ও অন্যান্য সম্পদ দান করতেন। কেজির পর কেজি সোনা আমরা সংগ্রহ করেছিলাম। কিছুদিন পর আমরা কম্বল, জুতো এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও দূতাবাসে জমা করতে শুরু করি। আমি এখনও আমাদের মুসলিম ভাইদের সেই উদ্দীপনা ও সাহায্যের আকাঙ্ক্ষা স্মরণ করি।

এক সকালে, একজন যুবক আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন এবং আমি তাকে আমার অফিসে আমন্ত্রণ জানালাম। তিনি ছিলেন এক তরুণ পশতুন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (NWFP) থেকে। আমি তাকে বসতে বললাম, কিন্তু তিনি জানালেন যে তার স্ত্রীও তার সঙ্গে এসেছেন এবং তিনিও আমার সঙ্গে কথা বলতে চান। আমি রাজি হলাম, এবং কয়েক মিনিট পর তিনি স্ত্রীকে নিয়ে এলেন, যিনি বোরকা পরা ছিলেন। তিনি খুব ভদ্রভাবে "আসসালামু আলাইকুম" বললেন। যদিও আমি তার মুখ দেখতে পাইনি, কিন্তু কণ্ঠস্বরেই বুঝতে পারলাম যে তিনি কাঁদছিলেন।

তিনি বললেন, "অ্যাম্বাসাডর সাহেব, আমার বাড়িতে অনেক সম্পদ আছে যা আমি আল্লাহর রাস্তায় দিতে পারি। কিন্তু আমি মাওলানাদের কাছ থেকে শুনেছি যে সবচেয়ে উত্তম দান হলো এমন কিছু যা আপনার সবচেয়ে প্রিয়। আমার বাবা ও স্বামী যেদিন আমাকে বিয়ে করেছিলেন, সেই উপলক্ষে যে গয়না দিয়েছিলেন, সেটাই আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ। আমি এই সোনার হার আল্লাহর রাস্তায় দান করতে চাই। আমি নিজ হাতে এটা আপনাকে দিচ্ছি, যাতে কিয়ামতের দিনে আপনি আমার এই সদকার সাক্ষী হতে পারেন। এখন আপনি দায়িত্বশীল, যেন আপনি এটি মুজাহিদিনদের জন্য সঠিকভাবে খরচ করেন।"

তিনি আমাকে একটি সুন্দর সোনার হার দিলেন। তার স্বামী তার হাতে থাকা সোনার রোলেক্স ঘড়িটি খুলে হারের ওপর রেখে দিলেন। আমি এতটাই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম যে কোনো কথা বলতে পারছিলাম না। আমি তাদের দানকে অন্য অনুদান থেকে আলাদা করে রাখলাম এবং তা এমন মুজাহিদিনদের হাতে দিলাম যাদের আমি সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য মনে করতাম। আমি জানতাম যে কিয়ামতের দিনে আমাকে এর সাক্ষ্য দিতে হবে। আমি প্রায়ই আখেরাতের কথা ভাবি, এবং জানি যে আমি যদি আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ত থাকি, তবে সবকিছু সহজ হবে। আল্লাহ করুন, যেন আমি জান্নাতে এই পশতুন বোন ও তার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারি। আমীন।

একদিন, অফিসে যাওয়ার পথে গাড়িতে আমি এক তরুণ পুরুষ ও নারীকে হাত নাড়তে দেখলাম। আমি আমার ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললাম এবং জানালা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা কী চান?" তরুণটি বলল, "এই নিয়ে তিন দিন হলো আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমরা আসি এবং আপনার অফিসের সামনে অপেক্ষা করি। কিন্তু ভিড় এত বেশি থাকে যে আমরা ঢুকতে পারি না।"

আমি তাদের ভেতরে আসতে বললাম। তারা আসার সঙ্গে সঙ্গেই নারীটি কাঁদতে শুরু করলেন। তারপর তার স্বামীও কাঁদতে শুরু করলেন। দুঃখ এতটাই ছিল যে আমিও কাঁদতে শুরু করলাম। আমার মন এত ভারাক্রান্ত ছিল যে আমি কেবল একটা অজুহাত খুঁজছিলাম।

আমরা অনেক কাঁদলাম।

তরুণটি বলল, "পাকিস্তানের সরকার ও মুশাররফ এমন কলঙ্কের সৃষ্টি করেছেন যা কখনও মুছবে না। তিনি সেই ভ্রাতৃত্বকে ধ্বংস করেছেন যা সোভিয়েত জিহাদের সময় গড়ে উঠেছিল, যখন আমরা মুজাহিদিনদের সহায়তা

করতাম ও আফগান শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছিলাম। আমি জানি না, একজন পাকিস্তানি হিসেবে আমি কীভাবে আপনার চোখে চোখ রাখব। আমরা ক্ষমা চাই। এটি আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল না। আমরা মুসলমান।"

তারা আমাকে জানাল যে তারা লাহোরে থাকেন এবং তারা তাদের সব সম্পদ বিক্রি করে দিয়েছেন। তার স্ত্রী তার সব গয়না বিক্রি করেছেন।

"আমাদের কাছে ২,৫০,০০০ রুপি আছে," লোকটি বলল। "এই জন্যই আমরা এসেছি। আমরা এটা আপনাকে দিতে চাই। এটা আমাদের সামর্থ্যের সবটুকু।"

তারপর তার স্ত্রী বললেন, "আমার একটি দশ বছর বয়সী কন্যা আছে। আমি তার জন্য একটি সোনার দুল সোনারকারকে দিয়ে বানিয়েছিলাম। যখন আমি আমার গয়না বিক্রি করছিলাম, আমি ওটা ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু যখন আমরা আপনার কাছে আসছিলাম, তখন আমি তার কানে সোনার ঝিলিক দেখতে পেলাম। তখন আমি ওটা খুলে নিয়েছি, এবং আজ আমি ওটা আল্লাহর রাস্তায় দেওয়ার জন্য এনেছি।" আমি জোর করে তাদের মেয়ের দুল ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলাম; আমি বারবার চেয়েছিলাম। কিন্তু নারীটি ফিরিয়ে নিতে অস্বীকৃতি জানালেন, আর সেইভাবেই তারা চলে গেলেন।

*****

২০০১ সালের ১১ই নভেম্বর কাবুল পতনের পর আমি কান্দাহারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই।
সেদিন ইসলামাবাদ থেকে কোয়েটায় কোনো ফ্লাইট ছিল না, তাই আমি প্রথমে পেশোয়ারে যাই এবং সেখান থেকে একটি বিমানে চেপে কোয়েটায় যাই।
বিমানের ক্রু ও যাত্রীরা একে একে আমার কাছে এসে সালাম জানাচ্ছিল।

একজন নারী, যিনি অন্য যাত্রীদের অপেক্ষায় ছিলেন, শেষ পর্যন্ত এগিয়ে এলেন।
তিনি আমার পাশের যাত্রীকে অনুরোধ করে তার সিটটি পেলেন এবং আমার পাশে বসে পড়লেন। এরপর তিনি কান্না শুরু করলেন।
তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বললেন যে তার কিছু প্রশ্ন আছে যা তিনি আমাকে করতে চান।
আমি তার নাম মনে রাখার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু এখন আর মনে নেই।

"জায়িফ সাহেব," তিনি শুরু করলেন, "আমি একজন ডাক্তার। আমার দুটি প্রাইভেট ক্লিনিক রয়েছে—একটি পেশোয়ারে, আরেকটি কোয়েটায়। আমি সময় ভাগ করে দুটি জায়গায়ই যাই। আমার একজন স্বামী আছে, আর একটি কন্যাসন্তান।
আমার যা আয় হয়, আমি তা তিনভাগে ভাগ করি।"

আমি মনে মনে হিসেব করলাম—তার আয় সম্ভবত কয়েক লক্ষ রুপি হবে।

“আমি আমার আয়ের অর্ধেক তালেবানের জন্য দান করি–আল্লাহর কাজের প্রসারে। বাকি অর্ধেককেও দুই ভাগে ভাগ করি–এক ভাগ নিজের খরচের জন্য, আর এক ভাগ আমার রোগীদের জন্য, যারা প্রকৃতভাবে দরিদ্র।”

“আমি যৌবন থেকে কখনোই নামাজ মিস করিনি, প্রতিদিন সকালে কুরআন পাঠ করি।
সব সত্ত্বেও আমার এক ভয়াবহ রোগ হয়েছে। আপনি কি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন?”

আমি বললাম, “কেন নয়? যদি পারি অবশ্যই করব।”

তিনি বললেন,
“আমি ভাবতাম, তালেবানই এই যুগে একমাত্র দল যারা আল্লাহর দ্বীনের সেবা করে, এবং তাঁর আইন বাস্তবায়ন করে। ওরাই আফগানিস্তানে শরিয়াহ নিয়ে এসেছিল।
কিন্তু যখন আমেরিকানরা আফগানিস্তানে হামলা শুরু করে, আমি ভাবলাম হয়তো এটি তালেবানদের জন্য সহায়ক হবে।
কিন্তু এখন আমি দেখি, তারা পরাজয়ের মুখে।
অনেক তালেবান শহীদ হয়েছে। রাজধানী পতিত হয়েছে।
তখন থেকেই আমার মনে প্রশ্ন, ‘আল্লাহ কোথায়? তিনি তালেবানদের সাহায্য করছেন না কেন? কেন এমন করলেন?’
এখন আমি নামাজ পড়তে চাই না।
আমার মনে হয় আমার ঈমান চলে গেছে।
সব রকম সন্দেহ এসে পড়ছে।
আমি জানি না কী করব।”

আমি তার কথা শুনলাম, চিন্তা করছিলাম কীভাবে উত্তর দেব।
আমি তার জন্য খারাপ লাগছিল, কিন্তু তখন মনে হলো অনেকেই হয়তো এরকম অনুভব করছেন।
আল্লাহ আমাদের পরীক্ষা নিচ্ছেন।

আমি তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলাম যতটুকু পেরেছি, এর পর প্লেন ল্যান্ড করল।

এমন অনেক মানুষ এবং ঘটনা ছিল, যা লেখা প্রয়োজন ছিল, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো মুছে গেছে।

এটি ছিল পাকিস্তানের কথা।
কিন্তু পুরো ইসলামি দুনিয়াতেই একই অবস্থা।
মুসলমানরা চিন্তিত ছিল, এবং তারা আমাদের সহায়তা করছিল, আর্থিকভাবে ও ব্যক্তি হিসেবে।

সেই সময়ে অনেকেই আমাকে ফোন করতেন, কিন্তু কথা না বলে শুধু কাঁদতেন।

একদিন এক আরবভাষী মুসলমান বারবার ফোন করেছিলেন, কিন্তু প্রতিবার “হ্যালো” বলেই কান্না শুরু করতেন।
অবশেষে আমি ফোন কেটে দেই।

শেষ পর্যন্ত তিনি কথা বলতে পারলেন, অনুরোধ করলেন যেন আমি ফোন না কাটি।
আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম কথা শুনব।
পেছনে তার স্ত্রীর কান্নার শব্দ শুনছিলাম। কয়েক মিনিট পর তিনি স্পষ্টভাবে বলতে পারলেন।

তিনি বললেন, তার স্ত্রী ভীষণ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন।
তিনি না খেয়ে থাকছেন, পানি পান করছেন না, সারাদিন কাঁদেন।
তারা ফিলিস্তিনি।
তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন যেন আমি তার স্ত্রীর সাথে কথা বলি এবং ফোন তার স্ত্রীর হাতে দিলেন।

যদিও তিনি কিছুই বলতে পারছিলেন না, শুধু কাঁদছিলেন, তবুও আমি সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করলাম।
আমি কুরআনের আয়াত ও হাদীস পাঠ করলাম।

দুই তিন দিন পর সেই ব্যক্তি আবার ফোন করলেন।
তিনি আমাকে ধন্যবাদ জানালেন।

“আমার স্ত্রী এখন ভালো আছে, যেদিন আপনি তার সঙ্গে কথা বলেছিলেন সেদিন থেকেই,” তিনি বললেন।

আফগানিস্তানে যুদ্ধ অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত চলছিল, এবং আমি তখনও বিভিন্ন রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষাৎ করছিলাম।
সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে তাদের কূটনীতিকদের বহিষ্কার করেছিল।
শুধু পাকিস্তানই তখনও আফগানিস্তানের ইসলামি আমিরাতকে স্বীকৃতি দিচ্ছিল।

*****

রমযান শুরুর দুদিন আগে, ১৫ নভেম্বর আমি আবার কান্দাহারে যাই,
আমিরুল মোমিনীন (মোল্লা মোহাম্মদ ওমর)-এর সঙ্গে আফগানিস্তান ও আমেরিকার মধ্যে আলোচনার সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলার জন্য।
কাতার তালেবান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করার লক্ষ্যে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিয়েছিল।

আমি ইসলামাবাদ থেকে আমার ল্যান্ড ক্রুজারে রওনা দিই, এবং পুরো পথজুড়ে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার নজরদারিতে ছিলাম।

যখন আমি চামান সীমান্ত অতিক্রম করলাম, তখন আমার মনে হচ্ছিল পাকিস্তান হয়তো আমাকে আর ফিরতে দেবে না।

আমি যখন কান্দাহারে পৌঁছালাম, তখন শহরটি সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলার মধ্যে ছিল।
মাত্র দুই দিন আগে কাবুল পতিত হয়েছে, আর সেখানকার বাকি মানুষদের মাঝে গভীর শোকের ছায়া ছিল।

আমি সোজা শহরের ভেতরে একটি নতুন ভবনে স্থাপিত সদর দপ্তরে গেলাম, যেখানে মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের সাথে দেখা করার ইচ্ছা ছিল।

তিনি তখন অফিসে ছিলেন না, আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম।
আমি যখন সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম, এক ঘণ্টা পরই আমেরিকান বিমানবাহিনী সেই সদর দপ্তরে বোমা হামলা চালায়।
বিমান হামলায় পুরো ভবন ধ্বংস হয়ে যায়, তবে সৌভাগ্যক্রমে কেউ নিহত হননি।

আমার বের হওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যে ওই হামলা হওয়ায়, মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের সন্দেহ হলো যে আমি নজরদারির আওতায় আছি এবং আমার সঙ্গে দেখা করা তার জন্য বিপজ্জনক হতে পারে।

আমি তখন তার পুরোনো বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম, যা এক জিহাদি মাদ্রাসার পেছনে খালি পড়ে ছিল।
ঠিক তখনই আমার গাড়ির কাছে আরেকটি বিমান হামলা হয়।
ক্রুজ মিসাইলের বিস্ফোরণ এমন ছিল যে আমার থুরাইয়া স্যাটেলাইট ফোনটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

দ্বিতীয় হামলার পর, মোল্লা মোহাম্মদ ওমর নিশ্চিত হন যে আমার অবস্থান শনাক্ত করা হচ্ছে।
সম্ভবত তার কারণ ছিল আমার স্যাটেলাইট ফোন; কিংবা এটা কাকতালীয়—শুধু আল্লাহই জানেন।
কিন্তু আমার ফোন ধ্বংস হওয়ার পর আর কোনো হামলার মুখে পড়িনি।

কয়েক মিনিট পর, রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ইতার-তাস (ITAR-TASS) ঘোষণা করে যে,
তালেবানদের পাকিস্তানে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত কান্দাহারে এক ক্রুজ মিসাইল হামলায় নিহত হয়েছেন।
এটা খুব সংক্ষিপ্ত একটি সংবাদ ছিল, কিন্তু আমি জানতাম কেন রাশিয়ানরা এটি বলেছে।

যদিও আমি মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের সঙ্গে দেখা করতে পারিনি, আমি তাঁর কাছে একটি বার্তা পৌঁছে দিতে পেরেছিলাম, তাইয়্যব আগা'র মাধ্যমে।

রমযানের তৃতীয় দিনে, আমি কান্দাহার ছেড়ে কোয়েটার দিকে রওনা হই।
কিছু তালেবান ভাই আমাকে আরঘেস্তান সেতু পর্যন্ত এগিয়ে দেয়।
আমি সেখানে গাড়ি থামালাম এবং আমার বন্ধুদের বিদায় জানালাম।

আমি কান্দাহারের দিকে ফিরে তাকিয়ে একটি কবিতা বললাম:

"ওহে সুন্দর শহর, যে মাটিতে আমরা শিশু অবস্থায় হামাগুড়ি দিয়েছিলাম।
একমাত্র আল্লাহই জানেন আমরা কবে আবার একে অপরকে দেখব।
একমাত্র আল্লাহই জানেন তোমার কি হবে, কিংবা আমার।
তবে আমি জানি, এই বিদায় দীর্ঘ হবে।
আমি ভয় পাচ্ছি, হয়তো আমি এই পথে আর ফিরতে পারব না।
আমি ভয় পাচ্ছি, এই সুন্দর ভূমি, এই বাড়িঘর আর বাগানগুলো যুদ্ধের আগুনে পুড়ে যাবে।"

তালেবানরা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করছিল, বলছিল আমি এত গম্ভীর আর অদ্ভুত আচরণ করছি কেন,
কিন্তু আমি কিছু বলিনি।
তারা কান্দাহারে ফিরে গেল, আর আমি স্পিন বোলদাক সীমান্তের দিকে রওনা দিলাম।

পাকিস্তানি সীমান্তে ওয়েশ-এ আমাকে কিছু সময় আটকে রাখা হয় এবং রাত ৯টা পর্যন্ত আমি প্রবেশ ভিসা পাইনি।
রাতে কোয়েটায় পৌঁছাই এবং সেখানকার আমাদের কনসুলেটে রাত কাটাই।
পরদিন সকালে আমি এয়ারপোর্টে যাই এবং ইসলামাবাদে ফিরে আসি।

আমি যখন এয়ারপোর্টে পৌঁছালাম, তখন সাংবাদিকদের একঝাঁক আমাকে ঘিরে ধরল।
আমি তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সময় নিলাম।

যদিও আমি কূটনৈতিক পাসপোর্টে ভ্রমণ করছিলাম,
তবুও পুলিশ আমাকে তল্লাশি করতে চাইল।
তাদের বলা হয়েছিল– "ব্যতিক্রম ছাড়াই সবাইকে তল্লাশি করতে হবে।"
তারা বলল, "পাকিস্তানের পরিস্থিতি ভালো নয়।"

আমি ২০ নভেম্বর ইসলামাবাদে ফিরে এসেছিলাম,
সাথে সাথেই পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে একটি আনুষ্ঠানিক চিঠি পাই।

তারা জানায়– "তারা আর ইসলামিক এমিরেট অব আফগানিস্তানকে স্বীকৃতি দেয় না" ,
তবে আমাকে, সেই সরকারের রাষ্ট্রদূত হিসেবে,
"আফগানিস্তানে জরুরি অবস্থা শেষ না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানে থাকার অনুমতি দেওয়া হলো।"
আমি মনে করি তারা ব্যবহার করেছিল "আরও যুক্তিসঙ্গত সময় না আসা পর্যন্ত" –এই কথাটি।

পাকিস্তান সরকার আমাকে কঠোর নির্দেশ দেয়,
মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করতে।

প্রতিটি পদক্ষেপে আমি গোয়েন্দা সংস্থার নজরদারিতে থাকতাম।

আমার বাড়ির সামনে সব সময় একটি ল্যান্ড ক্রুজার আর একটি মোটরসাইকেল দাঁড়িয়ে থাকত।
আমি বাইরে গেলেই তারা আমাকে অনুসরণ করত।

তবুও, অনেক মানুষ আমাকে দেখতে আসত।

*****

বোমাবর্ষণ শুরু হওয়ার একদিন পর, একজন পশুতু ডাক্তার আমার বাসায় এলেন।
দরজায় দাঁড়িয়ে গার্ডদের বললেন, আমি অসুস্থ–তাই তিনি ডাক পড়ে এসেছেন।

আমার সঙ্গে দেখা করে তিনি বললেন, "এখন আপনার চলে যাওয়ার সময়।
আপনাকে চুপচাপ উধাও হয়ে যেতে হবে।"

তিনি বললেন, "সীমান্ত এজেন্সিতে আমার একটা বাগানবাড়ি আছে, আমি সেখানে একটি ভিলা বানিয়েছি।
আমি আপনাকে সেখানে নিয়ে যাব। আপনি কিছুদিন ওখানেই থাকুন।"
তিনি আরও বললেন, "আপনি পাকিস্তান সরকারকে বিশ্বাস করতে পারবেন না।
তারা হয়তো আপনাকে আমেরিকানদের হাতে তুলে দেবে। পাকিস্তান আমেরিকার কাছে ঋণী।"

আমি তাঁর উদার, হৃদয়বান প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ জানালাম,
কিন্তু সেই প্রস্তাব গ্রহণ করলাম না।

আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম।
আমি চারটি দেশের দূতাবাসে রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন করেছিলাম–
সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার এবং পাকিস্তান–
কিন্তু কেউ-ই কোনো উত্তর দেয়নি।

আমি এমনকি ব্রিটিশ ও ফরাসি রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছিলাম,
কিন্তু তারা জবাব দেওয়ার প্রয়োজনও মনে করেননি।

আমি UNHCR-এর অফিসে গিয়েছিলাম নিজেকে নিবন্ধন করতে।
তারা আমাকে এক মাসের জন্য বৈধ একটি কাগজপত্র দেয়
এবং প্রতিশ্রুতি দেয়, যেকোনো সমস্যায় তারা আমাকে সাহায্য করবে।

তবুও, আমি জানতাম–গ্রেফতার হওয়ার চেয়ে বড় বিপদ আমার অপেক্ষায় আছে,
আর তা হলো–হত্যা হওয়া।
গ্রেফতার হওয়ার চিন্তা আমি কমই করতাম, কারণ পাকিস্তানের পক্ষে
আমাকে গুলি করে মেরে ফেলা ও দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপানোর চেয়ে অনেক সহজ আমেরিকানদের হাতে তুলে দেওয়া।
পাকিস্তানে এগুলো নিত্যদিনের ব্যাপার,
আর আমি বিশ্বাস করতাম না যে তারা আমাকে কেবল "এক টুকরো হাড়" হিসেবে আমেরিকানদের কাছে ছুঁড়ে দেবে।

আমি চাইলে কোথাও চলে যেতে পারতাম,
কিন্তু তালেবান যোদ্ধাদের যারা উত্তরের এলাকা থেকে বন্দি হয়েছে–
তাদের বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য
পাকিস্তানে আমার উপস্থিতি জরুরি ছিল।

দিনের পর দিন পাকিস্তানে আমার অবস্থা আরও খারাপ হতে লাগল।
২৪ ডিসেম্বর, লিবিয়ার দূতাবাস তাদের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করল।
আমি আমন্ত্রণ পেলাম এবং ইসলামাবাদের ম্যারিয়ট হোটেলে সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিলাম।
প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

আমি হোটেলে পৌঁছানোর সময় তাঁকে দেখি–
তাঁর চারপাশে অনেক কূটনীতিক ও রাষ্ট্রদূত।
তবে আমি তাঁকে সম্ভাষণ জানালাম না,
আমি চুপচাপ ভিড় এড়িয়ে অন্য জায়গায় গিয়ে বসে পড়লাম।

বেশিরভাগ ইসলামি দেশের রাষ্ট্রদূতরা এসে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন।
ইরানি রাষ্ট্রদূত তো আমার পাশে বসেই পড়লেন।

তারা আমাকে আফগানিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করলেন,
আমার মতামত জানতে চাইলেন।

আমি তাড়াতাড়ি রাতের খাবার শেষ করলাম, তারপর বেরিয়ে যেতে চাইলাম।

সে সময় ইসলামাবাদের প্রায় সব হোটেল রিপোর্টারদের ভরে গিয়েছিল,

বিশেষ করে ম্যারিয়ট হোটেল।

আমি যখন দরজায় পৌঁছালাম,
সেখানে শত শত সাংবাদিক দাঁড়িয়ে ছিল,
আর তারা আমাকে মৌমাছির মতো ঘিরে ধরল।

আমি আবার হোটেলের ভেতরে ফিরে গেলাম,
কিন্তু তারা আমাকে অনুসরণ করল–
একেবারে লবির ভেতর দিয়ে উৎসবস্থলের মূল হলে ঢুকে পড়ল।

এই ভিড় দেখে কূটনীতিকরা আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন।
মোশাররফ উঠে পড়লেন, দেহরক্ষীদের সঙ্গে আরেকটি কক্ষে চলে গেলেন।

পুলিশ কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে এল
এবং আমাকে হোটেলের পেছনের গেট দিয়ে বের করে দিল–
আমি গাড়িতে উঠে বাড়ি চলে এলাম।

পরদিন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা,
যিনি মোশাররফের সাথেই অনুষ্ঠানে ছিলেন,
আমাকে সতর্ক করলেন–
"পাকিস্তান সরকার আপনার বিরুদ্ধে কিছু একটা ষড়যন্ত্র করছে।"

তিনি বললেন, "তারা হয়তো আপনাকে হত্যা করবে অথবা জেলে দেবে।
হত্যার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ গতরাতে ম্যারিয়টে সেই ভিড় দেখে
মোশাররফ বলেছিলেন, 'এটা মেনে নেওয়া যায় না।' "

আমি বুঝতে পারিনি, তিনি এর দ্বারা কী বোঝাতে চাইলেন।
কারণ এই ঘটনার আগেই
আমার বিরুদ্ধে পারভেজ মোশাররফকে হত্যার ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ উঠেছিল।

ISI আমাকে জানিয়েছিল, তাদের কাছে প্রমাণ আছে যে আমি
এই বিষয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা করেছি।

এটা আমার জন্য একেবারে নতুন খবর ছিল।

আমি কখনো কোনো হত্যার পরিকল্পনা করিনি,
আর কারো সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলার প্রশ্নই আসে না।

যে দিন থেকে আমি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ও পাকিস্তানের সামনে
সাতশো উলামার ফতোয়া ঘোষণা করেছিলাম,
সেদিন থেকেই আমি মোশাররফের গলার কাঁটা হয়ে উঠেছিলাম।

ফতোয়ার একাংশ ছিল:

"যে কেউ আমেরিকানদের আফগানিস্তান আক্রমণে সাহায্য করে,
মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়তা করে,
বা অন্য কোনোভাবে সহযোগিতা করে–
সে একজন পাপাচারী।
তাকে হত্যা করাও বৈধ–সে মুবাহউদ্দাম।"

একজন পাকিস্তানি সাংবাদিক তখন প্রশ্ন করেছিলেন:

"পারভেজ মোশাররফ পাকিস্তানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি,
তিনি আমেরিকানদের ঘাঁটি দিয়েছেন,
গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে তথ্য দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।
তাহলে কি তিনি এই ফতোয়ার আওতায় পড়েন?"

আমি বলেছিলাম:
"ফতোয়াটি সাধারণ–এটি কাউকে ব্যক্তিগতভাবে লক্ষ্য করে দেয়া হয়নি,
আর কাউকে বাদ দেওয়াও হয়নি।"

আমি আরও যোগ করেছিলাম:
"শরিয়া আইনকে ব্যক্তির ইচ্ছামতো মোড়ানো যায় না।
মানুষকে ফতোয়ার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে,
ফতোয়াকে নয়।"

এই ঘটনার পর,
পাকিস্তানে প্রতিটি দিন আমার জন্য আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠছিল।

*****

কান্দাহার পতনের পর যখন আমিরাতের শেষ প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে গেল, তখনও আমি ইসলামাবাদে ছিলাম। তালেবান নেতৃত্ব ও আমার বন্ধুদের কী হয়েছে, তা আমি জানতাম না এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগেরও কোনো উপায় ছিল না। আমি তাদের ভাগ্য জানার চেষ্টা করছিলাম–কে নিহত হয়েছে? কে দোস্তম এবং নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের অন্যান্য কমান্ডারদের হাতে বন্দি হয়েছে?

আমি একাকী ছিলাম এবং কী করব তা নিয়ে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করলাম। তারা আমাকে UNOCHA-র (জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা সংস্থা) সঙ্গে যোগাযোগ করে আশ্রয় চাইতে বলল। আমি তাদের অফিসে গেলাম, কিন্তু রেজিস্ট্রেশন করার আগেই এক পুরুষ ও এক মহিলা আমাকে নানা রকম প্রশ্ন করতে শুরু করল। লোকটি ছিল খাটো আর গা ছুঁই ছুঁই বাদামি রঙের। আমি যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে কোন পদে আছে এবং কোথায় জন্ম নিয়েছে, সে বলল যে সে জাতিসংঘের গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্বে আছে এবং তার জন্ম আমেরিকায়।

আমি মহিলাকে বললাম, তাদের সব প্রশ্ন শুনে মনে হচ্ছে না যে আমি আশ্রয়ের জন্য রেজিস্ট্রেশন করছি; বরং মনে হচ্ছে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তিনি বললেন, আমাকে শুধু অপেক্ষা করতে হবে; এরপর আরও অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তখন আমি তার কথার মানে বুঝিনি। কিন্তু যখন আমি আমেরিকান দানবদের হাতে বন্দি হলাম, তখন তার কথা মনে পড়ল এবং আমি তার আসল অর্থ বুঝতে পারলাম।

এইসব ঘটনার মধ্যে আমি কিছুদিনের জন্য কোয়েটা গেলাম। এরপর UNOCHA থেকে আমার কাছে একটি বার্তা এল, তাতে বলা হল যে আমি যদি ইসলামাবাদে ফিরে না যাই, তাহলে তারা আমাকে আশ্রয় দেবে না।

বাড়ি ফিরে দেখি, এমনকি আমার স্ত্রীও আমাকে বলছে, চলে যেতে। সে চিন্তিত ছিল যে পাকিস্তান সরকার আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারে। অনেক বন্ধু আমাকে পালাতে বলছিল, কিন্তু আমার জন্য এভাবে চলে যাওয়া কঠিন ছিল। মনে হচ্ছিল যেন এটা বিশ্বাসঘাতকতা হবে–উত্তরে যারা তালেবান বন্দি হয়েছে, তাদের পরিত্যাগ করার মতো। আমি আমেরিকান বোমাবর্ষণে নিহত পঁচিশ হাজার আফগান এবং যারা বন্দি হয়েছে, তাদের কথাও ভাবছিলাম। আমি যদি তাদের ভাগ্যেও অংশ নেই, তাতে বা এমন কী আসে যায়? আমি তাদের ফেলে রেখে যেতে পারিনি। আমি তাদের সঙ্গে অবিশ্বস্ত হতে পারিনি।

আমি বন্দিদের সাহায্য করার চেষ্টা করছিলাম–পাকিস্তানে থাকা নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছিলাম, এবং তাদের সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার জন্য টাকা দিচ্ছিলাম। আমার যা প্রভাব ছিল, তা ব্যবহার করছিলাম, কমান্ডারদের টাকা দিচ্ছিলাম যেন অন্তত বন্দিরা বেঁচে থাকে। এই উদ্দেশ্যে আমি রেড ক্রস ও মানবাধিকার সংস্থাগুলোর সহায়তা নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম, যেন তারা বন্দিদের রক্ষা করে। আমি আফগানিস্তানে নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের নেতাদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করছিলাম। দোস্তম ও ইসমাইল খানের সঙ্গেও বহুবার কথা বলেছি, বন্দিদের ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছি। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে আমি ১,৮০,০০০ ডলারের বেশি খরচ করেছি–পুরো চেষ্টা করেছি, কিন্তু খুব একটা ফল পাইনি।

আমি প্রতিটি মুহূর্তে গ্রেপ্তার হওয়ার আশঙ্কা করছিলাম, কিন্তু তারপরও আমি দেশ ছাড়তে পারিনি।

একই সঙ্গে আমি পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ফোন করে আমার আশ্রয়ের আবেদনের অবস্থা জানতে চাইছিলাম। তারা বলত, "আমরা কাজ করছি। চিন্তা করবেন না, কেউ আপনাকে বিরক্ত করবে না।" হয়তো তারা তখনই আমেরিকানদের সঙ্গে আমাকে হস্তান্তরের দরদাম করছিল।

ঈদের পর, আইএসআই তাদের নজরদারি বাড়িয়ে দিল। বাড়ি চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল, এবং যখনই কোনো গাড়ি বাড়ি থেকে বের হত, তারা সেটা তল্লাশি করত–আমি যেন পালিয়ে যেতে না পারি, তা নিশ্চিত করত। তারা নিশ্চিত হতে চাইছিল যে আমি পালাতে না পারি। অন্তত তখনও আমাকে অতিথি গ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছিল।

*****

এই মুহূর্তেও আমি সেই স্বপ্নটির কথা মনে করতে পারি, যা আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছিল — ইসলামাবাদে আমার বাড়িতে গ্রেপ্তারের কয়েকদিন আগেই স্বপ্নটা দেখেছিলাম। স্বপ্নে, আমার বড় ভাই একটি ছুরি হাতে নিয়ে আমার সামনে আসে। তার মুখে ছিল তীব্র রাগ, আর সে দৃঢ়ভাবে ছুরির হাতল আঁকড়ে ধরে আমার দিকে এগিয়ে আসে। সে এত কাছাকাছি এসে দাঁড়াল যে আমি তার নিঃশ্বাস আমার মুখে অনুভব করতে পারছিলাম। ঠান্ডা গলায় সে বলল, "ভাই! আমি এসেছি এই ছুরি দিয়ে তোমার শিরশ্ছেদ করতে।"

সে আমার সামনে দাঁড়িয়েছিল, হাতার ভাঁজ গুটানো। আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম–বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, আমি কী শুনছি! নিজের ভাই, নিজের রক্ত–সে কীভাবে এমন ঘৃণ্য কাজ করতে পারে? আমি তো তাকে কোনোদিন কষ্ট দিইনি, কোনো ক্ষতি করিনি। শুরুতে মনে হয়েছিল সে হয়তো ঠাট্টা করছে, কিন্তু তার চোখেমুখে যে দৃঢ় সংকল্প দেখলাম, তাতে স্পষ্ট বোঝা গেল, সে যা বলেছে তা-ই করতে চায়। স্বপ্নে আমি ভাবলাম: "যদি এটাই তাকে শান্তি দেয়, তাহলে আমি প্রতিরোধ না করে তাকে তা করতে দিই, যদি বোঝাতে ব্যর্থ হই।"

তাই আমি বললাম, "ভাই! আমি কখনো তোমার কোনো ক্ষতি করিনি, কোনো দুঃখ দিইনি। তবু তুমি আজ এমন অন্যায় প্রতিশোধ নিতে চাইছো।" কিন্তু আমার কথা তাকে বুঝাতে পারল না।

আমি নিজেকে প্রস্তুত করলাম, এখনো আশায় ছিলাম–সে হয়তো দয়া দেখাবে। আমি মেঝেতে শুয়ে পড়লাম, আর আমার ভাই কসাইয়ের মতো ছুরি আমার গলায় চালিয়ে নির্মমভাবে আমাকে শিরশ্ছেদ করল।

এই ছিল সেই স্বপ্ন, যা আমি দেখেছিলাম ঠিক কয়েকদিন আগে পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনী আমার বাড়ি ঘিরে ফেলেছিল। তখনই আমি বুঝতে শুরু করলাম, সেই ভাইয়ের বিশ্বাসঘাতকতার স্বপ্নের তাৎপর্য।

সেই দিন ছিল নতুন বছরের দ্বিতীয় দিন; পাকিস্তান ২০০২ সালের শুরু উদযাপন করছিল, আর আমি আমার পরিবারের সঙ্গে বাড়িতে ছিলাম। তখনো আমি দোস্তুম ও নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের হাতে আটক বন্দিদের মুক্ত করার চেষ্টা করছিলাম। উত্তরের ঘটনাগুলো আমার মনকে এমনভাবে গ্রাস করেছিল যে অন্য কিছু ভুলে গিয়েছিলাম। আমি মরিয়া হয়ে আমাদের যোদ্ধাদের–বিশেষ করে আহতদের–নিরাপদে দেশে ফেরানোর পথ খুঁজছিলাম। ভাবছিলাম, কীভাবে ভাইয়েরা বাড়ি ফিরবে? দোস্তুম যাদের ধরেছে, তাদের কী হবে? কিভাবে তাদের খবর জানা যাবে? কিভাবে তাদের নিরাপদে বের করে আনা যাবে?

এইসব ভাবনার মধ্যেই আমার নিরাপত্তারক্ষী এসে জানায়, পাকিস্তানি কর্মকর্তারা গেটের সামনে এসেছে, আমাকে দেখা করতে বলছে। তখন রাত আটটা–আমার বাড়িতে সাক্ষাতের জন্য খুবই অস্বাভাবিক সময়। আমি ছোট অতিথি কক্ষে গেলাম। সেখানে তিনজন পুরুষ ছিল। আমি ঢোকার পর তারা নিজেদের পরিচয় দিল–একজন ছিল গুলজার নামের এক পশতু, বাকি দুজন উর্দু ভাষায় কথা বলছিল।

আমরা অভ্যর্থনার পর একসঙ্গে বসলাম, আমি চা পরিবেশন করলাম আর অপেক্ষা করছিলাম, তারা এত রাতে কেন এসেছে। পশতু লোকটির মুখ ছিল রাগে বিকৃত; তার ঠোঁট ফোলা, নাক আর পেট বড়, যেন নরক থেকে উঠে এসেছে। সে আমার বা আমার ঘরের প্রতি সামান্যতম সম্মান দেখাল না–ব্যবহার ছিল দুর্বিনীত।

সে বলল, "এক্সেলেন্সি, আপনি এখন আর এক্সেলেন্সি নন! আমেরিকা একটা পরাশক্তি, জানেন না? তাকে কেউ হারাতে পারে না, তার সঙ্গে কেউ দরকষাকষিও করতে পারে না। আমেরিকা আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায়, আর আমরা আপনাকে তাদের হাতে তুলে দিতেই এসেছি।"

পাকিস্তান নিজেকে বিপদ থেকে বাঁচাতে চাইছিল। আমি বললাম, আমি জানি আমেরিকা বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি। কিন্তু বিশ্বের নিয়মকানুনও তো আছে।

আমি বললাম, "এইসব নিয়ম–তা ইসলামিক হোক বা না হোক–আপনারা কীভাবে আমাকে আমেরিকার হাতে তুলে দিতে পারেন? এমন কোনো সংবিধান আমি জানি না যা আপনাদের এই অধিকার দেয়। আপনারা হয়তো বলতেই পারেন, আমি যেন দেশ ছেড়ে যাই। কিন্তু আপনারা আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারেন না।"

সেই নরকের লোকটি সোজাসুজি উত্তর দিল, "না ইসলাম, না অন্য কোনো নিয়ম–এই পরিস্থিতিতে কোনো কিছুই প্রযোজ্য নয়। এখন কেবল আমাদের লাভ আর পাকিস্তানই গুরুত্বপূর্ণ।"

তখন বুঝলাম, আলোচনার মোড় একেবারে খারাপ দিকে মোড় নিয়েছে। নিজেকে শান্ত রেখে বললাম, “আপনারা যা ইচ্ছা করতে পারেন। আমি আপনাদের দয়া-অনুগ্রহে আছি। আমার এখানে কোনো আশ্রয় নেই, আর শেষ বিচারের দিন আল্লাহ বিচার করবেন।”

তারা বলল, আমি যেন মধ্যরাত পর্যন্ত বাসায় থাকি, তারপর আমাকে পেশোয়ারে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা আমার বাড়ি ঘিরে ফেলল, যেন আমি বা আমার পরিবার কেউই বের হতে না পারি।

তারা বলেছিল, পেশোয়ারে আমাকে নিয়ে গিয়ে দশ দিনের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আমেরিকানরা তদন্ত চালাবে, তারপর আমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে–তখন আমি বাসায় ফিরে যেতে পারব। তখনো আমার কাছে পাকিস্তানের দশ মাসের বৈধ ভিসা ছিল। আমার কাছে একটি অফিসিয়াল চিঠিও ছিল, যেটি পাকিস্তান সরকার ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছিল, যাতে বলা ছিল আমি আফগানিস্তানের ইসলামিক আমিরাতের একজন প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করছি, যতক্ষণ না আফগানিস্তানের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

এইসব নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও–আন্তর্জাতিক আইনে যে সুরক্ষা পাওয়ার কথা, এমনকি জাতিসংঘের এক চিঠিতে স্পষ্ট লেখা ছিল “এই চিঠির বাহককে তার প্রতিনিধিত্বের কারণে ক্ষতি করা যাবে না” –তবু মাঝরাতে তিনটি গাড়ি এসে আমার দরজায় দাঁড়াল। সব রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হল, পাহারা বসানো হল। এমনকি যেসব সাংবাদিক তখন সেখানে ছিলেন, তাদেরও ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়া হয়নি–কি হয়েছে তা বিশ্বকে জানানোর সুযোগ পর্যন্ত পাইনি। তারা আমাকে বাড়ি ছাড়তে বলল। আমি যখন বাগান পার হয়ে রাস্তায় বের হলাম, তখন আমার সন্তানরা কাঁদছিল।

যদি এটা আমার সঙ্গে না ঘটত, আমি বিশ্বাস করতাম না যে পাকিস্তানি সৈন্য–যাদের ইসলাম রক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে–তারা কোনো অপরাধ না করেও মুসলমান ভাইয়ের বিরুদ্ধে এমনভাবে দাঁড়াতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, তাদের কাজে কোনো আইনগত ভিত্তি ছিল না–কেবল আমেরিকার চাপ, জনগণের ক্ষোভ আর ‘সুযোগের’ আশাই তাদের আমাদের বিরুদ্ধে ফিরিয়ে দিল। আমি আজও বুঝে উঠতে পারি না–তারা কীভাবে নিজেদের সম্মান ও আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিল? কীভাবে কুরআনের আদেশ ও ইসলামের সাহসিকতা ও আতিথেয়তার রীতিনীতিকে অগ্রাহ্য করল? কীভাবে তারা আন্তর্জাতিক আইন এবং সাধারণ ভ্রাতৃত্ববোধ পর্যন্ত ভুলে গেল?

যখন আমি সেই ঘন অন্ধকার রাতে রাস্তায় বের হলাম, তখন আমার মনে হল–আমাকে রক্ষা করার কেউ নেই, কেউ নেই যিনি তাদের থামাতে পারেন।

তারা আমাকে তাদের একটি গাড়িতে তোলে। এমনকি তখনো আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না–পাকিস্তান সরকার আমাকে এমন আচরণ করছে কেন? আমি তো একই ধর্মের ভাই, যা অন্তত তাদের কথিত ধর্মীয় ভক্তির কিছু মানে হওয়া উচিত ছিল। এটা আমার জন্য খুব কঠিন ছিল, বিশেষত তখন যখন যারা আমাকে তুলে নিচ্ছিল

তারা নিজেরাই কুরআনের নাম নিচ্ছিল বা নিজেদের মধ্যে 'জিহাদ' নিয়ে আলোচনা করছিল। তারা আমাকে পেছনের সিটে মাঝখানে চেপে বসাল। সম্ভবত আইএসআই-এর সদস্যরাই আমার দুই পাশে বসেছিল। তাদের হাতে কোনো অস্ত্র ছিল না, তবে আমাদের গাড়িটি তিনটি গাড়ির একটি কনভয়ের মধ্যখানে ছিল। অন্য গাড়িগুলোয় ছিল সশস্ত্র লোক। ড্রাইভার পুরো পথজুড়ে এক উর্দু নারী গায়িকার গান চালিয়ে রাখল—স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, গানটা চালানোর একমাত্র উদ্দেশ্য আমাকে বিরক্ত করা।

পেশোয়ারে যাওয়ার পথে আমি তাদের অনুরোধ করলাম যেন একটু থামে, যাতে আমি ফজরের নামাজ পড়তে পারি। কিন্তু তারা বলল, "পেশোয়ারে পৌঁছার পর পড়বেন।" আমি বারবার বললাম, কিন্তু তারা নামাজের ব্যাপারে কোনো গুরুত্ব দিল না, আমার অনুরোধকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করল।

PRISONER 306

পেশোয়ারে পৌঁছানোর পর আমাকে একটি অত্যন্ত সাজানো-গোছানো অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো। একটি ডেস্কের ওপর পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা ছিল এবং পেছনের দেয়ালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ছবি ঝুলছিল। একজন পশতু ব্যক্তি ডেস্কের পেছনে বসা ছিলেন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন, নিজেকে পরিচয় দিলেন এবং আমাকে স্বাগত জানালেন। তার মাথা কামানো ছিল–যেটি তার সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বলে মনে হলো–এবং তিনি গড়পড়তা উচ্চতা ও ওজনের ছিলেন। তিনি আমার কাছে এসে বললেন যে তিনিই এই ব্যুরোর প্রধান। আমি যেন শয়তানের কারখানায় এসে পড়েছি–এটি ছিল আইএসআই-এর আঞ্চলিক প্রধান কার্যালয়।

তিনি আমাকে বললেন যে আমি তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু–একজন অতিথি–এবং তারা আমার ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করে। আমি নিশ্চিত ছিলাম না তিনি কী বোঝাতে চাইছেন, কারণ এটা স্পষ্ট যে আমি তাদের কাছে প্রিয় ছিলাম শুধু এই কারণে যে তারা আমাকে বিক্রি করে ভালো অর্থ লাভ করতে পারবে। তাদের ব্যবসা ছিল মানুষ নিয়ে; ঠিক যেমন ছাগলের দাম যত বেশি, মালিক তত খুশি। একবিংশ শতাব্দীতে এমন জায়গা খুব কম আছে যেখানে মানুষ এখনো কেনাবেচা হয়, কিন্তু পাকিস্তান এখনো এই বাণিজ্যের একটি কেন্দ্র।

রাতের খাবারের পর আমি আইএসআই কর্মকর্তার সঙ্গে নামাজ পড়ি, এরপর আমাকে বন্দীদের জন্য নির্ধারিত একটি কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। কক্ষটি মোটামুটি ভালো ছিল, একটি গ্যাস হিটার, বিদ্যুৎ এবং একটি টয়লেট ছিল। আমাকে খাবার-দাবার দেওয়া হয়–এমনকি কোরআন শরীফের একটি কপি দেওয়া হয় তিলাওয়াতের জন্য–এছাড়াও একটি খাতা এবং কলম দেওয়া হয়। দরজার সামনে নিযুক্ত প্রহরী খুব সাহায্যপ্রবণ ছিলেন এবং আমি রাতের বেলায় যা কিছু চেয়েছি তিনি তা এনে দিয়েছেন।

পেশোয়ারে আটক থাকার সময় আমাকে কেউ জিজ্ঞাসাবাদ করেনি। শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি, যিনি পশতু জানতেন না এবং যার উর্দু ভাষাও আমি বুঝতাম না, প্রতিদিন এসে একই প্রশ্ন করতেন: “কি হতে যাচ্ছে?” আমি প্রতিবার একই উত্তর দিতাম– “আল্লাহ্ তাআলা জানেন এবং তিনিই আমার ভাগ্য নির্ধারণ করবেন। সবকিছুই তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।”

পেশোয়ারে আটক থাকা অবস্থায় যারা আমাকে দেখতে এসেছিলেন তারা সবাই আমাকে সম্মানের সঙ্গে দেখেছেন। কিন্তু কেউই খুব বেশি কথা বলেননি। তারা চুপচাপ আমার দিকে তাকিয়ে থাকতেন, কিন্তু তাদের চোখের ভাষাই যথেষ্ট ছিল–সহানুভূতির সঙ্গে ঝাপসা হয়ে উঠত তাদের চোখ।

অবশেষে, অনেকদিন পর এক ব্যক্তি এলেন, যার চোখ বেয়ে অশ্রু গড়াচ্ছিল। দুঃখ ও লজ্জায় তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তিনিই ছিলেন সেই ঘরে দেখা আমার শেষ ব্যক্তি। আমি কখনোই তার নাম জানতে পারিনি, কিন্তু তিনি চলে যাওয়ার চার ঘণ্টার মধ্যেই আমাকে আমেরিকানদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

রাত প্রায় এগারোটা বাজে, আমি ঘুমোতে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম তখন হঠাৎ করে আমার সেলের দরজা খুলে গেল। একজন ব্যক্তি–তাঁরও মাথা কামানো–ভিতরে এলেন; তিনি ভদ্রভাবে কথা বললেন এবং আমরা কুশল বিনিময় করলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি কি জানি, আমার সঙ্গে কী হতে চলেছে। আমি যখন বললাম যে আমি কিছুই জানি না, তখন তিনি বললেন আমাকে স্থানান্তর করা হবে, খুব শীঘ্রই। এত দ্রুত যে তিনি আমাকে ওজু করে ও টয়লেট ব্যবহার করে প্রস্তুত হয়ে নিতে বললেন। আমি আর কিছু না জেনে উঠে পড়ে ওজু করে নিলাম।

মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আরও কিছু লোক এল হাতে হ্যান্ডকাফ এবং কালো কাপড় নিয়ে। তারা আমার হাত শৃঙ্খলিত করল এবং আমার মাথার চারপাশে কাপড় বেঁধে চোখ ঢেকে দিল। এটাই ছিল আমার জীবনের প্রথমবার, যে আমি এভাবে আচরণের শিকার হলাম। তারা আমার জিনিসপত্র তল্লাশি করল এবং নিয়ে গেল কোরআন শরীফ, একটি ডিজিটাল রেকর্ডার এবং কিছু নগদ অর্থ। তারা আমাকে বাইরে নিয়ে এল, লাথি মেরে ও ধাক্কা দিয়ে গাড়িতে তুলল। কেউ একটি কথাও বলেনি।

আমরা প্রায় এক ঘণ্টা গাড়িতে চলার পর থামলাম। আমি হেলিকপ্টারের ঘূর্ণায়মান ব্লেডের শব্দ শুনতে পেলাম। বুঝতে পারলাম আমরা কোনো বিমানবন্দরে পৌঁছেছি, যেখান থেকে আমাকে আমেরিকানদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। কেউ একজন আমার ঘড়ি খুলে নিল। এরপর গাড়ি কিছুটা এগিয়ে গেল এবং আবার থামল। এবার দুই জন লোক আমাকে দুই দিক থেকে ধরে বাইরে নামিয়ে আনল। একজন আমার কানে ফিসফিস করে বলল, **"খোদা হাফেজ" –**বিদায়। কিন্তু যেভাবে সে বলল, মনে হলো যেন আমি কোনো আনন্দময় যাত্রায় যাচ্ছি।

আমি এখনো হেলিকপ্টারে উঠিনি, এমন সময় হঠাৎ চারদিক থেকে লোকজন এসে আমার ওপর হামলা করল। তারা আমাকে লাথি মারতে লাগল, চিৎকার করল, এবং আমার পোশাক ছুরি দিয়ে কেটে ফেলল। তারা আমার চোখের কালো কাপড় খুলে দিল, আর আমি প্রথমবার চারপাশ দেখতে পেলাম। পাকিস্তানি এবং আমেরিকান সৈন্যরা আমাকে ঘিরে রেখেছিল। দূরে আমি সামরিক যান দেখতে পেলাম, যার মধ্যে একটি ছিল কোনো জেনারেলের নম্বরপ্লেটযুক্ত।

পাকিস্তানি সৈন্যরা–যারা ইসলাম রক্ষার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত–সবকিছু চেয়ে দেখছিল হাসিমুখে, যখন আমেরিকানরা আমার কাপড় ছিঁড়ে আমাকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে ফেলল। তারা আমেরিকানদের সামনে আমার দৃষ্টিতেই হস্তান্তর অনুষ্ঠানের আয়োজন করল।

এই মুহূর্তটি আমার স্মৃতিতে এক অমোচনীয় দাগ হয়ে গেঁথে গেছে। যদি পাকিস্তান আমেরিকানদের বিরোধিতা করতে না-ও পারত, অন্তত তারা এই শর্ত রাখতে পারত যে এমন আচরণ তাদের চোখের সামনে বা তাদের ভূখণ্ডে যেন না ঘটে।

আমি তখনো নগ্ন অবস্থায় ছিলাম, যখন একজন নির্মম আমেরিকান সৈন্য আমার বাহু ধরে আমাকে হেলিকপ্টারে নিয়ে গেল। তারা আমার হাত-পা বেঁধে দিল, মুখে টেপ লাগিয়ে দিল এবং চোখে একটি কালো কাপড় পরিয়ে দিল, যেটি গলায় টেপ দিয়ে আটকে দিল। এরপর তারা আমাকে হেলিকপ্টারের মেঝেতে শৃঙ্খলিত করল।

এই পুরো সময় আমি না চিৎকার করতে পারছিলাম, না নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম। আমি যখন একটু নড়তে চেষ্টা করছিলাম বা নিঃশ্বাস নিতে চাইছিলাম, তখনই তারা আমাকে জোরে লাথি মারত। হেলিকপ্টারে আমি লাথি-ঘুষির ভয় হারিয়ে ফেলেছিলাম; আমার মনে হচ্ছিল আমার প্রাণ এখনই শেষ হয়ে যাবে। আমি নিশ্চিত ছিলাম আমি মারা যাচ্ছি। কিন্তু এই ইচ্ছেও পূরণ হলো না।

সৈন্যরা আমাকে চিৎকার করতে থাকল, মারধর করতে থাকল, যতক্ষণ না হেলিকপ্টার অবতরণ করল। তখন আমি সময়ের হিসাব হারিয়ে ফেলেছিলাম। কেবল আল্লাহ জানেন কতক্ষণ আমি গাড়ি, হেলিকপ্টার ও অন্য পরিবহনে কাটিয়েছি। আমি স্বস্তি পেলাম যে হেলিকপ্টার অবতরণ করেছে, ভাবলাম নির্যাতনের শেষ হয়েছে, কিন্তু তখনও আমার কষ্টের শেষ হয়নি।

একজন রূঢ় সৈন্য আমাকে ধরে বাইরে নামাল। বাইরেই অনেক সৈন্য আমার ওপর চড়াও হলো, মারধর করল। তারা পশুর মতো আচরণ করল, যা কয়েক ঘণ্টা চলল বলে মনে হলো। এরপর কিছু সৈন্য আমার শরীরের ওপর বসে পড়ল এবং এমনভাবে কথোপকথন চালাতে লাগল যেন তারা কোনো পার্কে বেঞ্চে বসে আছে। আমি সব আশা ত্যাগ করেছিলাম; এই যন্ত্রণা অনেক দীর্ঘ ছিল এবং আমি নিশ্চিত ছিলাম আমি মারা যাব।

তবুও আমার মনে পাকিস্তানি সৈন্যদের মুখ ভেসে উঠছিল। আমরা এমন কী করেছিলাম যে এই শাস্তি আমাদের প্রাপ্য? কিভাবে আমাদের মুসলমান ভাইয়েরা আমাদের এভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারল?

আমি প্রায় দুই ঘণ্টা মাটিতে কুঁকড়ে পড়ে থাকলাম, এরপর তারা আমাকে আরেকটি হেলিকপ্টারে নিয়ে গেল। এটি আগেরটির চেয়ে আধুনিক মনে হলো। রক্ষীরা আমাকে একটি ধাতব চেয়ারে বেঁধে দিল, এবং এই যাত্রায় আমাকে কেউ স্পর্শ করেনি। কেউ জানাল না আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রায় বিশ মিনিট পরে হেলিকপ্টার আবার অবতরণ করল।

পরে সৈন্যরা আমাকে আবার ধরল ও নিয়ে গেল। মনে হচ্ছিল পথ অনেক দীর্ঘ; আমি তখনো চোখ বাঁধা অবস্থায় ছিলাম, কিন্তু শুনতে পাচ্ছিলাম আশেপাশে অনেক লোকের আওয়াজ। তারা আমাকে দাঁড় করিয়ে দিল এবং একজন দোভাষী বলল, “এই সিঁড়িগুলো দিয়ে নিচে নামুন।” আমি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে থাকলাম, এবং

ওপরের লোকদের আওয়াজ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। ছয়টি সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে যাওয়ার পর থামলাম, এবং তখন চোখের কাপড় খুলে ফেলা হলো। মুখের টেপ ছিঁড়ে ফেলা হলো এবং আমার হাত খুলে দেওয়া হলো।

*****

চারজন আমেরিকান সৈন্য আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল এবং আমার বাম দিকে আমি কিছু সেল দেখতে পেলাম–তারা দেখতে খাঁচার মতো–যার ভেতরে মানুষ ছিল। সৈন্যরা আমাকে একটি ছোট বাথরুমে নিয়ে গেল, কিন্তু আমি গোসল করতে পারিনি। হেলিকপ্টারে নির্যাতনের সময় যেভাবে পিটানো হয়েছিল, তার ব্যথায় আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যথায় টনটন করছিল। মনে হচ্ছিল আমি প্যারালাইসড হয়ে গেছি–হাত-পা যেন অবশ হয়ে গেছে। আমাকে একটি ইউনিফর্ম দেওয়া হলো এবং একটি খাঁচার ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো। এটি ছিল ছোট, হয়তো দুই মিটার লম্বা আর এক মিটার চওড়া, যেখানে একটি ট্যাপ ও একটি টয়লেট ছিল। দেয়ালগুলো ছিল ধাতব শিক দিয়ে বানানো, কোনো সিল করা দেয়াল ছিল না। যাওয়ার আগে প্রহরীরা আমাকে ঘুমাতে বলল এবং দরজাটি তালাবদ্ধ করে দিল।

একাকী সেই খাঁচায় শুয়ে আমি গত ক' দিনের কথা ভাবতে লাগলাম। আমি কীভাবে এই খাঁচায় এসে পড়লাম? সবকিছু যেন এক দুঃস্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল, আর যখন আমি ব্যথাক্রান্ত শরীর নিয়ে শুয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করলাম, তখন বুঝতে পারলাম আমি জেগে আছি না ঘুমিয়ে–তা আর বোঝার ক্ষমতা নেই।

পরদিন সকালে আমি খাঁচা থেকে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম একজন সৈন্য দরজা পাহারা দিচ্ছে। আমার আশেপাশে আরও তিনটি খাঁচা ছিল, যেগুলো রাবার দিয়ে ঢাকা ছিল। তখন আমার উপলব্ধি হলো আমি একটি বড় জাহাজে আছি–এমন একটি যুদ্ধজাহাজ, যেগুলো পাকিস্তানের উপকূল থেকে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাত। আমি সারারাত ও সকালজুড়ে জাহাজের ইঞ্জিনের গম্ভীর গর্জন শুনতে পাচ্ছিলাম এবং নিশ্চিত ছিলাম এটি সেই জাহাজগুলোরই একটি, যেগুলো আফগানিস্তানে ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়েছিল।

ভয়ে আমি চোখ নড়াতেও সাহস করছিলাম না। জিহ্বা শুকিয়ে গিয়ে তালুতে লেগে গিয়েছিল। বাঁ দিকে আমি দেখতে পেলাম আরও কিছু বন্দি, যাদের একসঙ্গে একটি সেলে রাখা হয়েছিল। একজন সৈন্য কিছু খাবার নিয়ে এল এবং আরও একজন বন্দিকে জাহাজে আনা হলো।

পুরুষেরা তাদের নাশতা করছিল এবং একসঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের কথা বলার অনুমতি ছিল না, তবে খাবার দেওয়ার সময় আমরা একে অপরকে দেখতে পাচ্ছিলাম। পরে আমি দেখতে পেলাম মৌলভী ফজল, নূরী, বুরহান, ওয়াসীক সাহেব এবং রুহানী–তাঁরাও বন্দিদের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু তবু আমরা কেউ কারও সঙ্গে কথা বলতে পারিনি।

একজন সৈন্য আমার কক্ষে ঢুকে আমাকে খাঁচার শিকের সঙ্গে হাতকড়া পরিয়ে রাখল। তারা আমার কক্ষ তল্লাশি করল, এরপর প্রথমবারের মতো আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো; আমার আঙুলের ছাপ নেওয়া হলো এবং চারদিক থেকে ছবি তোলা হলো। তারা একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখে আমাকে আবার খাঁচায় ফিরিয়ে আনল। আমি দেখলাম আমার অনুপস্থিতিতে কিছু মৌলিক জিনিস রাখা হয়েছে: একটি কম্বল, একটি প্লাস্টিকের চাদর এবং এক প্লেট খাবার–ভাত এবং একটি সেদ্ধ ডিম। অনেকদিন কিছু না খেয়ে থাকার পর আমি খাবার খেয়ে খালি প্লেটটি খাঁচার সামনে দাঁড়ানো প্রহরীর হাতে ফেরত দিলাম।

আমি শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, তখন আরেকজন সৈন্য হাতকড়া নিয়ে এল। আবার শৃঙ্খলিত করে আমাকে আবার জিজ্ঞাসাবাদের ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। এবার তারা আমাকে শেখ ওসামা বিন লাদেন এবং মৌলভী মোহাম্মদ ওমরের বিষয়ে প্রশ্ন করল। তারা জানতে চাইল, তারা কোথায়, তাদের অবস্থা কেমন, এবং তালেবান বাহিনীর কিছু গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডারের ব্যাপারে–তারা কোথায় লুকিয়ে আছেন, তাদের কী হয়েছে, এবং তারা কী পরিকল্পনা করছেন। ১১ সেপ্টেম্বর প্রসঙ্গ মাত্র একবার এসেছিল, সংক্ষেপে তারা জানতে চেয়েছিল আমি কি হামলার আগে কিছু জানতাম। এসবই ছিল জাহাজের সেই অন্ধকার ও ছোট জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষে আমাকে জিজ্ঞেস করা প্রশ্ন।

আমেরিকানরা জানত–আমি নিশ্চিত ছিলাম–আমি এইসব বিষয়ে তেমন কিছু জানি না। আমি এ বিষয়ে কখনো অবহিত ছিলাম না, ১১ সেপ্টেম্বরের হামলা কিংবা কারা এর জন্য দায়ী, তাও জানতাম না। কিন্তু যেভাবে এসব আমার সঙ্গে ঘটেছে, সেভাবেই হাজার হাজার মানুষকে বদনাম করা হয়েছে, গ্রেফতার করা হয়েছে এবং হত্যা করা হয়েছে–বিচার ছাড়াই, প্রমাণ ছাড়াই যে তারা অপরাধে জড়িত।

জাহাজে থাকাকালীন আমি মনে করতাম হয়তো আর কখনো আমার পরিবার বা বন্ধুদের দেখতে পাব না। তারা কখনো জানবে না আমার কী হয়েছে। কোনো মানুষকে এমন হতাশায় পড়া উচিত নয়, বিশেষ করে একজন মুসলমানের। কিন্তু তখন আমি মনে করছিলাম সোভিয়েত আগ্রাসনের সময়, রাশিয়ানদের আচরণ আফগানিস্তানে কেমন ছিল। আমি ভাবছিলাম সেই ষাট হাজার আফগানদের কথা, যাদের সোভিয়েত দানব গিলে ফেলেছিল। তারা চিরতরে হারিয়ে গিয়েছিল; কেউ বেঁচে ফেরেনি, কেউ জানত না তারা কোথায়।

প্রথমবারের মতো আমি হাড়ে হাড়ে অনুভব করছিলাম, সেই মানুষগুলো কেমন যন্ত্রণা ভোগ করেছিল। আমি চাইছিলাম আমার আত্মাও যেন তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়, এই যন্ত্রণা যেন শেষ হয়। আমি সেই পশুর মতো বর্বর আমেরিকান আগ্রাসীদের নির্মমতা থেকে পালাতে চাইছিলাম।

পাঁচ-ছয় দিন পর আমাদের সবাইকে ধূসর রঙের একটি ইউনিফর্ম পরানো হলো, হাত ও পা প্লাস্টিকের বাঁধনে বেঁধে দেওয়া হলো এবং মাথায় একটি সাদা ব্যাগ পরিয়ে দেওয়া হলো। আমাদের জাহাজের ডেকে নিয়ে যাওয়া হলো। আমরা হাঁটু গেড়ে বসে অপেক্ষা করছিলাম। সেই বাঁধনগুলোতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। কিছু বন্দি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল, কিন্তু সৈন্যরা কেবল চিৎকার করে বলছিল চুপ থাকতে। কয়েক ঘণ্টা পর আমাদের একটি

হেলিকপ্টারে তোলা হলো, এবং সেটি তিনবার অবতরণ করল, এরপর আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্যে নিয়ে যাওয়া হলো। প্রতিবার অবতরণের পর সৈন্যরা আমাদের হেলিকপ্টার থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিত।

আমাদের মাটিতে শুয়ে বা হাঁটু গেড়ে বসে থাকতে বাধ্য করা হতো, আর কেউ নড়লে বা অভিযোগ করলেই তারা লাথি ও ঘুষি মারত। হেলিকপ্টারে আমাদের দেওয়াল বা মেঝেতে বেঁধে রাখা হতো, এমন ভঙ্গিতে যা না দাঁড়ানো, না বসা–কোনোটাই নয়। এটি ছিল নির্যাতন, এবং প্রতিটি মুহূর্তে যন্ত্রণা বাড়ছিল। শেষ গন্তব্যের ঠিক আগের স্টপে যখন আমাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলা হয়, তখন এক সৈন্য বলল, "এইজন্যই–এইটাই বড় শিকার।" আমি তখন কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু তারা আমাকে চারদিক থেকে আক্রমণ করল, মাটিতে ফেলে কিল-ঘুষি-লাথি মারতে লাগল। কেউ রাইফেল ব্যবহার করছিল, কেউ বুট দিয়ে পিষে দিচ্ছিল।

আমার জামাকাপড় ছিঁড়ে ফেলা হলো, এবং আমি একসময় সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় বরফে পড়ে রইলাম। শীত ও বাঁধনের কারণে আমার হাত-পা অবশ হয়ে গিয়েছিল। সৈন্যরা হাসতে হাসতে গাইতে লাগল– "যুক্তরাষ্ট্রই ন্যায় ও শান্তির দেশ, এবং সে পৃথিবীর সব মানুষের জন্য শান্তি ও ন্যায় চায়।" –এই কথা তারা বারবার বলছিল। শীত এতই তীব্র ছিল যে শ্বাস নিতে পারছিলাম না, শরীর থরথর করে কাঁপছিল, কিন্তু সৈন্যরা কেবল চিৎকার করছিল– "নড়িস না!" আমি দীর্ঘক্ষণ বরফে পড়ে ছিলাম, এরপর একসময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

*****

আমি একটা বড় ঘরে জেগে উঠলাম। সামনে দুজন গার্ড ছিল, যারা বালাক্লাভা পরেছিল এবং হাতে বড় লাঠি ছিল। আমার শরীর সব জায়গায় ব্যথা করছিল। যখন আমি মাথা ঘুরালাম, দেখি ঘরের দুই কর্নারে আরও দুজন গার্ড দাঁড়িয়ে আছে, তারা আমার মাথার দিকে পিস্তল ধরেছিল। সবাই চিৎকার করছিল, "ওসামা কোথায়? মৌলভী ওমর কোথায়? নিউ ইয়র্ক আর ওয়াশিংটনে হামলায় তোমার কি ভূমিকা ছিল?"

আমার জিহ্বাও নাড়াতে পারছিল না। তা ফুলে ওঠে গিয়ে যেন আমার মুখের ওপরের অংশের সাথে আটকে গেছে। সেই ঘরে যন্ত্রণায় লুটিয়ে শুয়ে আমি মরতে চেয়েছিলাম। আল্লাহ আমাকে ধৈর্য্য ধরার জন্য ক্ষমা করবেন!

তারা বুঝতে পেরে চলে গেল যখন তারা দেখতে পেল আমি কিছু বলতে পারছি না; তারপর অন্য সৈনিকরা এসে আমাকে একটা পরিত্যক্ত ঘরে নিয়ে গেল, যার দরজা বা জানালা ছিল না। তারা আমাকে কিছু পোশাক দিয়েছিল, কিন্তু তবুও ঠাণ্ডা লাগছিল, আর আমি আবারও অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। জেগে উঠলাম একই ঘরে।

একজন নারী সৈনিক ছিল প্রবেশদ্বারে পাহারা দিচ্ছিল। সে আমার কাছে এসে প্রথমবারের মতো ভদ্রভাবে আচরণ করল, জিজ্ঞেস করল কেমন আছি এবং কিছু দরকার কিনা। এখনও আমি কথা বলতে পারছিলাম না।

আমি প্রথমে ভাবলাম আমি কিউবার কোনো স্থানে আছি, সময়ের কোনো ধারণা ছিল না, কিন্তু যখন আমি দেখি দেয়ালগুলোতে তালেবানদের নাম আর তারিখ লেখা ছিল, বুঝতে পারলাম আমি এখনও আফগানিস্তানে।

আমি প্রায়ই নড়াচড়া করতে পারছিলাম না। আমার কাঁধ আর মাথা যেন ভাঙা ছিল এবং যন্ত্রণাটি আমার প্রতিটি স্পন্দনে ছড়িয়ে পড়ছিল। নীরবে আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলাম যেন তিনি আমার সাথে সন্তুষ্ট হন এবং আমার ভাইদের এই কষ্টের মুখোমুখি হতে না হয়। রাত হলে আমি ওই নারী সৈনিককে ডাকি সাহায্যের জন্য। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম আমার নামাজ পড়তে দেওয়া হবে কিনা। সে বলল, হ্যাঁ, তোমাকে দেওয়া হয়েছে।

আমার হাত এখনো বাঁধা ছিল, তাই আমি সামান্য তয়াম্মুম করতে পারছিলাম। আমি নামাজ পড়ছিলাম যখন দুজন সৈনিক ঘরে ঢুকল। তারা আমাকে নামাজ শেষ করতে দিল তারপর জিজ্ঞেস করল কেমন লাগছে, ঠাণ্ডা লাগছে কিনা বা কিছু দরকার আছে কিনা। আমি শুধু বললাম আলহামদুলিল্লাহ। আমি কোনো অভিযোগ করতে সাহস করিনি, কারণ তারা আমার রক্তাক্ত স্যাতাকল, ফুলে থাকা হাত এবং কাঁপানো শরীর দেখতে পেত। তারা আমাকে শেখ ওসামা ও মৌলভী মোহাম্মদ ওমরের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল কিন্তু আমি কিছু বলতে পারিনি। আমার উত্তর তাদের পছন্দ হয়নি এবং আমি তাদের রাগ দেখতে পাচ্ছিলাম। যদিও তারা আমাকে হুমকি দিল এবং ভয় দেখানোর চেষ্টা করল, আমার উত্তর একই রকম ছিল, তারপর তারা চলে গেল।

আমি ছয় দিন কিছু খাইনি কারণ আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে সামরিক খাবার হালাল কিনা। প্রায় এক মাস তারা আমাকে ওই ছোট পরিত্যক্ত ঘরে রাখল, আর খাবার হিসেবে ছিল এক কাপ চা আর এক টুকরো রুটি। সৈনিকরা আমাকে ঘুমাতে দিত না। বিশদিন আমার হাত ও পা বাঁধা অবস্থায় শুয়ে ছিলাম। প্রতিদিন আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হত।

২৪ জানুয়ারি ২০০২-এ, ছয়জন বন্দি আমার ঘরে আনা হয়, বেশির ভাগই আরব ছিল। তারা কয়েক ঘণ্টা থেকে গেল তারপর আবার নিয়ে গেল। পরদিন তারা ফিরে এলো, আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম কী হয়েছে। তারা বলল, রেড ক্রস প্রতিনিধিরা ক্যাম্প পরিদর্শনে এসেছিল, বন্দিদের নিবন্ধন করছিল এবং পরিবারের জন্য চিঠি সংগ্রহ করছিল। তারা জানত না কেন তাদের লুকানো হচ্ছে। আমরা কিছুক্ষণ কথা বললাম এবং খাবার এলো, যা আমার প্রথম পুষ্টিকর খাবার ছিল।

পরবর্তী কয়েক দিনে আমরা কয়েকবার স্থানান্তরিত হলাম। প্রতিবার আমাদের চোখে পাটকি বেঁধে রাখা হত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অস্বস্তিকর ভঙ্গিতে হাঁটতে বা হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করা হত। ৯ ফেব্রুয়ারি আমরা বাগরাম থেকে সরিয়ে কান্দাহারে নিয়ে যাওয়া হল। আবার হাত ও পা বাঁধা, লাথি মারা, পিটুনি খাওয়া, কাদা দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া এবং ঠাণ্ডায় বাইরে অপেক্ষা করানো হল। অনেক বন্দি চিৎকার করছিল আর কাঁদছিলো। একই ঘটনা ঘটল যখন আমরা সেখানে পৌঁছলাম। আমি লাঠি দিয়ে মারা হলাম, পা দিয়ে টিপা হল। পাঁচজন সৈনিক আমার উপর বসে থাকল যখন আমি ঠাণ্ডা কাদায় শুয়ে ছিলাম।

তারা আমার কাপড় ছিঁড়ে ফেলল ছুরি দিয়ে। আমি ভাবলাম শীঘ্রই আমাকে হত্যা করা হবে। পরে আমাকে বাইরে দাঁড় করানো হল; তীব্র ঠাণ্ডার মধ্যেও আমি শুধু যন্ত্রণা অনুভব করছিলাম। তারা আমাকে বড় একটা তাঁবুতে নিয়ে গেলো জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। সেখানে পুরুষ ও নারী সৈনিকরা আমাকে ঠাট্টা করছিল, আর একজন আমাকে নগ্ন অবস্থায় ছবি তুলে নিল।

একটি মেডিক্যাল পরীক্ষা শেষে আবার চোখে পাটকি বেঁধে আমাকে তাঁবু থেকে টেনে নিয়ে গেলো। পথের মাঝে সৈনিকরা বিশ্রাম নিলো, আমার উপর বসে পড়ে, তারপর আমাকে অন্য বড় বন্দি তাঁবুতে নিয়ে গেলো যা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা ছিল। প্রত্যেক বন্দিকে একটি ভেস্ট, মোজা, টুপি ও কম্বল দেওয়া হয়। আমি কাপড় পরে কম্বলে ঢেকে শুয়ে পড়লাম। তাঁবুটি ঠাণ্ডা ছিল এবং ক্রমশ বন্দিরা আনা হচ্ছিল।

জিজ্ঞাসাবাদ সারাদিন ও রাত চলে। সৈনিকরা তাঁবুতে ঢুকে একজন বন্দিকে ডেকে নিয়ে যেত। বাকি সবাই তাঁবুর পিছনে সরিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হতো। বন্দিকে হাতকড়া পরিয়ে বের করে নিয়ে যাওয়ার সময় তারা নির্যাতন করত, মাথা দেয়ালের সাথে ঘষিয়ে দিত–যাতে সে দেখতে না পারে–আর খারাপ রাস্তার ওপর টেনে নিয়ে যেত।

রেড ক্রস একটি প্রতিনিধি দল ক্যাম্পে এসে আমাদের নিবন্ধন করল এবং প্রত্যেক বন্দিকে একটি আইডি কার্ড দিল। আমরা সবাই প্রতিনিধি দের সন্দেহ করতাম এবং বিশ্বাস করতাম তারা সিআইএ এজেন্ট। রেড ক্রস বন্দিদের পরিবারে যোগাযোগের ব্যবস্থা করত, চিঠি বিনিময় করত এবং কিছু বই দেয়। তারা আমাদের গোসলেরও ব্যবস্থা করত। প্রত্যেক বন্দি প্রতি মাসে একবার নগ্ন অবস্থায় অন্য বন্দিদের সামনে গোসল করতে বাধ্য হতো।

অজু করার জন্য জল দেওয়া হত না। আমরা কুয়েত থেকে বোতলজাত পানীয় জল পেতাম এবং কখনো কখনো বন্দিরা হাত-মুখ ধুয়ে নিত, কিন্তু গার্ডরা দেখলেই তাকে শাস্তি দেওয়া হত।

আমি কান্দাহারে ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ জুলাই ২০০২ পর্যন্ত বন্দি ছিলাম। আমাদের বারবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হত। আমেরিকানদের কৌশল মাঝে মাঝে বদলাত; কখনো হুমকি দিতো, কখনো ভদ্র আচরণ করতো, আবার কখনো ডিল করার চেষ্টা করতো। আমাকে আমার জীবন, জীবনী, তালেবান আন্দোলনে আমার অংশগ্রহণ ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো। কিন্তু সব আলোচনা আবার শেখ ওসামা ও মৌলভী মোহাম্মদ ওমরের কথায় ফিরে আসতো। প্রায়ই একটি মানবিক ও ভদ্র জিজ্ঞাসাবাদ যখন শুরু হত, শেষেই আমাকে জোর করে টেনে বের করে দেয়া হতো কারণ আমি শেখ ওসামা বা মৌলভী ওমরের অবস্থান সম্পর্কে কিছু জানতাম না।

প্রতি তাঁবুতে প্রায় বিশজন মানুষ ছিল। কান্দাহারের ক্যাম্প বাগরামের চেয়ে ভাল ছিল। সেখানে আমরা তিন-চারজন গ্রুপ করে বসতে পারতাম এবং কথা বলতে পারতাম; সাধারণত সুবিধাও বেশি ছিল। মোটামুটি ছয় শত বন্দি ছিল কান্দাহার ক্যাম্পে।

রাতের সময় তারা তল্লাশি করত, হঠাৎ তাঁবুতে ঢুকে বন্দিদের মাটিতে মুখ নীচু করে শুয়ে পড়তে বাধ্য করত। তাদের মালামাল এবং শরীরের প্রতিটি অংশ তারা কুকুর দিয়ে তল্লাশি করত।

খাবার ছিল না সত্যিকার; শুধু মিলিটারি রেশন দেয়া হত, যা কিছুতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের। অনেক জিনিসের মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছিল, কেউ নিশ্চিত ছিল না মাংস খাওয়া যাবে কিনা, কিন্তু বিকল্প ছিল না: খেতে হবে না হলে মারা যাবে।

জুন থেকে অবস্থা একটু ভালো হলো, যখন হালাল লেবেলযুক্ত রেশন দেওয়া হলো। নতুন রেশন ভালো স্বাদ করতো এবং আর মেয়াদও ফুরায়নি। কিছু আফগান রুটি ও মিষ্টিও দেয়া হলো, যা ছিল এক ধরনের বিলাসিতা।

হেলিকপ্টার আর বিমান রাতদিন নিকটে অবতরণ করত, জোরে শব্দ করে যা আমাদের জাগ্রত রাখত। অনেক সৈনিক রাতেও পেট্রোল করত, চিৎকার করে জাগাতো।

প্রতি দিন তিনবার বন্দিদের গণনা করত। সবাইকে একটি নম্বর দেওয়া হয়েছিল; আমি ছিলাম ৩০৬। মুক্ত হওয়া পর্যন্ত আমাকে ৩০৬ বলে ডাকা হত।

*****

যখন আমাকে বাগরামে নেওয়া হয়েছিল, প্রতিদিনই আমি আশা করতাম যে আজকের দিনটা হবে আমার শেষ দিন। আমার হাত-পা শিকলবন্দি, মাথা আর কাঁধে চোট–এই অবস্থায় আমি শুধু দেখতে পারতাম আমার অবস্থা আর তখন আমার চোখ পড়ত আমেরিকান সৈন্যদের নিষ্ঠুর, অবমাননাকর আচরণের ওপর; তখন আমার মনে হত কখনো মুক্তি পাব না।

বাগরামে যখন আমি ছয় জন বন্দিকে দেখলাম যারা আন্তর্জাতিক রেড ক্রস থেকে লুকানো ছিল, তখন বুঝতে পারলাম বাইরে কিছু চলছে। আমি বাগরামে রেড ক্রস প্রতিনিধিদের দেখতে পাইনি কারণ আমেরিকানরাও আমাকে তাদের থেকে লুকিয়েছিল, কিন্তু বাগরাম থেকে কন্দাহারে স্থানান্তরিত হওয়ার দ্বিতীয় দিন রেড ক্রসকে দেখতে পেয়েছিলাম।

তাদের সঙ্গে কোনো পশতু অনুবাদক ছিল না, শুধু উর্দু ভাষাভাষী এক জন যিনি ইসলামাবাদ অফিস থেকে ছিলেন। তিনি পাকিস্তানি নন, কিন্তু উর্দুতে দক্ষ ছিলেন। তাদের সঙ্গে আরব ভাষাভাষী কর্মীরাও ছিল। পশতু ভাষার জন্য তিনজন ছিল, যাদের মধ্যে একজন হলেন জুলিয়ান, অন্যজন প্যাট্রিক, আর একজন জার্মান যিনি পেশাওয়ার এলাকায় বেশ সময় কাটিয়েছেন, তবে তারা সবাই পশতু ভাষায় খুব কমই দক্ষ ছিলেন।

এটাই প্রথম সুযোগ ছিল যখন আমি আমার পরিবারকে বললাম যে আমি বেঁচে আছি। আমাকে একটি পেন্সিল আর কাগজ দেওয়া হয়েছিল, আর একজন সৈন্য আমার সামনে বসে ছিল যখন আমি লিখছিলাম। কাজ শেষ হলে আমি পেন্সিল আর কাগজ ফেরত দিলাম। কন্দাহারে থাকাকালীন আমার কাছ থেকে বাড়ি থেকে কোনো চিঠি আসেনি এবং আমার পরিবারের খবরও কেউ আমাকে দেয়নি, তারা কী হয়েছে সে ব্যাপারে কোনো তথ্য ছিল না।

রেড ক্রসের প্রতিনিধিরা বারবার আসা-যাওয়া করতেন, বারবেড তারের বাইরে দাঁড়িয়ে আমাদের সাথে কথা বলতেন। তারা আমাদের স্বাস্থ্যের এবং অন্যান্য সমস্যার কথা জিজ্ঞাসা করতেন। তারা বলতেন আমাদের যা কিছু বলব তা গোপন থাকবে এবং আমেরিকানদের জানানো হবে না। কিন্তু আমরা সন্দেহ করতাম। আমরা তাদের বিশ্বাস করতে পারতাম না, তাই আমরা আমাদের মনখুলে কথা বলতাম না। আমরা তাদের কাছে আমাদের সমস্যা বলতাম না, কারণ তাদের চোখের সামনে আমেরিকানরাও আমাদের তল্লাশি করত, গ্রেপ্তার করত, মাটিতে ঠেলত, কখনো কখনো দুই বা তিনজন সৈন্য একসাথে আমাদের ওপর বসত। রেড ক্রসের প্রতিনিধি এই দৃশ্য দেখতেন, কিন্তু তারা সাহায্য করতে পারতেন না।

আরব বন্দিরা বলেছিল সবাই সাবধান হোক রেড ক্রসের কাছে কী বলবে। তাদের মতে, অনেক আমেরিকান গুপ্তচর রেড ক্রসের প্রতিনিধি ছদ্মবেশে আসতো, সাহায্যের ছলে আমাদের ধোঁকা দিত। তবু আমাদের কাছে আমেরিকানদের জন্য কোনো তথ্য ছিল না। আমাদের কোনো গুপ্তচরবৃত্তির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না। আমাদের জন্য সবচেয়ে স্পর্শকাতর বিষয় ছিল অভিযোগ এবং অনেক ভাই যখন ধরা পড়েছিল তখন তারা মিথ্যা নাম ও ঠিকানা দিয়েছিল। ফলে তারা রেড ক্রসকে নতুন ঠিকানা দিতে পারছিল না, তাই চিঠিগুলো ভুল জায়গায় পৌঁছাচ্ছিল।

রেড ক্রসকে সত্য বলা কঠিন ছিল, কারণ আমরা ভয় পেতাম তথ্য আমেরিকানদের কাছে যাবে। গুয়ান্তানামোতে থাকাকালীন আমিও একই সন্দেহ করতাম।

আমরা বুঝতে পারিনি রেড ক্রস কতোটা সাহায্য করছিল কন্দাহারে। তবে আমি তিনটি বিষয় জানতাম: প্রথমত, তারা আমাদের পরিবারদের সঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করাতো, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল; দ্বিতীয়ত, তারা প্রতি কুড়ি ব্যক্তির জন্য চারটি কুরআন সরবরাহ করত; এবং তৃতীয়ত, তারা আমাদের প্রথম স্নানের ব্যবস্থা করেছিল চার মাস পর, যদিও সেটা সমবায় এবং নগ্ন স্নান ছিল যা খুব লজ্জাজনক ছিল। তারা আমাদের পরিষ্কার পোশাকও দিয়েছিল।

রেড ক্রস বলেছিল সবকিছু তাদের পরামর্শেই হয়েছে।

আমাদের রক্ষীরা প্রতিদিন দুই শিফটে বদলাতো এবং অনেক নিম্নপদস্থ সৈন্য মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ করত। তারা দেখলেই আমাদের লাইন করে দাঁড় করাত এবং মাটির দিকে তাকাতে বলত। কারো নম্বর ডাকলে তাকে ‘ওয়েলকাম’ বলতে হত। যেকোনও বন্দি যদি আজ্ঞা না মানতো, তাকে শাস্তি দিত।

প্রতিদিন আমাদের সবাইকে বাইরে লাইনে দাঁড় করিয়ে রাখা হত, অনেক সময় দেড় থেকে দুই ঘণ্টা পর্যন্ত, ছায়াতে দাঁড়ানো নেওয়া নিষেধ ছিল, কেউ বসতেও পারত না, যেকোনো অবস্থাতেই। আল্লাহ ওই সৈন্যদের কঠোর শাস্তি দিক!

রক্ষীরা প্রতিদিন পর্যবেক্ষণ করত, বারবেড তারের বাইরে এবং ভেতরে। একবার এক সৈন্য মাটিতে একটা ভাঙা কাঁচের টুকরো পেয়েছিল, সে সবচেয়ে নিষ্ঠুর সৈন্যদের একজন ছিল। কাঁচটা আমাকে ধরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল এটা কোথা থেকে এসেছে। আমি তাকে ফিরে দিলাম বললাম জানি না, আগে থেকেই ছিলো সম্ভবত।

সে বারবার জিজ্ঞাসা করছিল। "কথা বলিস না, আমি তোকে মারবো," সে চেঁচিয়ে বলল। আমাকে হাত মাথার পিছনে নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করল কয়েক ঘণ্টা। মাঝে মাঝে লাথি মারত বা ফেলে দিত মাটিতে। সৈন্যদের আচরণ নিয়ে অভিযোগ করার কোনো লাভ ছিল না, এতে শাস্তি আরও বেড়ে যেত।

আমি কখনোই এই দাস স্বরূপ শাসকদের হাতে আমার যে অত্যাচার সহ্য করেছি তা ভুলবো না।

*****

কান্দাহার কারাগার ক্যাম্পে বিভিন্ন সেকশন ছিল। সাধারণ কারাগার টেন্টের পাশেই একটি পুরানো হ্যাঙ্গার ছিল — আগে এটি বিমান মেরামতের কর্মশালা হিসেবে ব্যবহৃত হত — এখন সেটি বন্দীদের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছিল। অধিকাংশ বন্দী এটিকে চরম শাস্তির স্থান হিসেবে ভয় পেত। আমি বেশ কয়েকবার দেখেছি যে বন্দীদের লোহার চেইন দিয়ে বেঁধে হ্যাঙ্গারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আরেকটি পৃথক স্থানে তারা বন্দীদের ঘুম থেকে বঞ্চিত করত, অনেক মাস ধরে বন্দী রাখত। ক্যাম্পটি ছয়টি ওয়াচটাওয়ার দ্বারা পাহারা দেওয়া হত এবং পায়ে ও গাড়ি চালিয়ে সারাদিন-রাতি পেট্রোলিং চলত।

আমি কান্দাহারে বন্দী থাকাকালীন অনেক গল্প শুনেছি। একদিন একটি নতুন বন্দী আমাকে আটক করা টেন্টে আনা হয়। তিনি ছিলেন একজন খুব বৃদ্ধ। দুইজন সৈন্য তাকে কঠোরভাবে টেনে টেন্টে নিয়ে এসে মেঝেতে ফেলে দেয়। তাকে দাঁড়ানোর আদেশ দেওয়া হয়, কিন্তু তিনি দাঁড়াতে পারছিলেন না এবং বুঝতে পারছিলেন না যে সৈন্যরা কি বলছে। তিনি বিভ্রান্ত মনে হচ্ছিলেন; অন্য বন্দীরা তাকে দাঁড়াতে বলল, কিন্তু মনে হচ্ছিল তিনি সৈন্য ও বন্দীদের পার্থক্যই করতে পারছেন না।

দ্বিতীয় দিন যখন তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয় এবং তাকে শুয়ে হাত-পা বাঁধতে বলা হয়, তখনও তিনি বুঝতে পারেননি। অন্য বন্দীদের কেউ তার সাহায্য করতে পারছিল না; আমাদের টেন্টের এক প্রান্তে চলে যেতে বলা হয়েছিল। কিছুক্ষণ পর সৈন্যরা রোষ ঝাঁপিয়ে তাকে লাথি মারল। এক সৈন্য তার পিঠে বসে গেল, আর অন্যরা তার হাত বেঁধে দিল। বৃদ্ধ ব্যক্তি চিৎকার করছিলেন। তিনি ভাবছিলেন তাকে মেরেই ফেলা হবে এবং চিৎকার করে বলছিলেন, "কাফিরগণ! আমাকে আগে নামাজ পড়তে দাও তোমরা আমাকে মেরো!"

আমরা টেন্টের পিছন থেকে চিৎকার করছিলাম যে তাকে শুধু জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং সে আবার ফিরে আসবে, কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন তিনি মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থায় আছেন। আমি একই সাথে কেঁদেছিলাম এবং হাসছিলাম। বৃদ্ধ মানুষকে বাইরে টেনে নিয়ে যাওয়া দেখেও আমার ভেতর প্রচুর রাগ জমে ছিল।

যখন তিনি ফিরে এলেন, আমি বসে তার সাথে কথা বললাম। তিনি বললেন তিনি উরুজগান প্রদেশ থেকে এবং চারচিনো জেলার বাসিন্দা। তিনি আমাকে বললেন তিনি ১০৫ বছর বয়সী, এবং তিনি গুয়ান্তানামোর নরকের প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত মানুষ ছিলেন।

ক্যাম্পে আমরা একসাথে জামাতে নামাজ পড়তাম। এক সকালে আমি যখন ফজরের নামাজে ইমামতি দিচ্ছিলাম, তখন আমরা প্রথম রাকাত শুরু করতেই কয়েকজন সৈন্য আমাদের টেন্টে ঢুকে এক আরব ভাইয়ের নাম ধরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকার শুরু করল। ভাইটি সরলভাবে তার নামাজ চালিয়ে যাচ্ছিল যেমন আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন। দ্বিতীয় বারও তাকে ডাকা হল। তৃতীয় বার আসার সাথে সাথে সৈন্যরা দৌড়ে ঢুকে আমাকে মাটিতে ফেলে মাথা মেঝেতে চেপে ধরে, নিজে আমার ওপর বসে গেল, আর অন্য দুজন মিস্টার আদিল, তিউনিস থেকে আগত আরব ভাইকে ধরে টেনে বাইরে নিয়ে গেল। ইসলামের কোনো সম্মান ছিল না।

প্রতিদিন বন্দীদের সাথে খুবই খারাপ ব্যবহার হত। ক্যাম্পের চিকিৎসক শুধু একটি পাকিস্তানি ভাইয়ের কষ্ট করা দাঁতের জন্য টাইলেনল দিয়েছিলেন। তার জন্য খাওয়া কষ্টকর এবং কঠিন ছিল, তবুও নির্ধারিত ত্রিশ মিনিটের মধ্যে সে খাবার শেষ করতে পারছিল না। যখন সৈন্য তার প্লেট নিতে এলো, তখন সে আরও সময় চাইল দাঁতের সমস্যার কারণে। সৈন্য তাকে ক্যাম্পের প্রবেশদ্বারে নিয়ে গিয়ে তার মুখে আঘাত করলো, আর আমরা অসহায়ভাবে সেটি দেখছিলাম।

পাকিস্তানি ভাইয়ের ওপর এভাবে নির্যাতন দেখে আমরা অনশন ধর্মঘট শুরু করার সিদ্ধান্ত নিলাম। খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল এবং পুরো ক্যাম্প খাবার বন্ধ করল। ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ আসলো এবং ধর্মঘটের কারণ জানতে চাইলো, আমরা তাদেরকে সৈন্যের নির্যাতনের কথা জানালাম এবং আর সহ্য করব না বললাম। তারা আশ্বাস দিল যে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা রোধ করা হবে এবং আমরা অনশন ধর্মঘট বন্ধ করলাম। যদিও আমরা কঠোর অবস্থার মধ্যে ছিলাম, তবুও এটি ছিল আমেরিকান আগ্রাসীদের কাস্টডিতে প্রথম অনশন ধর্মঘট।

পরের দিন মোহাম্মদ নবাব, যিনি খুব অসুস্থ ছিলেন এবং দাঁড়াতে পারছিলেন না, তাকে মারধর করা হলো এবং লাথি মারা হলো। সৈন্যরা টেন্ট পরিদর্শনে এসেছিল এবং বন্দীদের পিছনে সরতে বলেছিল। মোহাম্মদ নবাব সরেননি, বিছানায় থাকেন। সৈন্যরা তাকে দেখে মারধর শুরু করল এবং শেষে তাকে টেন্টের এক প্রান্তে ফেলে দিল।

আমি বলতে চাই যে সব আমেরিকান সৈন্য এমন ব্যবহার করত না; কিছুজন শালীন এবং সম্মানজনক ছিলেন এবং সহকর্মীদের নির্যাতনে অংশ নিতেন না।

কিছু নির্যাতন অন্যদের তুলনায় খারাপ এবং ক্যাম্পের সবাইকে প্রভাবিত করত। একদিন দুপুরে আমি শুনে উঠলাম বন্দীরা কাঁদছে। পুরো ক্যাম্প জুড়ে গড়গড় শব্দে কান্না শোনা যাচ্ছিল। আমি মোহাম্মদ নবাবকে জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে। তিনি বললেন একজন সৈন্য পবিত্র কুরআন নিয়ে তার ওপর মূত্রত্যাগ করেছে এবং তারপর সেটি ফেলে দিয়েছে আবর্জনায়। আমাদের রেড ক্রস থেকে কিছু কুরআনের কপি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এখন আমরা তাদেরকে সেগুলো ফিরিয়ে নিতে বললাম। আমরা তাদের সৈন্যদের থেকে রক্ষা করতে পারতাম না, যাঁরা প্রায়ই আমাদের শাস্তির জন্য এগুলো ব্যবহার করত। রেড ক্রস প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এমন ঘটনা আর হবে না, কিন্তু নির্যাতন চলতেই থাকল। অনুসন্ধান কুকুররা কুরআনের গন্ধ নিয়ে আসত এবং সেই সৈন্য কুরআনের কপি মাটিতে ফেলে দিত। কান্দাহারে আমার থাকা সময় এই সব ঘটনার অবসান হয়নি। একই সৈন্য কুরআনের এবং ইসলামের প্রতি কোনো সম্মান দেখাত না।

বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন এবং হেয় প্রহার এরকম অনেক ঘটনা ছিল। সৈন্যরা বন্দীদের নিয়ে প্রশিক্ষণ করতো, যেন তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষার খরগোশ: তারা গ্রেপ্তার করার কৌশলগুলো অনুশীলন করতো—এগুলো সবই ক্যামেরায় রেকর্ড হতো—আর বন্দীদের পেটানো হতো, তাদেরকে কষ্টদায়ক অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে বলা হতো। এমন অনেক গল্প আছে যা অন্তহীন।

এই সময়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলতেই থাকল। এক রাতে, আমি কয়েক মাস ধরে কান্দাহারে বন্দী থাকার পর আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হল। আমাকে জিজ্ঞেস করা হল, আমি কি বাড়ি যেতে চাই? তারা বলল আমার আটক থেকে তাদের কোনও লাভ হয়নি, তারা আমার অ্যাম্বাসেডরের কাজ ছাড়া অন্য কোনো দোষ প্রমাণ করতে পারেনি। তারা আমাকে মুক্ত করার পরিকল্পনা করছে, বলল তারা। টাকা, ফোন আর যা যা লাগবে সব ব্যবস্থা করবে। সবকিছু বলার পর মুক্তির শর্তও জানালো তারা: আমাকে শুধু শেখ ওসামা এবং মৌলভী মোহাম্মদ ওমারের সন্ধানে সাহায্য করতে হবে। আমি যে কোনোদিন এই রকম মুক্তির চেয়ে আটকনাই পছন্দ করব। কোনো মুসলিম ভাইয়ের জীবনের মূল্য আমি কখনো মেপে দেখার সাহস করব না!

আমি তাদের প্রশ্ন ছাড়িয়ে বললাম, আমার আটক কেন হয়েছে? তারা বলল, তারা বিশ্বাস করে আমি আল-কায়েদা, তালেবান, তাদের আর্থিক শাখাগুলো এবং নিউ ইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে হওয়া হামলার ব্যাপারে জানি। এইসব অভিযোগ তদন্তের জন্য আমাকে আটক করা হয়েছে। যেহেতু তারা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের কোনো প্রমাণ পায়নি, তাই আমার নির্দোষ হওয়া উচিত, আমি বললাম। আমাকে পাকিস্তানি সরকার গ্রেপ্তার করেছিল, তাই আমাকে শর্ত ছাড়াই মুক্তি দিতে হবে।

তিন দিন ধরে তারা আর্থিক সহায়তা এবং চুক্তির সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করল যদি আমি তাদের শর্ত মেনে নিই, কিন্তু আমি সব অফার প্রত্যাখ্যান করলাম। তাদের আচরণ আবার বদলে গেল। তারা আমাকে এবং আমার জীবনের জন্য হুমকি দিল।

পরের দিন সৈন্যদের একটি দল টেন্টে এসে কিছু হাতকড়া ছুঁড়ে দিলো বন্দীদের দিকে। তারা হাতকড়া পরে একসাথে বেঁধে নিয়ে গেল। আমরা সবাই ভেবে উঠলাম কি ঘটছে। কেউ কেউ মনে করেছিল আমরা মুক্তি পাচ্ছি; অন্যরা ধারণা করল হয়তো স্থানান্তর হচ্ছে। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সবাইকে ফিরিয়ে আনা হলো। প্রত্যেকের দাড়ি, চুল এবং ভ্রু শেভ করা হয়েছে। প্রতিটি চুলই কেটে ফেলা হয়েছে।

এটাই সবচেয়ে কঠোর শাস্তি। ইসলামে দাড়ি কাটানো হারাম। হানাফি মতের মতে এটা পাপ। দাড়ি শেভ করানোর থেকে মরাই উত্তম। আমি পরের দলেই ছিলাম যাদেরকে নাপিতদের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। আমি নাপিতকে বললাম আমার দাড়ি কাটিও না; সে আমার মাথায় চরম ঠাপড় মারল। ব্যথা এত তীব্র ছিল যে কয়েক মিনিট আমি চোখ খুলতে পারিনি। পরে যখন একজন ডাক্তার আমার মুখে কি হয়েছে জিজ্ঞেস করল এবং আমি নাপিতকে নিয়ে অভিযোগ করলাম, তখন ডাক্তার আমাকে আরেকটা ঠাপড় মারল এবং বলল আমেরিকান আগ্রাসীদের নিয়ে অভিযোগ করব না।

একবারের জিজ্ঞাসাবাদে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আমি মিস্টার মুতাওয়াকিলকে জানি কিনা এবং তার সম্পর্কিত আরও কয়েকটি প্রশ্ন ছিল। শেষে আমাকে জিজ্ঞেস করা হল আমি তাকে দেখা চাই কিনা। আমি সন্দেহ করেছিলাম সে গ্রেপ্তার হয়েছেন কিনা এবং কোথায় আছেন, কীভাবে দেখা করব। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তিনি ঘরে ঢুকলেন। তিনি আমাকে একটি প্যাকেট পাকিস্তানি বিস্কুট নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু আমার হাত বেঁধে ছিল এবং আমি খেতে পারছিলাম না। আমাকে সেটাও নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। আমরা প্রায় দশ থেকে পনেরো মিনিট কথা বললাম, তারপর তিনি চলে গেলেন। সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎ থেকে আমি জানতে পারলাম শীঘ্রই আমাকে কিউবায় স্থানান্তর করা হবে। মুতাওয়াকিল এ ব্যাপারে বেশি কিছু বললেন না। তিনি জানতেন আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন আমার ভাগ্য।

পরের দিন আবার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়। আমাকে জানানো হয় ১ জুলাই আমাকে কিউবায় স্থানান্তর করা হবে। ইন্টারোগেটর বললেন যারা কিউবায় যাবে তারা সারা জীবন সেখানে কাটাবে এবং হয়তো তাদের দেহ আফগানিস্তানে ফিরবে না। এটা আমার শেষ সুযোগ, সে বলল; আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে বাড়ি ফিরতে চাই কিনা বা কিউবায় যেতে চাই। আবার মুক্তির শর্ত জানানো হলো: বাড়ি ফিরতে হলে আমাকে আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে কাজ করতে হবে, আল-কায়েদা ও তালেবান নেতাদের খুঁজে পেতে সাহায্য করতে হবে, বাকি জীবন তাদের দাস হয়ে থাকতে হবে। আল্লাহ আমাদের এমন পাপ থেকে রক্ষা করুন!

একদিন চিন্তা করার সময় দিলেও আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম: "আমি এখানে আটক অন্য ভাইদের চেয়ে বেশি প্রতিভাবান বা গুরুত্বপূর্ণ নই। আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইচ্ছায় মেনে নিয়েছি আমার ভাগ্য। আমি কোনো

অপরাধ করিনি, তাই কোনো অপরাধ স্বীকার করব না। এখন আপনাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমার সাথে কী করা হবে এবং আমাকে কোথায় স্থানান্তর করা হবে।" এই জিজ্ঞাসাবাদের পরে আমি আশা করছিলাম শীঘ্রই স্থানান্তর ঘটবে।

GUANTÁNAMO BAY

২০০২ সালের ১ জুলাই আমাকে আবার নাপিত কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আবার শেভ করা হয়। এরপর সৈন্যদের একটি দল এসে টেন্টের প্রবেশদ্বারে শেকল ছুঁড়ে দেয়। একে একে আমাদের সবাইকে শেকলে বেঁধে কিউবার জন্য স্থানান্তর করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়। আমি সেই সারির চতুর্থ ব্যক্তি ছিলাম। আমাদের হাত ও পা বাঁধা ছিল এবং মাথায় কালো থলাপোশ পড়ানো হয়েছিল, সাত বা আটজন করে গুচ্ছবদ্ধ শেকলে বেঁধে রাখা হয়।

আমাদের অন্য একটি অপেক্ষার জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়; তখন কালো থলাপোশ গুলো খুলে ফেলা হয় এবং বদলে কালো চশমা পড়ানো হয় এবং কান প্লাগ লাগানো হয়। বিমানে নেওয়ার আগে আমাদের আবার ছবি তোলা হয় এবং লাল রঙের পোশাক ও লাল জুতো দেওয়া হয়। মুখে মাস্ক চাপানো হয়, আর হাত-পা দুই ধরনের শেকলে বেঁধে দেয়া হয়। বিমানে উঠে আমাদের পা জোড় করে বিমানের মেঝেতে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয় এবং হাত পেছনদিকে বাঁধা হয়, মেটাল চেয়ারে লক করা হয়। এক ইঞ্চিও স্থানান্তর করা সম্ভব ছিল না। খুব কষ্টদায়ক অবস্থায় থাকতে হয়েছিল। বিমান ওঠার কিছুক্ষণ পরেই কিছু বন্দী শেকল ছাড়ানোর চেষ্টা করে চিৎকার করতে থাকে, কষ্ট পেয়ে রড়মড় করতে থাকে। পুরো যাত্রাকাল শেকলবন্দি ছিলাম এবং বাথরুম ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়নি।

বিমান ওঠার চার ঘন্টা আগে থেকে আমাদের ওই অবস্থায় আটকে রাখা হয় এবং অবতরণের পর তিন ঘণ্টা পর্যন্ত ও তেমনই থাকতে হয়। মোটামুটি ত্রিশ ঘণ্টা ধরে ওই চেয়ারে আটকে ছিলাম। শেকলগুলো হাত ও পায়ের রক্ত সঞ্চালন বন্ধ করে দেয়। দশ ঘণ্টার মধ্যে হাত-পায় রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছিলাম। হাতের ফোলা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে আমেরিকান সৈন্যরা হাতকড়া খুলতে কষ্ট পেত, কারণ এগুলো মাংসের ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। বিমানটি ফ্লাইটের মধ্যে একবার নামেছিল, তারপর কিউবায় পৌঁছেছিল।

বিমানের বাইরে নামার পর আমরা সারিতে দাঁড়ানোর আদেশ পেলাম এবং আরবি ও ইংরেজিতে চিৎকার করা হলো: “হেলান দিও না! নিজের জায়গায় থাকো!” কিন্তু ত্রিশ ঘণ্টা শেকলে বাঁধা থাকার পর হাত-পা ব্যথা নিয়ে কিছু মানুষ নড়াচড়া করতে শুরু করলো। সেটি দেখেই এক সৈন্য তাদের লাথি মারতে আর পেটাতে শুরু করল। আমাকে তিনবার লাথি মারা হয়।

আমাদের ঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য নেওয়া হল। এরপর আমাকে একটি জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয় এবং একটি চেয়ারে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। কিছুক্ষণ পর একজন ইন্টারোগেটর এল–একজন পারস্য অনুবাদককে সঙ্গে নিয়ে। তিনি নিজেকে টম বলে পরিচয় করালেন। তিনি আমাকে প্রশ্ন করবেন বললেন। দীর্ঘ এবং কষ্টকর যাত্রার পর আমি এত ক্লান্ত ছিলাম যে বললাম আমি শুধু

যেখানে থাকব সেখানে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাই এবং আগামিকালের জন্য কথা বলতে চাই। কিন্তু টম জোর দিয়ে বললেন এখনই কথা বলবে।

আমার মুখ শুকনো ছিল, প্রায় ঘুমিয়ে পড়ছিলাম। তখন পর্যন্ত সবাই আমাকে কিউবার স্থানান্তর এড়াতে বলেছিল, কিন্তু আমি যখন এসে পৌঁছেছি তখন আর ভয়ের কিছু ছিল না। আমি শাস্তি নিয়েও আর পাত্তা দিচ্ছিলাম না। গুয়ান্তানামোতে আমরা মৃত্যু বেঁচে থাকার চেয়ে ভালো মনে করতাম। টম যতই জোর দিল, আমি খুব কমই তার প্রশ্নের উত্তর দিলাম এবং শেষ পর্যন্ত সে চলে গেল।

আমাকে একটি ছোট খাঁচায় নিয়ে যাওয়া হয়, যা শিপিং ক্রেট দিয়ে তৈরি ছিল। হাত ও পা থেকে শেকল খুলে দেওয়া হয় এবং আমাকে একা ফেলে দেয়া হয়। খাঁচায় আমার জন্য খাবার রাখা ছিল, কিন্তু আমার সবচেয়ে বেশি খুশি করেছিল পরিমিত পরিমাণ পানি পাওয়া। এটা মাস কয়েক পর প্রথমবার ছিল আমি এত পরিমাণ পানি পেয়েছিলাম যে ওযু করার জন্য যথেষ্ট ছিল। আমি গোসল করলাম, নামাজ পড়লাম, তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম। ভালো ঘুম হল, রাতের নামাজ মিস করেও প্রায় সকাল হওয়ার আগে উঠলাম।

*****

আমার খাঁচাটি গুয়ান্তানামো কারাগারের গোল্ড ব্লকে ছিল। সৈন্যরা আমাদের বাগরাম বা কান্দাহারের থেকে ভালো ব্যবহার করত, এবং আমরা একে অপরের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেতাম। যদিও খাঁচায় থাকা একা মনে হত, আফগানিস্তানে মাসখানেক বন্দি থাকার পর সেখানে কিছুটা স্বাধীনতার অনুভূতিও ছিল।

খাঁচাগুলো ছিল প্রায় চার ফুট চওড়া, ছয় ফুট লম্বা এবং একে একে সারিবদ্ধ ছিল। প্রতিটি খাঁচায় ছিল একটি ধাতব পাটাতন ঘুমানোর জন্য, একটি পানির নল এবং একটি টয়লেট। আসল দেয়াল ছিল না, কেবল ধাতব জাল যা খাঁচাগুলোকে আলাদা করত। অন্য বন্দীদের সামনে গোসল করা ও টয়লেট ব্যবহার করা খুবই অস্বস্তিকর ছিল। আমাদের মধ্যে অনেক বিভ্রান্তি ছিল। কেউ কেউ ভেবেছিল আমরা কিউবায় নই, বরং পারস্য উপসাগরের কোনো দ্বীপে আছি, আবার কেউ ভাবত এটা গুয়ান্তানামোর পথে একটি সাময়িক শিবির মাত্র। আমরা বিভিন্ন দিকে নামাজ পড়তাম কারণ কেউ জানত না মক্কা কোথায়।

শিবিরে আমাদের আন্তর্জাতিক রেড ক্রস প্রতিনিধি দেখতেন, যারা বলতেন তারা বিমানবন্দরে গিয়ে নিশ্চিত হয়েছেন যে সৈন্যরা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করেনি।

"কিন্তু বাসে তারা আমাদের ড্রামের মতো পেটিয়েছে," আমি তাদের বললাম।

"আমরা বিমানবন্দরে ছিলাম, কিন্তু বাসে ছিলাম না," একজন প্রতিনিধি বলল।

গুয়ান্তানামোর শুরুদিনগুলোতে আমরা লাল ক্রসের সাথে পরিচিত হয়েছি। তারা বন্দীদের ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করত এবং কিছুটা স্বাধীনভাবে কথা বলতে দেয়, তবে বন্দীরা আমেরিকান গোয়েন্দা সরঞ্জাম দেখে খুব সাবধান ছিল এবং কথা বলার সময় সতর্ক থাকত।

যখন কোনো বন্দী রেড ক্রস প্রতিনিধির কাছে যাওয়ার জন্য নেওয়া হত, সৈন্যরা একটি বিশেষ দড়ি দিয়ে তার হাত বেঁধে নিত। সেখানে গেলে একটি হাত খুলে দিত, আর টেবিলে সাধারণত চা, বিস্কুট ও রস রাখা থাকত। তারা আমাদের সাক্ষাৎকার নিত এবং কেউ বাড়িতে বা বন্ধুদের কাছে চিঠি লিখতে চাইলে তা করত।

সময় নিয়ে প্রক্রিয়াটি পরিবর্তিত হয়। দড়ির বদলে লোহার শেকল ব্যবহৃত হতে শুরু করে, কিন্তু রেড ক্রস এখনও বন্দীদের সাক্ষাৎকার নিত। তারা মাঝে মাঝে বন্দীদের সেলেও সাক্ষাৎ করতে যেত।

কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত পশতু ভাষার অনুবাদক ছিল না। কিছু ইউরোপীয় ছিল যারা সামান্য পশতু বলতে পারত, কিন্তু তারা আমাদের বুঝত না, আমরা তাদের বুঝতাম না। ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হত রেড ক্রস প্রতিনিধিদের মধ্যে গুপ্তচর আছেন, তাই আমরা তাদের নিয়ে সন্দেহ করতাম। আমি নিজেও সন্দেহ করতাম, ভাবতাম তারা গুপ্তচর হতে পারে।

একদিন জার্মানি থেকে আসা অনুবাদক আমার কাছে এলো এবং আমাকে দেখে বলল, "তুমি কোথাও আগে দেখেছি আমার মনে হচ্ছে।"

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "কি হয়েছে? কেন আমাকে এমন দেখছো?"

তিনি বলল, "তোমাকে কোথাও আগে দেখেছি মনে হচ্ছে।"

আমি বললাম, "অবশ্যই, তুমি হয়তো আমাকে দেখেছো; আমি তোমাকে অনেকবার Kandahar কারাগারে দেখেছি এখানে আনার আগে।" কিন্তু তিনি বললেন, তিনি কান্দাহার এ আমাকে দেখেননি। "হয়তো তোমাকে টেলিভিশনে দেখেছি। তোমার মুখ আর গঠন খুব পরিচিত।"

তিনি আমার নাম জানতে চাইলেন, আমি বললাম আমি মৌলভী আব্দুল সালাম জাঈফ, তালেবানের পাকিস্তানে দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত। তিনি অবাক হয়ে বললেন, "ওহ, কেমন আছো?" তারপর কোন সংযোগ ছাড়াই জিজ্ঞেস করলেন, "মৌলভী দাদুল্লাহ? তুমি জানো তিনি কোন ব্লকে আছেন?"

আমি তার প্রশ্নে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বন্দি হওয়ার পর থেকে আমি মৌলভী দাদুল্লাহ সম্পর্কে কিছু শুনিনি বা দেখিনি। তখন মনে হলো হয়তো তাকে বন্দি করে কিউবায় আনা হয়েছে।

“সে কি আটকানো হয়েছে?” আমি জিজ্ঞেস করলাম। “কখন? আমি জানতাম না সে আটকানো হয়েছে।”

তিনি বললেন, “সে এখানে নেই।”

আমি বললাম, “আমি জানি না।”

লাল ক্রসের কাছে গুয়ান্তানামোর সমস্ত বন্দীর পূর্ণ তালিকা ছিল; তারা জানত কারা এখানে আছেন, কারা নেই, তাই তার এমন ফাঁকা এবং এড়িয়ে যাওয়া প্রশ্ন আমাকে সন্দেহজনক করে তোলে।

গুয়ান্তানামোর বন্দীদের মধ্যে দুইজনের একটি পা হারিয়ে গেছে। একজন ছিল আব্দুল রউফ, অন্যজন সুলেমান। আমেরিকানরা ভাবত তাদের একজন হতে পারে দাদুল্লাহ, কিন্তু কেউই তিনি ছিলেন না।

বন্দীরা পুরোপুরি বিশ্বাস করত না যে সমস্ত রেড ক্রস প্রতিনিধি গুপ্তচর, তবে মনে করত যে আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থাগুলো লাল ক্রসের ভিতরে গুপ্তচর রেখে দিয়েছে। এই সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও তাদের পাঠানো চিঠি সবচেয়ে ভাল ছিল।

তারা বইও নিয়ে আসত গুয়ান্তানামোতে, কিন্তু আমেরিকানরা তা নিয়ে যেত। আমরা যদি আমাদের পরিস্থিতি, খাবার বা অসুস্থতার ব্যাপারে অভিযোগ করতাম, তাহলে আমাদের জন্য পরিস্থিতি আরও খারাপ হত। উদাহরণস্বরূপ, যখন আমরা রেড ক্রস প্রতিনিধিদের বলতাম আমাদের যথেষ্ট খাবার দেওয়া হয় না, তারা আমাদের অভিযোগ আমেরিকানদের কাছে পৌঁছে দিত, যারা রেগে যেত। পরের সপ্তাহে খাবারের মেনু আরও খারাপ হত।

আমি মনে করি বাম ফুসফুসে ব্যথা এবং কান ব্যথা ছিল। আমি অনেক কষ্ট পাচ্ছিলাম এবং রেড ক্রসকে সাহায্যের জন্য বলেছিলাম। একবার লাল ক্রসের একজন প্রতিনিধি আমাকে পরীক্ষা করেছিল এবং আমেরিকান ডাক্তারদের জানিয়েছিল আমার সমস্যাগুলো। কিন্তু ডাক্তাররা আমাকে চিকিৎসা করেনি; আমি কোনো ওষুধ পাইনি, কোনো পরীক্ষা হয়নি। প্রতি সপ্তাহে আমি ব্যথা ও অসুস্থতার অভিযোগ করতাম কিন্তু কেউ সাহায্য করত না।

একবার বদরুজামান বদরের সেল-এ লাল ক্রসের একজন প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছিল। সে ইংরেজিতে নিজের কষ্ট বর্ণনা করছিল। সেল এর বাইরে থাকা সৈন্যরা তার কথা বুঝতে পারছিল এবং সে শেষ হওয়ার আগেই সেল ব্লকের এনসিও এসে বাদরের সব কাপড়-পোশাক ও জিনিসপত্র ছিনিয়ে নেয়।

বদরুজামান বলল, “আমি কিছুই করিনি। কেন আমাকে শাস্তি দিচ্ছ?”

সে বলল, “চুপ কর। জিনিসগুলো দাও।”

বদরুজামান তার সব জিনিস রেড ক্রস প্রতিনিধির সামনে দিতে বাধ্য হয়। প্রতিনিধি শুধু দাঁড়িয়ে দেখছিল; কিছু করতে পারছিল না। সাক্ষাৎকার শেষে বদর যখন আবার সেল এ একা ছিল, তখন সার্জেন্ট ফিরে এসে বলল, “ওহ, পাগল! তুমি কার কাছে অভিযোগ করছ? তুমি কি মনে করো সে তোমার জন্য কিছু করতে পারবে?”

তারপর সে বদরের জিনিস ফেরত দেয়।

এরপর থেকে আমরা রেড ক্রসকে বেশি অভিযোগ করতাম না। তবুও সবাই তাদের সাক্ষাৎকারে যাওয়ার জন্য উৎসাহী ছিল। কারণ এটা ছিল এক ধরনের বিরতি, পরিবেশের পরিবর্তন। এবং সবাই বিস্কুট আর রস খুব উপভোগ করত।

আমার গুয়ান্তানামোতে থাকার শেষ দুই বছরে দুজন পশতু অনুবাদক এসেছিল। একজনের নাম ছিল হাবিব কবির, আরেকজনের নাম আরমান। দুজনেই আফগান ছিলেন। একজন জার্মানিতে বসবাস করতেন, আরেকজন ফ্রান্সে। তারা দুজনেই ভাল মানুষ ছিলেন এবং বন্দীদের প্রতি অনেক করুণাময় ছিলেন।

তাদের মুখ দেখে বোঝা যেত তারা আমাদের কষ্টের গল্প থেকে ভীত ছিলেন। হাবিব একবারই আমাদের কাছে এসেছিলেন, তারপর দীর্ঘদিন দেখা হয়নি।

“তোমাদের এভাবে দেখে আমি সহ্য করতে পারছি না,” তিনি বলেছিলেন। “ক্যাম্পে ঢুকলেই মনে হয় হার্ট অ্যাটাক হতে চলেছে।”

তিনি নিরক্ষরদের সাহায্য করতেন। সারাদিন চিঠি লিখে দিতেন তাদের পরিবারে পাঠানোর জন্য। অনেক বন্দী তাদের পরিবারের কোথায় আছে জানত না, তিনি তা বের করার চেষ্টা করতেন এবং তাদের কাছে বার্তা পৌঁছে দিতেন।

আরমানও বন্দীদের পরিবারে যোগাযোগ করাতে সাহায্য করতেন। তিনি আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি বুঝতেন এবং আমরা তাঁকে বিশ্বাস করতাম।

গুয়ান্তানামোতে থাকা অবস্থায় আমি জানতাম না রেড ক্রস বন্দীদের জন্য কতটা কাজ করছিল। মুক্তি পাওয়ার পর তাদের কাজ নিয়ে আমি আরও জানলাম এবং বুঝলাম তারা কতটা নিবিড়ভাবে আমাদের সাহায্য করছিল। রেড ক্রস চেষ্টা করেছিল আমেরিকার অত্যাচার ও আইন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আমাদের পাশে থাকার।

আমি রেড ক্রসকে ধন্যবাদ জানাই এবং তাদের ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা জানাই।

*****

গুয়ান্তানামো বন্দিশিবিরে বিভিন্ন ধরনের সৈন্যদলের উপস্থিতি ছিল।
প্রত্যেক দলের ব্যাজে আলাদা আলাদা চিহ্ন ছিল। শুরুতে তিনটি প্রধান দলে ছিল – একটি দলের ব্যাজে গাছের ছবি, অন্যটিতে ক্রস (ক্রস চিহ্ন), আর আরেকটিতে চাঁদের চিহ্ন। গাছের চিহ্নধারী দল আমাদের সবচেয়ে ভালো ব্যবহার করতো। তারা আমাদের মধ্যে কোনও বৈষম্য করতো না, ভালো আচরণ করতো। পর্যাপ্ত খাবার দিত এবং মাঝে মাঝে ফলও নিয়ে আসতো। তারা আমাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাত না, এবং যদি কেউ ডাক্তারের কাছে যেতে চাইতো, তারা যত দ্রুত সম্ভব সেটা জানাতো। আমরা তাদের সাথে যতটা সম্ভব সহযোগিতা করার চেষ্টা করতাম। কখনো কখনো কেউ ক্লান্ত বা মন খারাপ থাকলে আমরা তাকে বোঝাতাম সৈন্যদের সম্পর্কে অভিযোগ না করতে, কারণ তারা ভালো মানুষ এবং আমরা তাদের সহানুভূতি ও সম্মান দিয়ে ব্যবহার করতাম, যেমনটি পবিত্র কুরআনে লেখা আছে।

ক্রস চিহ্নধারী সৈন্যরা খুব কঠোর ছিল, সব নিয়ম-কানুন ও শিবিরের আইন কঠোরভাবে পালন করতো। মাঝে মাঝে তারা বৈষম্য করতো এবং অপব্যবহার করতো, ফলে আমরা প্রায়শই পর্যাপ্ত খাবার পেতাম না। তবুও তাদের মধ্যেও কয়েকজন ভালো ও ভদ্র মানুষ ছিল।

চাঁদের মতো চিহ্নধারী দল ছিল অভদ্র ও বৈষম্যমূলক। তারা কখনোই আমাদের পর্যাপ্ত খাবার বা ভালো কাপড় দিত না। রাতে তারা ঘুমে বিঘ্ন ঘটাতো, দ্রুত রেগে যেত এবং বন্দিদের শাস্তি দিত।

তিনটি আরও দল ছিল: চাবির চিহ্নধারী, সংখ্যা ৯৪ এবং স্প্যানিশ চিহ্নধারী।
স্প্যানিশ চিহ্নধারী সৈন্যরা ছিল সবচেয়ে ভদ্র ও সম্মানজনক, তাদের মধ্যে আমরা অনেক সহানুভূতি ও করুণা দেখেছি। আমরা তাদের সাথে কথা বলতাম, তারা আমাদেরকে তাদের পূর্বপুরুষদের কাহিনী বলতো যারা মুসলিম ছিলেন। তারা অতিরিক্ত খাবার, সাবান এবং শ্যাম্পু দেয়। তারা ইসলামকে সম্মান করতো, আমাদের নামাজের সময় বিরক্ত করতো না এবং পবিত্র কুরআনকে কখনো অবমাননা করতো না। মাঝে মাঝে তারা বাইরে বিশ্বের খবর জানাত। কিন্তু তারা সবাই হারিয়ে গিয়েছিল এবং তাদের পরিবর্তে রেড আমেরিকান সৈন্যেরা আসছিল।

চাবির চিহ্নধারী সৈন্যরা ছিল নিষ্ঠুর। তারা আমার মুক্তির সময়ও শিবিরে ছিল। তারা অভদ্র, ইসলামকে সম্মান করতো না এবং আমাদের জীবন কঠিন করার জন্য যে কোনও উপায়ে কাজ করতো। তারা রাতে তল্লাশি করতো, যখন আমরা ঘুমাতাম তখনও আমাদের বিরক্ত করতো। তারা মিথ্যা তথ্য দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দিত এবং কখনো কখনো পবিত্র কুরআনকেও অপমান করতো।

সবচেয়ে খারাপ দল ছিল সংখ্যার ব্যাজধারী #৯৪। তারা বন্দিদের ও কুরআনকে অপব্যবহার করতো; বন্দিদের অকারণে শাস্তি দিত। #৯৪ দলের এবং বন্দিদের মধ্যে শত্রুতা বেড়ে গেল এবং বন্দিরাও যতটা সম্ভব তাদের অবজ্ঞা করতে শুরু করল। তারা তাদের উপর পানি ছুঁড়তো, প্রশ্নের উত্তর দিত না এবং যতটা সম্ভব অবাধ্য ছিল। অবশেষে বন্দিরা সিদ্ধান্ত নিলো #৯৪ দলকে শিবির থেকে সরিয়ে দিতে হবে এবং তারা বিক্ষোভ বাড়িয়ে দেবে যতক্ষণ না তারা চলে যায়। কর্তৃপক্ষ এই প্রভাব মোকাবিলায় #৯৪ দলের সদস্যদের ভেঙে বিভিন্ন দলের মধ্যে ছড়িয়ে দিল।

প্রায় প্রতি ছয় মাসে গুয়ান্তানামো থেকে সৈন্য বদল হত। খারাপ সৈন্য আসত নতুন দলে আর ভালো সৈন্য চলে যেত। কিছু সৈন্য শিবিরের পরিস্থিতি দেখে দুঃখ প্রকাশ করত। তারা বলতো, বাইরে গেলে আন্তর্জাতিক মিডিয়াকে জানাবে এবং গোটা বিশ্বকে বলবে গুয়ান্তানামোতে আমাদের কী ঘটছে।

সৈন্যদের মধ্যে জাতিগত পার্থক্যও ছিল। এখানে ছিল লাল, সাদা/লাতিনো, কালো ও ভারতীয় সৈন্যরা। সাদা/লাতিনো সৈন্যরা বেশ ভদ্র এবং বন্দিদের প্রতি সহানুভূতিশীল, বেশিরভাগই বৈষম্য করত না।

আফ্রিকান-আমেরিকান সৈন্যরা প্রায়ই ক্লান্ত থাকতো; বেশিরভাগ সময় তারা ঘুমাত বা খেত। তারা কম শিক্ষিত বলে মনে হতো এবং অনেকেই গরিব দেশের ছিল। তাদের মধ্যে যারা বৈষম্য করতো, তারা সবচেয়ে কঠোর এবং কঠিন ছিল। তারা মাঝে মাঝে সাদা ও লাল আমেরিকানদের ডেকে বলতো যে তারা স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর এবং তারা তাদের দ্বারা অবজ্ঞিত হচ্ছেন। আফ্রিকান-আমেরিকান সৈন্য ও বন্দিদের মধ্যে অবিশ্বাস ছিল; তারা যখন বন্দির সাথে কথা বলতো বা কিছু দিত, চারপাশে সতর্কভাবে তাকাত।

রেড আমেরিকানরা (যারা সরকারে প্রধান পদে থাকে) ছিলেন চালাক এবং মিথ্যা ও প্রতারণার জন্য পরিচিত। বেশিরভাগ সিনিয়র সৈন্য ছিল রেড আমেরিকান এবং তারা আফ্রিকান-আমেরিকান ও লাতিনো সৈন্যদের চেয়ে ভালো শিক্ষিত ও আর্থিকভাবে শক্তিশালী ছিল।

চতুর্থ দল ছিল ইন্ডিয়ান (রেড ইন্ডিয়ান) সৈন্যরা, যারা খুবই কম সংখ্যা ছিল। তারা আমেরিকার আদিবাসী, যারা আমেরিকা আবিষ্কৃত হওয়ার অনেক আগে থেকেই সেখানে বাস করতো। তাদের অধিকাংশ এখন খুব দূরবর্তী গ্রামীণ এলাকায় থাকে এবং বর্ণনা করা হয় তারা অনেকাংশে অশিক্ষিত ও মাদকাসক্ত। প্রথম আমেরিকানরা তাদের হত্যা ও নিপীড়ন করেছিল, তাদের জমি নিয়ে পাহাড়ে ঠেলে দিয়েছিল। এখনো তাদের সরকারে কম প্রতিনিধিত্ব রয়েছে এবং অনেক সৈন্য অন্য আমেরিকানদের আগ্রাসক মনে করে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাজের সমর্থন করে না। তারা আমাদের সান্ত্বনা দিতো যা আমাদের সঙ্গে ঘটছে তার জন্য।

*****

যখন আমি প্রথম গুয়ান্তানামোতে পৌঁছলাম তখন সেখানে মাত্র একটি ক্যাম্প ছিল, যা আটটি ব্লক নিয়ে গঠিত এবং একটি পৃথক কারাগারের ওয়ার্ড ছিল। সেখানে মোট চুরাশিটি সেল ছিল, দুইটি হাঁটার জায়গা, চারটি সাধারণ বাথরুম এবং কারাগারের ওয়ার্ডে কুড়িটি সেল ছিল। আমাদের লাল রঙের মোটা কাপড় দেয়া হতো, যা কিছু বন্দীর ত্বকে জ্বালা করতো। প্রতি বন্দীকে দুইটি কম্বল, দুইটি পানির বোতল, দুইটি তোয়ালে, একটি ছোট প্লাস্টিকের কার্পেট, একটি টুথব্রাশ ও টুথপেস্ট, একটি পবিত্র কুরআন এবং একটি মাস্ক দেওয়া হতো। সাধারণ শাস্তি হিসেবে এই সব জিনিস (প্লাস্টিকের কার্পেট ছাড়া) আটকে নেওয়া হতো।

যখন দ্বিতীয় ক্যাম্প তৈরি করা হলো এবং দায়িত্বে থাকা জেনারেল বদলে গেলো, তখন আমাদের পরিস্থিতি বদলে গেলো। আমাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হলো এবং শাস্তির মাত্রা আরও বেড়ে গেলো। সেলের সংখ্যা বেড়ে তিনশো হলো, কুরআনগুলো জব্দ করে নেওয়া হলো, আবার আমাদের দাড়ি কাটানো হলো এবং জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন বন্দীদের প্রতি অত্যাচার বেড়ে গেলো।

নতুন জেনারেলের নাম ছিল মিলার; তিনি পরে ইরাকে চলে গেলেন এবং সেখানে আবু-গারিব কারাগার পরিচালনা করলেন। তিনি ক্যাম্প ইকো নামে একটি জায়গা প্রতিষ্ঠা করলেন, যা খুবই অন্ধকার ও নিঃসঙ্গ একটি স্থান ছিল। ক্যাম্প ইকোর ভেতরে বিভিন্ন ধরনে আটককেন্দ্র ছিল, যার মধ্যে একটি ছিল একটি সেলের ভিতরে একটি সাধারণ ঘর, সামনে একটি বাথরুম। ঘর ও দরজাগুলো রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে পরিচালিত হতো এবং বন্দীদের ২৪ ঘণ্টা ভিডিও ক্যামেরায় নজর রাখা হতো। ঘরের ভিতরে রাত না দিন বোঝা যেত না, এবং অনেক ভাই যারা ওই সেলগুলোতে ছিলেন, পরে মানসিক রোগে ভুগতে শুরু করেন।

সেখানেই আপনি চিৎকার করলেও কেউ শুনতো না, ক্যামেরার সামনে হাত নাড়িয়ে গার্ডদের মনোযোগ আকর্ষণ করলেও কোন লাভ ছিল না। কোনো বই, নোটবই বা অন্য কোনো জিনিস রাখা যেত না, বন্দীকে চার দেয়ালের মাঝে একা জীবন যাপনের জন্য ফেলা হতো।

অনেক বন্দী কয়েক বছর গুয়ান্তানামোতে থাকার পর মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। আহমদ, যিনি পশ্চিমা দেশে ছিলেন এবং ব্রিটেনে গিয়েছিলেন, পাকিস্তানে ধর্মীয় পড়াশোনা করছিলেন, তখন তিনি ছিলাম তাদের মধ্যে যাদেরকে সবসময় ভারী লোহার শৃঙ্খল পরানো হতো। অবশেষে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন এবং বন্দিত্বের কঠিন পরিস্থিতির কারণে মানসিক রোগে আক্রান্ত হতে শুরু করেন। কিন্তু সাহায্য না পেয়ে বারবার শাস্তি পেতেন এবং আমি তাঁকে বারবার অজ্ঞান হতে দেখেছি। তাঁর অবস্থা আরও খারাপ হয় যখন তাকে গুয়ান্তানামোতে আনা হয়। এক সময় তাকে আমার পাশের সেলে আনা হয়; সারারাত তিনি পবিত্র কুরআন ও কবিতা পড়তেন। বারবার ঘোষণা দিতেন যে মাহদি (আল্লাহর শান্তি তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) এই বছর ফিরে আসবেন। তিনি নিজেকে সান্তনা দিতেন। একদিন তিনি একটি সৈন্যকে খাবারের প্লেট দিয়ে আঘাত করেন। তারপর তাকে ক্যাম্প ইকোতে স্থানান্তর করা হয় এবং তিন বছর সেখানে কাটান।

আহমদ শিক্ষিত ছিলেন, কিন্তু বন্দিত্ব তাঁকে পাগল করে দিয়েছিল। সৈন্যরা ভালো জানতেন যে তিনি গভীর অবসাদে ভুগছেন, কিন্তু তবুও তাঁকে নির্যাতন করা হত এবং সাহায্য করা হয়নি। অনেকেই মানসিক রোগে ভুগতেন, যেমন ড. আয়মান, তারিক বা আবদুল রহমান। পাগল ও মানসিক রোগীরা মহান আল্লাহর সামনে ক্ষমাপ্রার্থী, কিন্তু আমেরিকান সৈন্যদের কাছে নয়।

আমি ক্যাম্প ডেল্টার ডেল্টা ব্লকের সেল পনেরো এবং গোল্ড ব্লকের সেল আট নম্বর বন্দী ছিলাম ২০০৩ সালের শুরু পর্যন্ত। পরে আমাকে কিউব ব্লকের সেল ৩৭-এ স্থানান্তর করা হয়। আমার সেল থেকে আমি সাগর আর জাহাজগুলো দেখতে পারতাম, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে আমাকে একটি পৃথক সেল সংলগ্ন বন্দিত্ব এলাকায় নেয়া হয় যেখানে আমি অনেক সময় কাটিয়েছি।

শুরুতে সপ্তাহে একবার স্নান করার অনুমতি ছিল এবং হাত বাঁধা অবস্থায় পনেরো মিনিটের জন্য হাঁটার জায়গায় যাওয়া যেত। পরে সময় বাড়িয়ে অর্ধ ঘণ্টা করা হলো, সপ্তাহে দুইবার। আমাদের জামাকাপড় সপ্তাহে একবার পরিবর্তন করা হতো। অনেক দিন পর্যন্ত আমরা দাড়ি কাটতে বা নখ কাটা সম্ভব ছিল না। পরে এটি বদলে গেল এবং সপ্তাহে একবার নখ কাটার ও রেজারের ব্যবহার করার সুযোগ পেলাম।

সামরিক খাবারের পরিবর্তে সকালের ও রাতের খাবার ফ্রেশভাবে রান্না করা, পরিবেশিত হতো, এবং পরের বছর দুপুরের খাবারও ফ্রেশ দেওয়া শুরু হলো। খাবার দেওয়া সৈন্যরাই ঠিক করতেন কত খাবার দেওয়া হবে, কিন্তু রান্না এমনভাবে করা হতো যা স্বাদহীন ছিল। খাবার অল্প পরিমাণে দেওয়া হতো এবং আমরা প্রায়শই ক্ষুধার্ত থাকতাম। তাজা ফলদিনে তিনবার পাওয়া একটি বড় সুযোগ মনে হতো।

আমাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার অনুমতি ছিল এবং রাতে নামাজের জন্যও ঘোষণা হতো। সৈন্যরা আজানের জন্য টেপ চালাতো এবং নিজেদের কাছ থেকে নকল করত, তবে আমরা সূর্যের ভিত্তিতে সময় মেপে নামাজ পড়তাম। পরে জুমাতে একসঙ্গে নামাজ পড়ার অনুমতিও পেয়ে যাই। আলাদা আলাদা বন্দী কক্ষগুলোতে নামাজ পড়া কঠিন ছিল। প্রায়ই সময় নির্ধারণ করা যেত না, তাই বন্দীদের নিজের অনুমান অনুযায়ী নামাজ পড়তে হতো।

তৃতীয় ক্যাম্প তৈরি হলে আমাদের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গেল। খাবারের পরিমাণ কমে গেল, মানও খারাপ হলো এবং শাস্তিও বেড়ে গেল। কিউব ব্লক একটি উদাহরণ: সদ্য নির্মিত, সেখানে বসবাসের অবস্থা খুবই কঠিন ছিল। বন্দীদের উলঙ্গ অবস্থায় খোলা খাঁচায় রাখা হতো, কোনো ঋতুই বিবেচনায় নেওয়া হতো না, এমনকি নামাজের সময়ও নিজেকে ঢেকে রাখার সুযোগ ছিল না। খুব কম খাবার দেওয়া হতো এবং সৈন্যরা বন্দীদের প্রতি অত্যাচার করতো। টয়লেট সকলের সামনে ছিল এবং খাঁচাগুলো এত ছোট ছিল যে শুতে পারতাম না।

শীতে খুব ঠান্ডা লাগতো; বন্দীরা গরম পেতে লাফাতো। সবচেয়ে খারাপ ছিল যখন টয়লেটগুলো বন্ধ হয়ে যেত। গর্তের জল আর মলমূত্রের গন্ধ পুরো ব্লক ছেয়ে যেত। আমাদের টয়লেটের পর কাগজ বা জল দেওয়া হতো না;

শুধুমাত্র হাত দিয়ে পরিষ্কার করতে হত, কিন্তু হাত ধোয়ার সুযোগ ছিল না। সেই একই হাত দিয়ে পরে খাবার খেতে হতো। যারা মানবাধিকার রক্ষার দাবি করতেন, এভাবেই তারা আমাদের জীবন যাপন করিয়েছেন।

বন্দীদের কিউব ব্লকে এক থেকে পাঁচ মাস থাকার আদেশ ছিল। যারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারত না, তারা দীর্ঘ সময় থাকত। একটি পৃথক ব্লক তৈরি করা হয়েছিল মানসিক রোগীদের জন্য; সেখানে অধিকাংশ বন্দী গভীর বিষণ্নতায় ভুগছিলেন এবং আত্মহত্যার চেষ্টা করতেন। আমি যখন সেখানে ছিলাম, প্রতিদিনই আত্মহত্যার চেষ্টা হতো। পরে তাদের শৃঙ্খলে বেঁধে বার্বিটুরেট ইনজেকশন দেওয়া হতো শান্ত করার জন্য; অনেকেই সেই ইনজেকশনের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত।

তবে বন্দীদের মধ্যে সহিংসতাও ছিল। কিছু বন্দীকে অন্যরা গুপ্তচর ভেবে আমেরিকানদের সহযোগী হিসেবে মনে করতো; তাদেরকে গালাগাল করা হতো এবং মাঝে মাঝে অত্যাচার করা হতো। অন্য বন্দীরা তাদের থুতু ফেলে এবং তারা অন্য কোথাও স্থানান্তর চাইতো। অনেকেই তাদের সেলে ফাঁস ঝুলানোর চেষ্টা করতো এবং তারপর মানসিক রোগীদের ওয়ার্ডে পাঠানো হতো, যা তাদের জন্য আরও খারাপ ছিল।

কিছু গুপ্তচর আফগান ছিলেন, যাদের মধ্যে অনেকেই ধর্ম পরিবর্তন করে ইসলাম ছেড়ে দিয়েছিলেন। তারা আল্লাহ ও পবিত্র কুরআনের নাম অপব্যবহার করত, যেটা তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হতো। তাদের মধ্যে ইরাক ও ইয়েমেনের লোকও ছিল। বন্দীরা সাবধানে থাকতো এবং সন্দেহ করতো যখন এমন কেউ পাশের খাঁচায় আসতো; তারা আল্লাহকে ধন্যবাদ দিত যখন তাদের অন্য কোথাও পাঠানো হতো।

এ সব ঘটতো ক্যাম্প ডেল্টাতে; অবিশ্বাসীদের দল এমনকি ঘাড়ে ক্রস পরতো এবং প্রতিদিন তারা বাড়ছিল। অনেকেই বিশ্বাস করত এটা আমেরিকানদের ষড়যন্ত্র, যাতে তারা আমাদের মনে পরিবর্তন আনতে পারে এবং ইসলাম ছেড়ে দিতে পারে।

দুইটি আরও ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছিল; একটি ছিল সুবিধাসম্পন্ন ও ভালো থাকার মতো জায়গা। অন্যটি ছিল শাস্তির জন্য আরেকটি স্থান। ক্যাম্প ফাইভ ক্যাম্পগুলোর থেকে অনেক দূরে ছিল, কিন্তু এই জায়গাটির কথা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, এমনকি জিজ্ঞাসাবাদকারীরাও আমাদের বলেছিল এটা বসবাসের জন্য সবচেয়ে খারাপ জায়গা।

বাস্তবে, ক্যাম্প ফাইভের পরিবেশ ভালো ছিল না, তবে ভাইরা তা সহ্য করতে পারত। রুমগুলোতে তাজা বাতাসের প্রবাহ বা জানালা ছিল না, তাই সূর্যালোক আসতো না। প্রতিটি কক্ষ ভিডিও ক্যামেরায় নজরদারি করা হতো; সেখানে সিমেন্টের একটি বিছানা, টয়লেট ও নল ছিল। দেয়াল কংক্রিটের তৈরি এবং দরজাগুলো রিমোট কন্ট্রোলে চালানো হতো। এই কক্ষে শুধুমাত্র একটি কুরআন রাখার অনুমতি ছিল। খাবার দরজার একটি ছোট জানালা দিয়ে পরিবেশন করা হতো, কিন্তু খাবার নেয়ার সময় জানালার দিকে মুখ করতে দেতো না। প্রায়শই খাবার মাটিতে পড়ে যেত, কিন্তু নতুন খাবার দেওয়া হতো না। সপ্তাহে একবার সূর্যের আলোতে বাইরে হাঁটা একটা বড় সুবিধা ছিল। চিকিৎসা শুধু গুরুতর ক্ষেত্রে দেওয়া হতো এবং তা কখনোই রোগ সারাতে পারত না।

মোল্লা ফজল ক্যাম্প ফাইভে বন্দি ছিলেন; তিনি গ্যাস্ট্রিকের সমস্যায় ভুগছিলেন এবং এক বছরের বেশি সময় ধরে চিকিৎসার জন্য আবেদন করেছিলেন, কিন্তু মাত্র তখনই হাসপাতালে পাঠানো হয় যখন তিনি অনশন করেছিলেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

পরিবেশ ছিল অত্যন্ত কঠোর। আমেরিকান সৈন্যরা প্রায়ই মিথ্যা বলতো ও আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করতো, এবং অনেক অপব্যবহারের ঘটনাও ঘটতো। যারা ক্যাম্প ফাইভে সময় কাটিয়েছে তারা ছাড়া হলে কঙ্কাল সরে দেখাতো; তাদের দুর্বল শরীরগুলো দেখা যেতেই কষ্ট হতো। যখন আবু হারিস ক্যাম্প থেকে ফিরে এলেন, আমি তাকে চিনতে পারিনি; যিনি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং যে দেহ ফিরে এসেছে তাদের মধ্যে কোন মিল ছিল না। তার অবয়বে এতটাই ভয় পেতাম যে মাঝে মাঝে তার স্বপ্ন দেখতাম এবং চিৎকার করে জেগে যেতাম। আল্লাহ তায়ালা সব মুসলিম ভাইদের ভালো স্বাস্থ্যে মুক্তি দিন এবং তাদের মুশরিক ও নিষ্ঠুরদের হাত থেকে রক্ষা করুন। ক্যাম্প ফাইভকে প্রায়ই ‘গ্রেভ ফাইভ’ বলা হত; এটি জীবিতদের জন্য একটি কবরের মতো ছিল।

ক্যাম্প ফোর তৈরি করা হয়েছিল তাদের জন্য যারা শীঘ্রই গুআন্তানামো থেকে মুক্তি পেতে যাচ্ছিল। সেখানে বন্দিদের ভালো ব্যবহার করা হত এবং যথাযথ খাবার দেওয়া হত; এর উদ্দেশ্য ছিল তাদের ওজন এবং শক্তি পুনরুদ্ধার করা যাতে তারা আবার স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেতে পারে।

ক্যাম্প ফোরে বন্দিরা সম্মিলিতভাবে বসবাস করত; তারা একসাথে খেত এবং জামাতে নামাজ আদায় করত। খেলাধুলা ও ক্রীড়া কার্যক্রম অনুমোদিত ছিল, বন্দিরা চাইলে দিনে একাধিকবার গোসল করতে পারত, এবং প্রতি সপ্তাহে একটি করে সিনেমা দেখানো হতো। কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ বন্দিকে পাঠদানের সুযোগও দেওয়া হয়েছিল। স্বাভাবিক খাবারের পাশাপাশি খেজুর, মধু, কেক, টমেটো কেচাপ ও অন্যান্য জিনিস দেওয়া হতো, যখন অন্য ক্যাম্পগুলোর বন্দিরা শুধু একটা রুটির জন্যও মরিয়া হয়ে থাকত। একটি ফুটবল মাঠ, একটি ভলিবল কোর্ট ও একটি টেবিল টেনিস বোর্ড ছিল এবং আমাদের ব্যায়ামের অনুমতি ছিল। অনেক সাংবাদিক, সিনেটর ও অন্যান্য অতিথি ক্যাম্প ফোরে এসেছিলেন; ভিডিও ধারণ করা হয়েছে, ছবি তোলা হয়েছে, কিন্তু আমাদের তাদের সাথে কথা বলতে দেওয়া হতো না। আমাদের সাদা ইউনিফর্ম ও কাপড় ধোয়ার জন্য সাবান দেওয়া হতো।

শুরুতে যখন কোনো বন্দিকে ক্যাম্প ফোরে স্থানান্তর করা হতো, সে এবং অন্যরা ভাবত যে তার মুক্তি শিগগিরই হবে। এমনকি আমেরিকানরাও আমাদের বলত, কোনো বন্দি এক মাসের বেশি ক্যাম্প ফোরে থাকবে না মুক্তি পাওয়ার আগে। কিন্তু অনেকের জন্য সেই মাসগুলো বছরের পরিণত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আমরা বিস্মিত হইনি; আমেরিকানরা বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বা কিছু বলেছে যা পরে তারা ভুলে গেছে।

একবার, যখন আমাকে কিউব ব্লক থেকে অন্য খাঁচায় স্থানান্তর করা হয়েছিল, এক সৈন্য এসে আমাকে জানাল যে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। আমাকে একটি অজানা স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং রুমের মাঝখানে ধাতব রিংয়ের সাথে বেঁধে রাখা হয়। কয়েকজন আফগান ভেতরে ঢুকল এবং আমাকে সালাম দিল,

তারপর আমার চারপাশে চেয়ারে বসে পড়ল। তারা নিজেদের পরিচয় দিল এবং বলল তারা আফগানিস্তান সরকারের প্রতিনিধি দল। তারা আমেরিকানদের মতোই প্রশ্ন করতে শুরু করল, এবং মাঝেমধ্যে এক আমেরিকান মহিলা এসে তাদের কানে কিছু বলত বা কোনো নোট দিত। আমি সন্দেহ করলাম তারা আসলেই আফগান সরকারের প্রতিনিধি কি না, মনে হলো তারা আমেরিকানদের কোনো চক্রান্তের অংশ।

যখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম তারা কী উদ্দেশ্যে এসেছে, তারা বলল তারা আমার মুক্তির ব্যবস্থা করতে এসেছে। আমি বললাম, এটা শুনে ভালো লাগছে, কিন্তু তাদের প্রশ্নগুলো মনে হচ্ছিল যেন তদন্তের নামে গুপ্তচরবৃত্তি। তারা কোনো উত্তর দিল না এবং অল্প সময়ের মধ্যেই চলে গেল। অধিকাংশ বন্দি বিশ্বাস করত না যে তারা আফগান সরকারের প্রতিনিধি, বরং তাদের গালিগালাজ করত।

পরে আমাকে ক্যাম্প ওয়ানে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং তারপর ২০০৪ সালের জুন মাসে ক্যাম্প ফোরে স্থানান্তর করা হয়, যেখানে আমি মুক্তি পাওয়ার আগ পর্যন্ত আরও এক বছর তিন মাস অবস্থান করেছিলাম।

GRAVEYARD OF THE LIVING

গুয়ান্তানামো-তে আমার চার বছরের বন্দিজীবনে, আমি ক্যাম্প ওয়ান, টু ও থ্রিতে বহু অবিশ্বাস্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি ও শুনেছি। বন্দিরা এমন অনেক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে, যা প্রতিটি আন্তর্জাতিক, সাংবিধানিক, নাগরিক, ইসলামি ও অনইসলামি আইনেরও লঙ্ঘন।

২০০৩ সালে, রমজান মাসের শুরুতে, আমাদের বলা হয়েছিল যে আমাদের কিছু খেজুর, মধু ও বিশেষ ধরনের রুটি দেওয়া হবে। যদিও এগুলো ছোটখাটো জিনিস, তবু আমরা খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু রমজানের দ্বিতীয় দিনেই, এক সৈনিক আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। তখন ক্যাম্পে আটচল্লিশজন বন্দি ছিল, আর আমাদের মধ্যে তিনজন প্রতিবাদ করেছিল, যার একজন সৈনিকদের দিকে পানি ছুড়ে মারে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে অন্য সেলে নিয়ে যাওয়া হয় শাস্তি দিতে। পরদিন ঘোষণা করা হয় যে, আমাদের সবাইকে শাস্তি দেওয়া হবে, তাজা খাবার বন্ধ থাকবে চৌত্রিশ দিন এবং পানি সরবরাহও বন্ধ থাকবে। আমরা উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে গিয়ে বলি, রমজানের মর্যাদা রক্ষা করা উচিত এবং এক বন্দির অপরাধে সবাইকে শাস্তি দেওয়া ঠিক নয়। তিনি নেতিবাচকভাবে উত্তর দেন, “এটাই মিলিটারির নিয়ম। এক সদস্যের ভুলের দায় গোটা গ্রুপকে নিতে হয়।”

আরেকবার এক নারী সৈনিক একটি সেল তল্লাশির সময় পবিত্র কুরআনকে ইচ্ছাকৃতভাবে মাটিতে ফেলে দেয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে বন্দিরা ধর্মঘট শুরু করে–তারা পোশাক বদলানো, গোসল করা, সৈনিকদের কোনো কাজে সহায়তা করা বা বাইরে হাঁটাও বন্ধ করে দেয়। এই ধর্মঘট দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বন্দিদের দাবির মুখে ওই সৈনিককে শাস্তি দেওয়ার বদলে কর্তৃপক্ষ শক্তি প্রয়োগ করে। কক্ষে গ্যাস ছুড়ে অজ্ঞান করে ফেলে বন্দিদের, তারপর সৈনিকরা দৌড়ে এসে সবাইকে টেনে হিঁচড়ে বের করে আনে। সব জিনিসপত্র নিয়ে নেওয়া হয়, মাথা ও দাড়ি কামিয়ে দেওয়া হয়। পুরো ভবনে তীব্র আওয়াজ চলতে থাকে, ঘুমানো অসম্ভব করে তোলে।

আরেকবার ‘ইন্ডিয়ানা’ নামে আলাদা এক ব্লকে বন্দিরা “আল্লাহু আকবর” বলে চিৎকার শুরু করে এবং খাঁচা কাঁপাতে থাকে। তখন কেউ জানত না আসলে কী ঘটেছে, কিন্তু পরে জানতে পারি যে, এক আরব ভাই মাশআলকে সৈনিকরা এতটা মারধর করেছিল যে অনেকে ভেবেছিল সে মারা গেছে। বন্দিরা তার খবর জানতে চায় এবং হুমকি দেয় বড় ধরণের অস্থিরতা তৈরির। প্রথমে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়, পরে ঘোষণা দেওয়া হয় যে মাশআল জীবিত আছে, তবে সংকটজনক অবস্থায়। দুই মাস পর জানা যায় সে পুরোপুরি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছে–সে বসতে, হাঁটতে বা নিজে নড়াচড়াও করতে পারত না, এমনকি কথা বলতেও পারত না। সে গুয়ান্তানামোর হাসপাতাল ওয়ার্ডে আড়াই বছর ছিল। তার অবস্থা উন্নতি না হওয়ায় তাকে সৌদি আরব সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

গুয়ান্তানামোতে সব কিছুই উল্টোভাবে ঘটত। শুরুতে অবস্থাগুলো কঠিন হলেও সময়ের সঙ্গে সবকিছু আরও খারাপ হতে থাকে। খাবার ছিল একটি বড় সমস্যা। কর্তৃপক্ষ পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত খাবারের ব্যবস্থা করতে অনেক সময় নিয়েছিল। তাও গুয়ান্তানামোতে সবকিছু যেন একরকম ব্যবসা ছিল। কার কী সুযোগ-সুবিধা মিলবে তা নির্ভর করত শুধুই জিজ্ঞাসাবাদকারীদের ওপর। কেউ যদি তাদের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিত, তাহলে সব কিছু সম্ভব হতো—টয়লেট পেপার, বোতলজাত পানি, এমনকি ক্যাম্প ফোরে স্থানান্তরও। কিন্তু যারা সহযোগিতা করত না, তাদের শাস্তি দেওয়া হতো।

মৌলভী ফজলকে ৪১ দিন ধরে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল কারণ সে এক জিজ্ঞাসাবাদে কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। রাতের বেলায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদের কক্ষে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হতো, সঙ্গে এয়ারকন্ডিশন চালু রাখা হতো পুরো জোরে, যেন সে ঘুমাতে না পারে। দিনে সৈনিকরা তাকে হাঁটতে বাধ্য করত, যাতে সে ঘুমিয়ে না পড়ে।

যারা গুয়ান্তানামো দেখতে আসত—সাংবাদিক, পর্যবেক্ষক—তাদের শুধু ক্যাম্প ফোরই দেখানো হতো। তারা আসল গুয়ান্তানামো কখনও দেখত না, যদিও সেটা মাত্র কয়েক মিটার দূরে ছিল।

অনেকবার পবিত্র কুরআনের অবমাননা করা হয়েছে। সৈনিকরা ইচ্ছা করে একে আমাদের শাস্তির হাতিয়ার বানিয়ে ফেলেছিল। বহুবার আমরা সব কুরআন একত্র করে কর্তৃপক্ষকে ফেরত দিয়েছিলাম কারণ আমরা আর সেগুলো রক্ষা করতে পারছিলাম না। কিন্তু তারা সেগুলো নেওয়ার বদলে আমাদেরই শাস্তি দিয়েছিল।

বন্দিরা পৃথিবীর সবচেয়ে অসহায় মানুষ। কিন্তু গুয়ান্তানামোর একজন বন্দি আসলে আর মানুষই থাকে না। প্রতিটি দিন তাকে তার মানবতা থেকে আরও এক ধাপ সরিয়ে দেয়।

*****

আমার পাশের খাঁচায় বন্দী থাকা অবস্থায় অনেকেই তাদের অভিজ্ঞতার কথা শোনালো। ইয়েমেনের মুখতার এবং তাজিকিস্তানের ইউসুফ কুন্দুযের কালা-ই-জাঙ্গিতে ছিলেন—তালেবান যোদ্ধাদের একটি বড় দলের সাথে, যারা উজবেক মিলিশিয়ার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। তারা ভেবেছিল আত্মসমর্পণের শর্তে তাদের ক্ষতি করা হবে না। কিন্তু উজবেক যোদ্ধারা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল। তালেবানদের মারধর করা হলো, অনেককে হত্যা বা নির্যাতন করা হলো। তারপর তাদের ধাতব কন্টেইনারে ভরে দেওয়া হলো—প্রতিটিতে শত শত মানুষ, অনেকেই গুরুতর জখম অবস্থায়। কালা-ই-জাঙ্গিতে তাদের একের উপর আরেকজন ফেলে দেওয়া হলো, আবার মারধর করা হলো, এমনকি প্রহরীরা তাদের নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে বাধ্য করল। তাদের খাবার বা পানি দেওয়া হতো না। সেই সময় তারা মরে যাওয়াই কামনা করছিল।

ইউসুফ তাজিকি আমাকে বলল, এক সৈন্য তার জিনিসপত্র খুঁজছিল, যেকোনো মূল্যবান জিনিস লুটে নেওয়ার জন্য। তখন আরেকজন তার মুখের পিছনের সোনার ক্যাপ দেওয়া দাঁত দেখতে পেল। ইউসুফ তাকে অনুরোধ

করল, বলল দাঁতটি সোনার নয়, কিন্তু সৈন্যটি সেটি জোর করে উপড়ে ফেলার চেষ্টা করল। দাঁতটি গভীরে আটকে থাকায় সৈন্য একটি ধাতব টুকরো দিয়ে আবার চেষ্টা করল। অন্য সৈন্যরা যখন বলল যে দাঁতটি মূল্যহীন, তখনই সে ইউসুফকে ছেড়ে দিল।

মুখতার তখন খুব ছোট ছিল। কালা-ই-জাঙ্গির ঘটনা বলতে গিয়ে সে কেঁদে ফেলল। সে বলল, তারা মরতে চেয়েছিল এবং দোস্তমের সৈন্যদের উপর হামলা করার পরিকল্পনা করেছিল। হাতের বাঁধন খুলে দেওয়া হলে তারা কিছু অস্ত্র নিয়ে লড়াই শুরু করল। ছয় দিন ধরে তারা টিকে থাকল, অনেকেই শাহাদাত বরণ করল, তারপর আবার গ্রেফতার হলো।

মোহাম্মদ ইউসুফ আফগান বলল, তালেবান তাকে তার গ্রাম থেকে নিয়োগ করেছিল। দোস্তমের মিলিশিয়া তাদের আটক করলে সে ভেবেছিল তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু তার বদলে তাকে এবং অন্যাদের লাইনে দাঁড় করিয়ে মারধর করা হলো। আহতদের গুলি করে অথবা বৃষ্টির জলে ডুবিয়ে মারা হলো। মিলিশিয়া তাদের কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নিল–টাকা, সোয়েটার, বুট, এমনকি টুথপেস্টও। তার কিছু বন্ধুকে পিটিয়ে মারা হলো। তাদের শিপিং কন্টেইনারে ভরে দেওয়া হলো। সে বলল, কন্টেইনারে প্রায় ৩০০ জন ছিল যখন তা বন্ধ করা হলো। তাদের চার দিন ধরে নিয়ে যাওয়া হলো; মধ্যে মধ্যে দরজা খুলে কিছু লোককে বের করে অকারণে মারধর করে আবার ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। শেষে কন্টেইনারটি নামিয়ে রাখা হলো। মিলিশিয়ারা দরজা বন্ধ করে চলে গেল। আরও তিন দিন তারা ভেতরে বন্দী থাকল। লোকেরা চিৎকার করে সাহায্য চাইছিল। কেউ কেউ বলল তারা নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে দেখেছেন। যখন দরজা আবার খোলা হলো, বেশিরভাগ বন্দী মরে গিয়েছিল এবং তাকে তাদের লাশ ডিঙিয়ে বের হতে হলো। রেড ক্রসের একজন প্রতিনিধি প্রথমে তাকে দেখল, কিন্তু তারপর তার চোখ বেঁধে জাওজ্জানের একটি জেলে নিয়ে যাওয়া হলো।

প্রায় ৮,০০০ তালেবান যোদ্ধা আত্মসমর্পণ করেছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র ৩,০০০ বন্দী অবস্থায় বেঁচে ছিল। আমি তখন ইসলামাবাদে তাদের মুক্তির চেষ্টা করছিলাম, দোস্তমের সাথে কয়েকবার কথা বলেছি–সে নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে বন্দীদের সাথে ভালো আচরণ করা হবে। আমি জাতিসংঘ, হিউম্যান রাইটস কমিশন এবং রেড ক্রসকেও এ বিষয়ে জানিয়েছিলাম।

কান্দাহার প্রদেশের খুশাবের আবদুল গনি বলল, তাকে তার বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং কান্দাহারের গভর্নর তাকে বিমানবন্দরে রকেট হামলার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল। সে বলল, সে কোনো রকেট হামলা করেনি, তবুও তাকে আল্লাহ নূর নামে এক ভয়ংকর খ্যাতিসম্পন্ন কমান্ডারের হাতে তুলে দেওয়া হলো–যে কমিউনিস্ট শাসনামলে ছিল। সে লশকরগাহের সামরিক ঘাঁটিতে যোগাযোগের দায়িত্বে ছিল, কিন্তু তখন কান্দাহার বিমানবন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল। আবদুল গনিকে কান্দাহার বিমানবন্দরে নিয়ে গিয়ে একটি অন্ধকার ঘরে স্টিলের তার দিয়ে পিটানো হলো, কিন্তু সে স্বীকারোক্তি দিল না। তখন তাকে উল্টো করে ছাদ থেকে ঝুলিয়ে সারাদিন মারধর করা হলো। সে ব্যথা সহ্য করতে না পেরে শেষে অভিযোগ স্বীকার করে নিল।

তারপর তাকে আমেরিকানদের হাতে তুলে দেওয়া হলো।

পাকিস্তানে আটক হওয়া অনেক ভাইয়ের গল্পও একই রকম। আইএসআই বা পুলিশ তাদের আটক করত, এবং যদি তারা ঘুষ দিতে না পারত, তাহলে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ, মারধর ও নির্যাতন করা হতো। জিজ্ঞাসাবাদকারীরা আফগানিস্তান সম্পর্কে এমন প্রশ্ন করত যার উত্তর তারা নিজেরাও জানত না। শেষে তাদের সবাইকে আমেরিকানদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হতো। অনেকেরই আফগানিস্তানে যাওয়া হয়নি বা আল-কায়েদা/তালেবানের সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না। গুয়ান্তানামোতে সাংবাদিক, শিক্ষক, জুতো প্রস্তুতকারক ও ব্যবসায়ীরাও ছিল—অনেকেই এখনও সেখানে আটক আছে।

বন্দীদের মধ্যে পাকিস্তান পরিচিত ছিল "মাজবুরিস্তান" নামে—যে দেশ আমেরিকার প্রতিটি নির্দেশ পালনে বাধ্য।

*****

একবার আমাকে আমার সেল থেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বের করে একটি অপরিচিত কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘরের মাঝে একটি সাদা চেয়ার রাখা ছিল—আমার বসার জন্য, আর পাশে একটি টেবিলের উপর কিছু একটা মেশিন। প্রহরীরা আমার হাতের বাঁধন খুলে দিল—যা সাধারণত জিজ্ঞাসাবাদের সময় হয় না।

একজন আমেরিকান একজন ফার্সি অনুবাদককে নিয়ে ঘরে এল। তারা বলল, টেবিলের ওপরের যন্ত্রটি একটি লাই ডিটেক্টর মেশিন। তারা জিজ্ঞাসা করল, আমি কি এই মেশিনের মাধ্যমে প্রশ্নোত্তর দিতে রাজি? এভাবে তারা বুঝতে পারবে আমি সত্য বলছি নাকি মিথ্যা। আমি উত্তর দিলাম, "আমাকে এই মেশিনের কাছে অনেক আগেই আনা উচিত ছিল—এতে আমার ঘণ্টার পর ঘণ্টা নির্যাতনমূলক জিজ্ঞাসাবাদ থেকে রক্ষা পেতাম।"

প্রথম প্রশ্ন ছিল: "তোমার সম্পর্কে সব জানেন কে?"
আমি বললাম, "আল্লাহ, আমার স্রষ্টা।"
তারপর তারা জিজ্ঞাসা করল, "আর কে তোমার সম্পর্কে সব জানে?"
আমি বললাম, "আমি নিজেই নিজের সম্পর্কে সব জানি।"
আবার তারা একই প্রশ্ন করল।
আমি বললাম, "আল্লাহ ছাড়া কেউই আমার সম্পর্কে সব জানে না।"
আমেরিকানটি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "এই লাই ডিটেক্টর দিয়ে আমি তোমার হৃদয়ের সব রহস্য জানতে পারব।"
আমি তাকে বললাম, "তুমি নিজেকে আল্লাহর সমান দাবি করো না। এমনকি একজন বাবাও তার ছেলের হৃদয় জানে না।"

তারপর তারা আমার শরীরে বিভিন্ন তার সংযুক্ত করল। এই মেশিন শরীরের তাপমাত্রা, রক্তচাপ, হৃদস্পন্দন, আঙুলের ঘাম ইত্যাদি পরিমাপ করে–যা দেখে জিজ্ঞাসাকারী বুঝতে চায় ব্যক্তি মিথ্যা বলছে কিনা। আমাকে বেশ কিছু সাধারণ প্রশ্ন করা হলো। এই মেশিন আসলে বন্দীদের মধ্যে ভয় ও উত্তেজনা তৈরি করে। বাস্তবে এটি শুধু দেখায় যে একজন মানুষের হৃদয় কতটা শক্তিশালী। দৃঢ় হৃদয়ের মানুষ দ্রুত উত্তর দেয়, বেশি ভাবে না–নাহলে সংশয় তৈরি হয়। বেশিরভাগ আদালতই লাই ডিটেক্টরের ফলাফলকে প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। এটি শুধু বন্দীদের ভয় দেখানোর একটি হাতিয়ার।

অন্য একটি জিজ্ঞাসাবাদে (লাই ডিটেক্টর ছাড়া):
আমার সামনে আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করে একটি বিশ্ব মানচিত্র রাখা হলো–যাতে বিভিন্ন রেখা ও তীর চিহ্নিত ছিল। জিজ্ঞাসাকারীরা বলল, এটি অবৈধ সোনার বাণিজ্যের মানচিত্র, এবং আমিও এতে জড়িত। আমি শুধু অবাকই হলাম না, ভাবলাম–"এরা কতটা বোকা, এমন অর্থহীন বিষয় নিয়ে সময় নষ্ট করছে!"

আমি লক্ষ্য করলাম, মানচিত্রে দেখানো হয়েছে সোনার উৎস আফগানিস্তান। আমি বললাম, "তোমাদের মানচিত্র অনুযায়ী, সোনা আফগানিস্তানে উত্তোলন হয়, তারপর সারা বিশ্বে বিক্রি হয়?"
তারা বলল, "হ্যাঁ, ঠিক তাই।"
আমি বললাম, "যদি তোমরা প্রমাণ করতে পারো যে আফগানিস্তানে সোনার খনি আছে, তাহলে আমি তোমাদের যেকোনো অভিযোগ মেনে নেব।"
তারা কোনো উত্তর না দিয়ে অন্য প্রশ্ন শুরু করল।

তারা আমাকে একটি প্রশ্নপত্র দিল–

"আপনি কি প্রতি সপ্তাহে পেশাওয়ার যান?"

আমি বললাম, "না।"

"আপনি কেন প্রতি সপ্তাহে পেশাওয়ার যান?"

এমন অর্থহীন প্রশ্ন প্রায়ই হতো।

জিজ্ঞাসাবাদের ধরন:
প্রথমদিকে প্রশ্নগুলো শুধু আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কিত ছিল, পরে তা সম্পূর্ণ বদলে গেল।

প্রশ্নগুলো সাধারণ বা দেশের অর্থনীতি সম্পর্কিত ছিল।

প্রাকৃতিক সম্পদ (তেল, গ্যাস, ক্রোমিয়াম, পারদ, সোনা, জেড, রুবি, লোহা, ইউরেনিয়াম) সম্পর্কে বারবার জিজ্ঞাসা করা হতো–আমি আগে কখনও শুনিনি যে আফগানিস্তানে ইউরেনিয়াম আছে!

যখন আমি বলতাম "আমি জানি না", তখন আমাকে শাস্তি দেওয়া হতো বা আইসোলেশন সেলে পুরে দেওয়া হতো।

ইসলাম, মাদ্রাসা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিখ্যাত আলেম ও সম্মেলন সম্পর্কেও অসংখ্য প্রশ্ন ছিল।

একটি মিথ্যা অভিযোগ:
একবার একজন জিজ্ঞাসাকারী আমাকে ইয়েমেনে একটি জাহাজে হামলার (যেখানে ১১ জন আমেরিকান মারা যায়) দায়ী করল। তারা বলল, আমি তখন ইয়েমেনে ছিলাম। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমি ইয়েমেনে কীভাবে গেলাম?"
তারা বলল, "তুমি ইরান হয়ে কাতার গিয়েছিলে, তারপর ইয়েমেন।"
আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আমি কি জাহাজে হামলার ব্যাপারে আগে থেকেই জানতাম?"
তারা বলল, "না, তোমার জানা ছিল না।"
আমি বললাম, "তাহলে আমি বিস্ফোরক নিয়ে গিয়েছিলাম?"
তারা বলল, "সে সম্পর্কে আমাদের কোনো তথ্য নেই।"
আমি বললাম, "আমি জাহাজ, তার অবস্থান বা গন্তব্য সম্পর্কে কিছুই জানতাম না–তাহলে হামলা করলাম কীভাবে? অজানা মিশনে ইরান, কাতার, ইয়েমেন ঘুরে এলাম কীভাবে?"

আমি যোগ করলাম, "আমি কখনও ইরান, কাতার বা ইয়েমেনে যাইনি। যদি তোমরা প্রমাণ করতে পারো, তাহলে আমি অভিযোগ মেনে নেব।"

এই ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ অত্যন্ত হতাশাজনক ছিল–প্রশ্নগুলোর পুনরাবৃত্তি, মিথ্যা অভিযোগ, কোনো প্রমাণ ছাড়াই ধারণা থেকে উঠে আসা সন্দেহ।

তারা আমাদের ক্লান্ত করে ফেলতে চাইছিল। শাস্তির পরে দিতো প্রলোভন, সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি, তারপর আবার শাস্তি। একবার একদল জিজ্ঞাসাবাদকারী এসেছিল, যার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এমন একজন যিনি যাদুকরের মতো দেখাতেন এবং তার দাড়ি ছিল ফরাসি স্টাইলে। তিনি বললেন, এ পর্যন্ত আমাকে ভালোভাবে আচরণ করা হয়নি এবং তার কাছে আমার জন্য ভালো খবর আছে। তিনি বললেন, তিনি আমাকে ধনী করে দেবেন। আমাকে পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, একটি সুন্দর বাড়ি এবং একটি গাড়ি দেবেন। আমি আফগানিস্তানের সবচেয়ে ধনী মানুষ হব, তিনি বললেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, সে কেন আমার জন্য এসব করবে? তিনি বললেন, আমি তাদের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু হব এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে সাহায্য করব।

আমি জিজ্ঞাসাবাদকারীদের দিকে হেসে বললাম, আমি তো আগেই একজন অনেক ধনী মানুষ, কল্পনার অতীতেও ধনী।

"আলহামদুলিল্লাহ, আপনার টাকার কোনো প্রয়োজন নেই আমার। আমি সত্য কথা বলেছি এবং আপনার সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি, ভবিষ্যতেও সত্য বলব। আমি আপনার এ সব ব্যাপার বুঝি না এবং এতে জড়াতে চাই না। আমার শুধু একটাই প্রয়োজন," আমি বললাম, "আমার মুক্তি।"

তিনি বললেন, আমি তাদের বিশ্বাস করি না এবং আমি যা বলছেন তা বুঝতে পারছি না। আমি তাকে বললাম, বিশ্বাস করার মতো এখানে কিছু নেই। "তাই আজ আপনি যা নিয়ে এসেছেন তার জন্য ধন্যবাদ," আমি বললাম, "কিন্তু আমার যা দরকার তা হলো আপনি আমাকে এখান থেকে মুক্তি পাওয়ায় সাহায্য করুন।"

আলোচনা চলল চার ঘণ্টা এবং তারপর তারা চলে গেল। কয়েকজন রয়ে গেল। একজন ছোট মেয়ে, যিনি নিজেকে অ্যাঞ্জেল বলে পরিচয় দিলেন, এগিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি কি জানি তিনি কে? আমি বললাম, আমি জানি তিনি একজন আমেরিকান। তিনি বললেন, আমি তার ব্যাপারে অনেক কিছু বুঝিনি। তিনি বললেন, তিনি এখানে দায়িত্বে আছেন এবং তারই আমার মুক্তি, আমার জীবন এবং আমার শাস্তির উপর আসল কর্তৃত্ব। যদিও অন্যরা ইতিমধ্যে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, তিনি তাদের পাওয়া তথ্য বিশ্বাস করেন না বা গ্রহণ করেন না।

তিনি আবার শুরু করবেন এবং আমাকে সত্য বলতে হবে, তার সঙ্গে ভালোভাবে আচরণ করতে হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, যখন পরবর্তী জিজ্ঞাসাবাদকারী আসবে তখন কি হবে? "তিনি কি আপনার তথ্য গ্রহণ করবেন," আমি বললাম, "নাকি আবার শুরু থেকে শুরু করবেন? আমরা এখানে কখনো কীভাবে আমাদের ভাগ্য জানব?" তিনি আমাকে কথা বলতে বাধা দিলেন।

"আপনি যদি বলা না হয়, কথা বলবেন না," তিনি বললেন। "আমি আপনাকে শিখাব। আমি আপনার সব অহংকার ছিনিয়ে নেব।" এই কথা শুনে আমি খুব রেগে গেলাম এবং যে কথাগুলো আমার মনে এলো সব বললাম। আলোচনা শেষ হলো। তারা চলে গেল, আর আমি তাদের আর কখনো দেখিনি।

ক্যাম্পে কোনো নিয়ম ছিল না। যেসব জিজ্ঞাসাবাদকারী আসত এবং যেত তারা তাদের ইচ্ছামতো আচরণ করত, ঠিক অন্য ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ এবং ব্লকগুলোর সৈন্যদের মতো। কোনো নিয়মের বই ছিল না; কেউ কীভাবে আচরণ করবে তা জানা যেত না। তারা যা ইচ্ছা করত করত, আমাদের শাস্তি দিত এবং বন্দীদের অপব্যবহার করত তাদের মতো উপযুক্ত মনে করে। শেষে, যখন কোনো বন্দী অভিযোগ করত বা তদন্ত হতো, শুধুমাত্র সৈন্যদের কাছেই প্রশ্ন করা হতো, কারণ ধারণা ছিল তারা মিথ্যা বলবে না। বন্দীদের, এমনকি যারা এতে যুক্ত ছিল, প্রায়ই কোনো প্রশ্ন করা হতো না, আর তাদের বলা কথাকে মিথ্যা ধরে নেওয়া হতো যদি প্রশ্ন করা হতো।

আমি মনে করতে পারি না আমার আটককালে আফগানিস্তান ও গুয়ান্তানামোতে কতজন ভিন্ন ভিন্ন জিজ্ঞাসাবাদকারী ছিল। তাদের অধিকাংশই আমার প্রতি অন্যায় করেছে, বিভিন্নভাবে আমাকে শাস্তি দিয়েছে এবং আমাকে কষ্ট দিয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে এই পৃথিবী ও পরকালে আমার ওপর করা অন্যায়গুলোর প্রতিশোধ নিক।

*****

বাইরের বিশ্বে গুয়ান্তানামোকে ঘিরে আমেরিকার উপর চাপ বাড়ছিল। তিন বছর পর তারা "শত্রু যোদ্ধা মর্যাদা ট্রাইব্যুনাল রিভিউ বোর্ড" নামে একটি ব্যবস্থা চালু করল, যা ছিল বিশ্ববাসী এবং বন্দীদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য। অনেক বন্দী এই সংবাদে আশাবাদী হয়েছিল, যদিও বাস্তবে এটি ছিল অবৈধ ও অসাংবিধানিক। এই বোর্ড গঠন করা হয়েছিল বন্দীদের মধ্যে কে শত্রু তা নির্ধারণ করতে এবং কারা অভিযোগ পাওয়ার পর কলাম্বিয়া জেলা আদালতে বিচার চাইতে পারবে তা ঠিক করতে।

এই ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছিল আমাদের জিজ্ঞাসাবাদকারীদের দিয়ে। একজন হতেন বিচারক, আরেকজন রক্ষক (defender), আর তৃতীয়জন অভিয়োগকারী (prosecutor)। সবাই ছিল সিআইএ, এফবিআই এবং অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার কর্মী। তারা সবাই প্রশিক্ষিত জিজ্ঞাসাবাদকারী ছিল, কিন্তু কেউই আইন পড়েনি বা আইন বুঝত না। এটি ছিল শুধুই একটি প্রহসনের খেলা। আমাকে একটি জিজ্ঞাসাবাদকারীর কাছে নেওয়া হলো, যে নিজেকে আমার ব্যক্তিগত প্রতিনিধি বলে দাবি করল। সে ছিল আমার আগের সব জিজ্ঞাসাবাদকারীর চেয়েও বেশি রূঢ়, এবং দাবি করল আমি যেন তাকে আমার আটক হওয়ার সমস্ত তথ্য দিই, যাতে সে ট্রাইব্যুনালের সামনে আমাকে রক্ষা করতে পারে।

আমি তাকে এবং ট্রাইব্যুনালকে সন্দেহের চোখে দেখছিলাম এবং তাকে কিছু প্রশ্ন করলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে কি কখনো কোনো স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়েছে? সে বলল, না। আমি ট্রাইব্যুনাল বোর্ড সম্পর্কে জানতে চাইলাম–তারা কি কখনো আইন বা বিচারপ্রক্রিয়ার সাথে জড়িত ছিল? আবারও সে বলল, না। এরপর আমি জানতে চাইলাম, আমাকে কোন আইনের–জাতীয় না আন্তর্জাতিক–আধারে বিচার করা হবে? সে বলল, কোনো আইন নেই, কারণ বন্দীদের উপর কোনো আইনই প্রযোজ্য নয়। বোর্ড কেবল তাদের সিদ্ধান্ত জানাবে। অবশেষে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের সবাইকে যে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল আমরা "শত্রু যোদ্ধা" –এটি কোন আইনের আওতায়? সে বলল, সে জানে না।

তখন আমি কথা বললাম।

"ভালোই হয়েছে যে আপনি আইন জানেন না, বিচারকও জানেন না, এবং এমন কোনো আইন নেই যার আওতায় আমাকে বিচার করা হবে। এখানে কোনো আইনই নেই, আর তিন বছর আগে যখন তারা আইন ছাড়াই আমাদের শত্রু যোদ্ধা বলে রায় দিয়েছে, তখন এখন হঠাৎ করে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার দরকার কী? আপনি

বলছেন আপনি আমার প্রতিনিধি, কিন্তু এর জন্য তো আমার সম্মতি প্রয়োজন, তাই না? আপনি আমার শত্রু। আমি এই ধরনের ট্রাইব্যুনাল বা আপনার কোনো সাক্ষাৎ মেনে নিচ্ছি না। আমি আপনাকে আমার প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করি না। এখন আপনি যা খুশি করুন–আমাকে শাস্তি দিন বা না দিন–কিন্তু আবার কখনও এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন না!"

সে বলল, তার সাথে সহযোগিতা করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে, কারণ সে যেভাবেই হোক আমার অনুপস্থিতিতে আমাকে প্রতিনিধিত্ব করবে। আমি বললাম, আমি তার ওপর বিশ্বাস করি না, আমি তার ট্রাইব্যুনালের ওপর বিশ্বাস করি না, এবং সে যা খুশি করতে পারে। আমি কাউকে আমার পক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে দেব না। শেষে, আমাকে তাকে ধমক দিয়ে বিদায় করতে হলো।

ট্রাইব্যুনাল এসে চলে গেল। পরে আরেকটি বোর্ড গঠন করা হলো, নাম ছিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিভিউ বোর্ড। আমি এটাকেও প্রত্যাখ্যান করলাম। আমি তাদের সামনে যাইনি, এবং তারা আমার সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তও দেয়নি। আমাদের সবাইকেই শত্রু যোদ্ধা হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, হোক সে আল-কায়েদা হোক বা তালেবান। আমরা কখনও অভিযোগের কারণ শুনিনি, বা এর প্রমাণ দেখিনি।

গুয়ান্তানামোতে লোকজনকে নানা অজুহাতে আটক করা হয়েছিল; অনেক সময় বন্দীদের সঙ্গে আল-কায়েদা বা তালেবানের কোনো সম্পর্কই ছিল না। কেউ তালেবানকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য বা তাদের খাবার দেওয়ার জন্য অভিযুক্ত হতো, আবার কেউ কোনো পরিচিত মুজাহিদিন বা তালেবান কমান্ডারকে চেনার কারণে। কাউকে হামলা বা বিস্ফোরণের অভিযোগে বন্দী করা হতো। কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হতো; কেউ "মুজাহিদের পোশাক" পরার জন্য ধরা পড়ত। এক ব্যক্তিকে ধরা হয়েছিল কারণ তার কাছে একটি আয়না ছিল, আরেকজনের কাছে ফোন ছিল, তৃতীয়জন তার গবাদি পশু দেখার জন্য দূরবীন ব্যবহার করছিল। এক বন্দী বলেছিল, তাকে ধরা হয়েছিল কারণ তার একমাত্র পরিচয়পত্র ছিল ২৫ বছর আগের একটি শরণার্থী পরিচয়পত্র। এটাই ছিল আমেরিকার 'তথ্য' ও 'প্রমাণ'।

আমি এরকম বহু কাহিনি শুনেছি। কেউ ছিল সাবেক তালেবান, কেউ বর্তমান সরকারের সদস্য, কেউ জুতা মেরামতকারী, কামার, রাখাল, সাংবাদিক, মানি চেঞ্জার, দোকানদার, মসজিদের ইমাম। বহু পুরনো মুজাহিদিন এবং এমনকি আমেরিকার নিজস্ব দোভাষীরাও কিউবায় বন্দী ছিল। কিছু পশতু ভাইকে শুধুমাত্র কোনো আরব দেশে গিয়ে সেখানে ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে গুয়ান্তানামোতে আনা হয়েছিল। এদের অনেকে তিন বছর বন্দী থাকার পর নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে মুক্তি পেয়েছিল। কিন্তু কেউই কিছু পায়নি; না সময় নষ্ট হওয়ার কোনো ক্ষতিপূরণ, না তাদের কষ্টের কোনো প্রতিকার।

২০০৫ সালের গ্রীষ্মে, হতাশা ও দুঃখ-যন্ত্রণা মিলিয়ে বড় ধরনের অনশন ধর্মঘট শুরু হয়। বন্দীরা খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয়, এবং এক পর্যায়ে ২৭৫ জন এতে অংশ নেয়। কিছু আরব ভাই দৃঢ় সংকল্প করেছিল, তারা মৃত্যুর

আগ পর্যন্ত এই অনশন চালিয়ে যাবে। বন্দীরা একটি মুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত ট্রাইব্যুনাল এবং তাদের মানবাধিকার রক্ষার দাবি জানায়।

এই ধর্মঘট ২৬ দিন স্থায়ী ছিল, এবং প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বন্দী কোনো না কোনোভাবে এতে অংশ নিয়েছিল। ক্যাম্পের কমান্ডার কর্নেল বামগার্নার ঘোষণা করেন যে জেনেভা কনভেনশনের কিছু ধারা বন্দীদের ওপর প্রয়োগ করা হবে এবং তিনি ধর্মঘট বন্ধ করার আহ্বান জানান। সৌদি আরবের শেখ শাকির, যিনি নিজেও অনশনে ছিলেন এবং বন্দীদের মধ্যে সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন, তাকে প্রত্যেক বন্দীর কাছে নিয়ে যাওয়া হয় যাতে তিনি তাদের অনশন ভাঙাতে পারেন।

অবশেষে অনশন শেষ হয়। বন্দীদের পক্ষ থেকে ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল গঠন করা হয়, যারা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে এবং বন্দীদের পক্ষ থেকে আমেরিকান কর্তৃপক্ষকে প্রস্তাব দিতে পারবে। এই দলে ছিলেন শেখ শাকির, শেখ আবদুর রহমান, শেখ ঘাসান, শেখ সাবির, শেখ আবু আলি এবং আমি। আমরা দ্রুত একটি সমাধান খোঁজার সর্বোচ্চ চেষ্টা করি যাতে অন্য বন্দীদের সন্দেহ না হয়। আমরা আমেরিকানদের ফাঁদে না পড়ার জন্য খুবই সতর্ক ছিলাম। এই প্রতিনিধিদলের সঙ্গে তিনটি বৈঠক হয়। প্রথম বৈঠক হয় ২০০৫ সালের ৭ আগস্ট। এতে অংশ নেন ক্যাম্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্নেল মাইকেল বামগার্নার, ক্যাম্প কমান্ডার এবং আরেকজন প্রতিনিধি।

খর্বাকৃতি বামগার্নার বৈঠক শুরু করেন এই বলে যে তিনি বন্দীদের প্রতিনিধি দলকে সম্মান করেন; তিনি একটি নিরাপদ কারাগার চান এবং এর জন্য আমাদের প্রয়োজন, কারণ অন্যান্য বন্দীরা আমাদের কথা শুনে। তিনি বলেন তিনি আমাদের সিদ্ধান্তকে সম্মান করবেন এবং তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন যাতে জেনেভা কনভেনশনের কিছু ধারা ক্যাম্পে প্রয়োগ করা যায়, এবং কোন ধারা প্রয়োগ হবে তা আমাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

আমরা তাদের বলেছিলাম যে তারা যেন অবিলম্বে বন্দীদের ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং অপব্যবহার বন্ধ করে দেয়। চার বছর ধরে তারা বিশ্বের সামনে ঠকিয়েছিল যে তারা কোনো প্রমাণ, কোনো আইন বা কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ ছাড়াই সন্ত্রাসীদের আটক করেছে, আমাদের পিঁজরায় আটকে রেখেছে। তারা যা শুনেছিল তা গ্রহণ করেছিল, এবং বলেছিল তারা আমাদের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা শুরু করবে। কিন্তু তাদের কথা ছিল মিথ্যা: ফাঁকা প্রতিশ্রুতি যা কখনো বাস্তবে পরিণত হয়নি। প্রতিনিধিদের অন্য বন্দীদের থেকে আলাদা করে নেয়া হয়েছিল এবং তাদের কঠোর শাস্তি দেয়া হয়েছিল। কেউ জানত না তারা কোথায়, এবং কঠিন পরিস্থিতি চলতেই থাকল। আবারও ধর্মঘট শুরু হলো, প্রায় তিনশো বন্দী খাবার বন্ধ করলো। বিশজন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত খাওয়া বন্ধ রাখার প্রতিশ্রুতি দিলো।

ক্যাম্পে একাধিক বার হাংগার স্ট্রাইক হয়েছিল এবং তা শেষ হয়েছিল আমেরিকানদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পরেই, কিন্তু এইবার শুরু হওয়া ধর্মঘট আমার মুক্তির দিন ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত চললো। প্রতিদিন

অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বাড়ছিল; অনেকে এতটাই দুর্বল হয়ে পড়ছিলো যে মৃত্যুর কাছাকাছি, তাদের পিঁজরায় বা কোঠায় অজ্ঞান হয়ে পড়ছিলো এবং চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছিলো। তাদের জোরপূর্বক ইনট্রাভেনাস দিয়ে খাবার দেয়া হতো, কিন্তু হাসপাতালে থেকেও তারা ডাক্তারদের খাবার খাওয়ানো থেকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করত। তারা আর যা হচ্ছে তা সহ্য করতে পারছিল না এবং জীবনের চেয়ে মৃত্যুকে বেছে নিয়েছিল। হাসপাতাল ক্ষুধার্ত রোগীদের ভরে গিয়েছিল। ডাক্তাররা এত ব্যস্ত ছিলেন জরুরি রোগীর জন্য যে অন্য রোগীদের চিকিৎসার জন্য অপেক্ষা করতে হত। দায়িত্বে থাকা চিকিৎসক বন্দীদের জোরপূর্বক খাবার খাওয়ানো থেকে বিরত ছিলেন, তাই পাঁচজন অন্য ডাক্তার আনা হয়। সমস্যা চলতে থাকে ১৯ জানুয়ারি ২০০৬ পর্যন্ত।

এখন কোথায় আছে জাতিসংঘ, যারা এত সহজে বিশ মিলিয়ন আফগানদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা সমর্থন করেছিল, অথচ এখন হাজার হাজার মুসলিম বন্দী, ন্যায়বিচার, আইন ও মানবাধিকারের জন্য চিৎকার করছে? আর কার জন্য?

GETTING OUT

২০০৪ সালের ১১ মে, সেবার রমজানের ষোড়শ দিন, আমাকে আবারো জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হবে বলে মনে করে স্থানান্তর করা হয়। যে ঘরে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেটা ছিল একটি অফিস ঘর, সুন্দরভাবে সাজানো, একটি ডেস্ক ও টেলিভিশন সেট ছিল সেখানে। ঘরে ঢোকানোর পর আমার হাত-পা খোলা হলো–গুয়ান্তানামোতে আসার পর এই প্রথম কোনো সেলের বাইরে আমার হাত-পা খোলা হলো। কিছুক্ষণ পর এক আফগান ব্যক্তি তিনজন আমেরিকানকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। আমেরিকানদের মধ্যে দুইজনকে আমি চিনতাম–তারা আগে আমাকে খুব ভালোভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। তৃতীয় আমেরিকান নিজেকে আফগানিস্তানে নবনির্মিত আমেরিকান দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা হিসেবে পরিচয় দিলেন।

আফগান ব্যক্তি নিজেকে আফগান সরকারের একজন প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় দিলেন; তিনি খুব সদয় মনে হচ্ছিলেন, কিন্তু আমি সন্দেহ করছিলাম তিনি আসলেই তা কি না। আমরা কিছুক্ষণ কথা বললাম। তিনি বন্দীদের এবং আমার প্রতি সহানুভূতি ও দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং আগের যে দলটি প্রতিনিধি পরিচয়ে এসেছিল তাদের চেয়ে একেবারে ভিন্ন আচরণ করলেন।

আমি ঐ ব্যক্তির সঙ্গে দুবার দেখা করেছিলাম। দ্বিতীয়বার তিনি আমাকে মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। খাবার ছিল সুস্বাদু, টাটকা ফল আর পেপসিও ছিল, এবং আমি সম্মানিত বোধ করেছিলাম। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে আমাকে কিউবা থেকে মুক্ত করতে তিনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন; বাস্তবে তা হতে আরও এক বছর লেগে যায়। আমি এই জীবন্ত কবরস্থান থেকে বেরিয়ে যেতে মুখিয়ে ছিলাম, যা আমেরিকানরা তৈরি করেছিল।

প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাতের পর কিছু আমেরিকান জিজ্ঞাসাবাদক সপ্তাহে এক-দুইবার আমাকে দেখতে আসতেন। প্রথমবারের মতো আমাকে একজন মানুষ হিসেবে আচরণ করা হয়েছিল; তারা আমাকে জিজ্ঞেস করত আমি কিছু চাই কি না এবং আমার যা খুশি খেতে চাই তা এনে দিত। ক্যাম্পে আমার জীবন কিছুটা ভালো হয়ে গেল, অথচ অন্যদের অবস্থা আরও খারাপ হতে লাগল। জিজ্ঞাসাবাদকারীদের কাছ থেকে পাওয়া সামান্য জিনিস–সুগন্ধি, শ্যাম্পু আর খুব ভালো মানের জলপাই তেল–আমি অন্য বন্দীদের সঙ্গে ভাগ করে নিতাম।

আফগান প্রতিনিধি এক মাস পর ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এবং আমি তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সেই এক মাস দুই মাস হয়ে গেল এবং আমার সন্দেহ বাড়তে থাকল। আমি হতাশ হয়ে পড়লাম। জিজ্ঞাসাবাদকরা শুধু বলত প্রতিনিধি আসবে, এবং আমাকে মুক্ত করা হবে। কয়েক মাস পর একজন জিজ্ঞাসাবাদক জানালেন যে আফগান প্রতিনিধি পরের সপ্তাহে আসবেন এবং আমাকে মুক্ত করবেন; তিনি আমাকে আমার মাতৃভূমিতে নিয়ে যাবেন। তার আগে আমাকে আবারও স্থানান্তর করা হবে। আমি তাদের বিশ্বাস করিনি; আমেরিকানরা এতবার আমাকে মিথ্যা বলেছে যে তখন আর বুঝতে পারতাম না তারা সত্যি বলছে কি না। অনেক বন্দী আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করত, এমনকি কেউ কেউ শপথ করে বলত এটি আমেরিকানদের আরেকটি ষড়যন্ত্র।

পরের সপ্তাহে আমাকে আরেকটি জায়গায় স্থানান্তর করা হলো। এটি একটি সুন্দর কক্ষ ছিল, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, ফ্রিজ, টেলিভিশন সেট, এবং আলাদা বাথরুম ছিল। চা এবং কফি মেকার ছিল, শ্যাম্পু ও সাবানও। কয়েক বছরের মধ্যে এই প্রথম আমি নিজের হাতে এক কাপ সবুজ চা বানালাম, যা ছিল বন্দিদশায় আমার সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষাগুলোর একটি।

একজন জিজ্ঞাসাবাদক এসে আমাকে বললেন যে আমাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তিনি আমাকে অভিনন্দন জানালেন এবং বললেন, এই অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত জেনারেল আমাকে দেখতে এসেছেন এবং তিনিও অভিনন্দন জানিয়েছেন। আগামীকাল, তিনি বললেন, আফগান প্রতিনিধি ফিরে আসবেন এবং আমাকে আরও তথ্য দেবেন। যদিও আমি খুশি ছিলাম যে চলে যাচ্ছি, তবুও আমাকে ভাবতে হচ্ছিল বন্ধুদের কথা, যাদের আমাকে রেখে যেতে হবে–আইন-বিধানহীন, মানবিক মর্যাদা ছাড়া।

প্রতিনিধি এলেন এবং আমাকে আমার পরিবার ও আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জানালেন; বিনিময়ে আমি তাকে ক্যাম্প, বন্দীদের জীবনযাত্রা এবং আমাদের চারপাশে যা ঘটছে তা জানালাম। আমি তাকে অনুরোধ করলাম আমেরিকানদের সঙ্গে কথা বলার জন্য এবং এসব বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য। পরদিন সকালে আবার আমাকে আগের পিঁজরায় ফেরত নিয়ে যাওয়া হলো। আমি অপেক্ষা করছিলাম রেড ক্রিসেন্ট প্রতিনিধিদলের, যারা বন্দিমুক্তির আগে সবার সঙ্গে দেখা করত।

হঠাৎ, একদল আমেরিকান আমার পিঁজরায় এলো। তাদের কাছে একটি ভিডিও ক্যামেরা এবং একজন পশতু অনুবাদক ছিল। তারা আমাকে একটি কাগজ দেখাল। বলা হলো, আমাকে মুক্তি পেতে হলে কাগজে যা কিছু লেখা আছে সব মেনে নিয়ে স্বাক্ষর করতে হবে।

- অপরাধী নিজের অপরাধ স্বীকার করে এবং তাকে ক্ষমা করে দিয়ে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে ধন্যবাদ জানায়।

- বন্দী ব্যক্তি আল-কায়েদা এবং তালেবান আন্দোলনের সদস্য ছিলেন। তিনি তাদের সঙ্গে নিজের যেকোনো সংযোগ চিরতরে বিচ্ছিন্ন করবেন।

- বন্দী অঙ্গীকার করেন যে, তিনি ভবিষ্যতে কোনো ধরনের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে অংশ নেবেন না।

- বন্দী অঙ্গীকার করেন যে, তিনি কখনোই কোনো ধরনের জোটবিরোধী বা আমেরিকাবিরোধী কার্যকলাপে অংশ নেবেন না।

- উপরোক্ত শর্তগুলোর কোনো একটি ভঙ্গ করলে, বন্দীকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হবে এবং বাকি জীবন কারাবন্দি রাখা হবে।

বন্দীর স্বাক্ষর:

আমি ওই কাগজে লেখা শর্তগুলি পড়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। কিছু সৈন্য ও সিনিয়র কর্মকর্তা একটি ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে সবকিছু রেকর্ড করছিলেন, যখন আমি দোভাষীর ব্যাখ্যা শুনছিলাম। তারা আমাকে সেই কাগজে স্বাক্ষর করতে দিল, কিন্তু আমি রাগে সেটি তাদের দিকে ছুড়ে ফেললাম।

"আমি একজন নির্দোষ মানুষ, কোনো অপরাধী নই," আমি বললাম। "আমি কখনোই কোনো অভিযোগ মেনে নিইনি, নেবও না। আমি কখনোই আমেরিকানদের ক্ষমা বা মুক্তির জন্য ধন্যবাদ জানাতে পারি না। যদি আমি কোনো অপরাধ করে থাকি, তাহলে কোন আদালত আমাকে অপরাধী ঘোষণা করেছে!?

"দ্বিতীয়ত, আমি একজন তালেবান ছিলাম, আছি এবং সবসময় থাকব, কিন্তু আমি কখনোই আল-কায়েদার সদস্য ছিলাম না!

"তৃতীয়ত, আমাকে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে, যা আমি কখনোই করিনি। তাহলে কীভাবে আমি এমন কিছুর স্বীকারোক্তি দেব যা আমি করিইনি? বলো তো!

"চতুর্থত, আফগানিস্তান আমার দেশ। কেউ আমাকে আমার ঘরে কী করব তা বলার অধিকার রাখে না। যদি আমি আমার ঘরের মালিক হই, তাহলে অন্য কেউ এসে কীভাবে আমাকে আদেশ দিতে পারে?

"পঞ্চমত, আমি এখনো বন্দী অবস্থায় আছি, নির্দোষভাবে বন্দী। আবারও আমাকে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে, যেকোনো অপরাধে অভিযুক্ত করা যেতে পারে, তাই আমি কোনো কাগজে স্বাক্ষর করব না।"

তারা জোর করে আমাকে স্বাক্ষর করতে বলল। তারা বলল, যদি আমি স্বাক্ষর না করি, তাহলে আমাকে মুক্তি দেওয়া হবে না, কিন্তু আমি তবু স্বাক্ষর করিনি। এমনকি যদি আমাকে বাকি জীবন কারাগারে কাটাতে হতো, তবু আমি কখনোই নিজেকে অপরাধী স্বীকার করতে পারতাম না। বহুবার তারা চলে গিয়ে আবার ফিরে এল, কিন্তু আমি তবুও স্বাক্ষর করিনি।

শেষ পর্যন্ত তারা বলল, আমি চাইলে নিজের মতো করে কিছু লিখে দিতে পারি। আমি বাধ্য হয়ে কিছু লিখলাম:

আমি কোনো অপরাধী নই। আমি একজন নির্দোষ মানুষ। পাকিস্তান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাকে প্রতারিত করেছে। আমাকে চার বছর ধরে কোনো নির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়াই বন্দী রাখা হয়েছে। আমি বাধ্য হয়ে এই কথা লিখছি এবং জানাচ্ছি যে আমি কোনো ধরনের আমেরিকাবিরোধী কর্মকাণ্ড বা সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ করব না।
ওয়াসসালাম।

এরপর আমি আমার লেখায় স্বাক্ষর করলাম এবং তারা আমাকে একা রেখে গেল। আমি ভাবছিলাম, তারা কি আমার লেখা মেনে নেবে? কিছুক্ষণ পর রেড ক্রিসেন্টের একটি প্রতিনিধি দল এল এবং আমাকে মুক্তির জন্য অভিনন্দন জানাল। তারা বলল, আমি চাইলে শিগগিরই আমাকে আফগানিস্তানে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

আমি মনে করলাম, এ কেমন প্রশ্ন! আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, যদি আমি আফগানিস্তানে ফিরতে না চাই, তাহলে তারা কী করতে পারবে? তাহলে কি আমাকে বাকি জীবন এই বন্দিশালায় কাটাতে হবে? তারা বলল, তারা কিছুই করতে পারবে না। সবকিছু আমেরিকানদের হাতে।

অবশ্যই, তাদের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না সাহায্য করার। আমার কোনো বিকল্প ছিল না–আফগানিস্তানে ফেরা অথবা আজীবন কারাগারে থাকা… আফগানিস্তান আমার দেশ; আমি দেশকে ভালোবাসি, কিন্তু আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম তারা কেন এমন প্রশ্ন করছে, যেটা তাদের কর্তৃত্বের মধ্যে পড়ে না। তারা আমেরিকানদের কর্মকাণ্ডে আইনি রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছিল। রেড ক্রিসেন্টের প্রতিনিধি দল চলে গেল।

আমাকে ক্যাম্প ফাইভ-এ নিয়ে যাওয়া হলো, যেখানে আমি অন্যান্য বন্দীদের বিদায় জানালাম। ভাইদের তাদের কবর থেকে বের করে একটি বড় খাঁচায় নিয়ে আসা হলো। আমি তাদের সঙ্গে দেড় ঘণ্টা কথা বললাম, তারপর তাদের ছেড়ে এলাম। মুক্তি পাওয়াটা ছিল এক ধরনের লজ্জার বিষয়। আমার ধর্মীয় ভাইরা তাদের জীবনের সবচেয়ে কঠিন অবস্থায় রয়ে গেল, তবুও তারা আমার মুক্তিতে খুশি ছিল। আমি শুধু ক্যাম্প ফাইভ-এ বন্দী আফগানদের সাথে দেখা করতে পেরেছিলাম; আমি আরব ভাইদের দেখতে পারিনি। পরে আমাকে ক্যাম্প ওয়ান-এ নিয়ে যাওয়া হলো আফগান বন্দীদের বিদায় জানাতে, তারপর ক্যাম্প ফোর-এ নিয়ে যাওয়া হলো, যেখানে আমি আরব ও আফগান সকল ভাইদের বিদায় জানালাম।

তারপর আমি আবার আগের জায়গায় ফিরে গেলাম, বিশ্রাম নিলাম এবং কিছু খাওয়া খেলাম। তখন রাত এগারোটা। আমি নামাজ পড়লাম এবং ঘুমিয়ে পড়লাম। রাত একটা নাগাদ তারা এসে আমাকে বিমানবন্দরে নিয়ে গেল। আমার হাত ও পা আবার শৃঙ্খলিত করা হলো, যেমনভাবে আমাকে চার বছর আগে কিউবায় নিয়ে আসা হয়েছিল।

বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর একজন জেনারেল সৈন্যদের বললেন আমাকে মুক্ত করতে। সব আলো নিভানো ছিল। আমি একটি উড়োজাহাজ দেখতে পেলাম যা উড্ডয়নের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, এবং আমি তার দিকে এগিয়ে গেলাম, যেখানে কিছু আমেরিকান ও আফগান উপস্থিত ছিলেন আমাকে গ্রহণ ও আনুষ্ঠানিকভাবে আফগান কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের জন্য। প্রতিনিধি দল আমাকে মুক্তির জন্য অভিনন্দন জানাল এবং বলল আমি উড়োজাহাজে উঠতে পারি। এই প্রথমবার আমি নিজে হেঁটে চললাম, আমার কাঁধে কোনো আমেরিকান হাত ছিল না।

ছোট জেট উড়োজাহাজটি আফগান প্রতিনিধি দলের দ্বারা ভাড়া করা হয়েছিল। জেনারেল উড়োজাহাজে এসে আমাকে বিদায় জানালেন। আমাদের সঙ্গে ছিল আরও চারজন আমেরিকান, যারা নিরাপত্তা কর্মকর্তার মতো দেখাচ্ছিল। রাত প্রায় তিনটা বাজে যখন উড়োজাহাজটি উড্ডয়ন করল। আফগান প্রতিনিধি আমার জন্য আফগান ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও পাগড়ি নিয়ে এসেছিলেন। আমি উড়োজাহাজে মুক্তভাবে হাঁটতে পারছিলাম, টয়লেট ব্যবহার করতে পারছিলাম। আমি খাবার, ফলমূল খাচ্ছিলাম এবং কোনো সমস্যা ছাড়াই ঘুমাতে পারছিলাম।

উড়োজাহাজটি প্রথমে দশ ঘণ্টার ফ্লাইট শেষে ইংল্যান্ডে অবতরণ করল জ্বালানি নেওয়ার জন্য; এরপর আরও সাত ঘণ্টা উড়ে আমরা কাবুল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছালাম।

*****

আমি চার বছর পর যখন কাবুলে ফিরলাম, তখন শহরটা অনেক বদলে গিয়েছিল, বিশেষ করে বিমানবন্দর। আমেরিকানরা সেখানে রাস্তা, সুরক্ষা বেষ্টনী এবং একটি ক্যাম্প তৈরি করেছিল, যা দেখতে একটা ছোট শহরের মতো লাগছিল। আমি বিমান থেকে নেমেই সিজদাহ দিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম।

১১ সেপ্টেম্বর ২০০৫-এ আমি গুয়ান্তানামো থেকে মুক্তি পাই। পরদিন আমি কাবুল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছাই এবং আমেরিকানরা আমাকে জাতীয় নিরাপত্তা অধিদপ্তরে নিয়ে যায়। সেখান থেকে আমি মোল্লা মুতাওয়াক্কিলের বাসায় যাই, যেখানে আমার পরিবার ছিল, এরপর আমি মুজাদ্দেদীর বাসায় যাই আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার জন্য।

দুই দিন পর আমাকে একটি বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়, যা সরকার আমার জন্য খুশহাল মিনায় ভাড়া করেছিল। এরপর এমন কিছু ঘটল যা আমাকে খুব আবেগপ্রবণ এবং কষ্টাহত করল। আমি যখন গুয়ান্তানামো থেকে বের হচ্ছিলাম, তখন আমাকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে আফগানিস্তানে আমেরিকানরা আমাকে আর কখনও জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। আমি আফগান প্রতিনিধিদলকে বলেছিলাম যে, আমার দেশে গিয়ে যেন আর কোনো প্রশ্ন না করা হয়।

আমি নিশ্চিত ছিলাম, আমেরিকা আফগানিস্তানে প্রতিদিনই নতুন নতুন সমস্যার মুখোমুখি হবে। যদি তারা আমার সঙ্গে এই সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলতে চায়, সেটাই হবে জিজ্ঞাসাবাদ। প্রতিদিন তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বা সাহায্য করা আমার পক্ষে খুব কঠিন হবে। তাই আমি তাদের দিয়ে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম যে, জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হয়ে গেছে। আমি বলেছিলাম, আমেরিকানদের যেন আমার বাসায় আর কখনও কোনো প্রশ্ন নিয়ে প্রবেশ করার অনুমতি না থাকে। তারা তা মেনে নিয়েছিল, এমনকি বলেছিল যে আগামী এক বছরের খরচও তারা বহন করবে।

প্রথম চার মাস সব কিছু পরিকল্পনা অনুযায়ীই চলল। কোনো আমেরিকানকে চোখে পড়েনি। কিন্তু পঞ্চম মাসে আফগান জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ থেকে আমার কাছে একটি ফোন আসে। তারা জানতে চায় তারা কি আমার বাসায় আসতে পারে। আমি বললাম, "আপনাদের স্বাগতম", ভেবে নিয়েছিলাম তারা আফগানরাই হবে।

বিকাল ২টায় দেখি আমার বাসার বাইরে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরা সশস্ত্র আমেরিকান সৈন্যরা দাঁড়িয়ে। আমি দৃশ্যটি পছন্দ করিনি। আমি কখনও চাইনি, আমার বাসার কাছে এই ধরনের সশস্ত্র আমেরিকান দখলদারদের দেখতে। তবু আমি নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করলাম। আমি বললাম আমি অসুস্থ, কোনো উত্তর দিলাম না, কারণ নীরবতাই ভালো। তারা চলে গেল। কিন্তু দুই দিন পর আগের সেই ব্যক্তিই আবার ফোন করে জানালেন, আজই আবার বিকাল ২টায় আসবেন।

এইবার আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কে আসবে?" সে বলল, "আগের যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরাই আসবেন।" আমি তাকে বললাম, গুয়ান্তানামোতে আমাকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, এই লোকেরা আর কখনও আমার বাসায় আসবে না। আমি বললাম, "যদি আমি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারি, তাহলে আমি তাদের আসতে নিষেধ করব। আর যদি আমি স্বাধীন না হই, তাহলে হ্যান্ডকাফ আর শিকল নিয়ে এসো, যেখানে খুশি নিয়ে যাও, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য।"

এর কিছুক্ষণ পর, গুয়ান্তানামো থেকে আমাকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে যিনি সাহায্য করেছিলেন, তিনি আমাকে ফোন করলেন। সালামের পর বললেন, "তাদের আসতে দাও, কিছু প্রশ্ন আছে। প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও আর তাদের বিদায় করো।"

আমি তাকে না করতে পারিনি। সে আমার জন্য অনেক কিছু করেছে। আমি রাজি হলাম। বললাম, "আসতে পারে।" কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমি শুধু চাইছিলাম, সবকিছু একবারেই শেষ হয়ে যাক। তবে সবকিছু আমার হাতে ছিল না। দেখি কী হয়।

বিকাল ২টায় তারা এল, হাতে দীর্ঘ প্রশ্নপত্রের তালিকা। কিন্তু আমি কোনো উত্তর না দিয়ে, বরং নিজেই প্রশ্ন করলাম– "ঠিক আছে, আমি বুঝি, তোমাদের আফগানিস্তানে অনেক সমস্যা। প্রতিদিনই নতুন প্রশ্ন আসবে এবং তোমরা উত্তর খুঁজতে আমার কাছে আসবে। আজ যদি আমি উত্তর দিই, তাহলে এই জিজ্ঞাসাবাদ থামবে না। তাই আমি কোনো উত্তর দেব না।"

তারা বলল, ভয় পেতে হবে না। "তোমার নিরাপত্তা নিশ্চিত। তোমার ও তোমার পরিবারের কোনো ক্ষতি হবে না। তোমার তথ্য আমাদের কাছে নিরাপদ থাকবে, আমরা তোমাকে আরও সাহায্য করব।"

আমি বললাম, সুযোগ-সুবিধা দেওয়া আর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়ার কথা এক জিনিস, "কিন্তু," আমি বললাম, "আমি তোমাদের সহযোগিতা করতে পারি না। আমি করতে চাই না। আমি কোনো চুক্তি করতে পারি না। আমাকে একা থাকতে দাও। আমি গুয়ান্তানামোতে চার বছর ছিলাম, প্রতিনিয়ত জিজ্ঞাসাবাদে। সেটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল না?"

তবু তারা চেষ্টা করল, কখনও হুমকি দিয়ে, কখনও উৎসাহ দিয়ে– "তোমার ভবিষ্যৎ আছে, ঘর আছে, সন্তান আছে।"

সত্যি বলতে কি, এটা গুয়ান্তানামোর চেয়েও কঠিন ছিল আমার জন্য। তারা আমার বিশ্বাস কেড়ে নিতে চাচ্ছিল। কিন্তু আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি, যিনি আমাকে তাদের ফাঁদ থেকে বাঁচার শক্তি দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত আমি স্পষ্ট ভাষায় বললাম, "এই আমার চূড়ান্ত কথা। আমি কখনও প্রস্তুত হব না। আমি তোমাদের অনুরোধ করি, আর কখনও আমার বাসায় আসবে না। যদি আমি স্বাধীন হই, যদি আমার দেশ সত্যিই স্বাধীন হয়, যেমনটা

তোমরা বলো, আর যদি আমার ঘরের ওপর আমার কর্তৃত্ব থাকে, তাহলে আমার অনুরোধ, আমাকে একা থাকতে দাও। আমি আর তোমাদের দেখতে চাই না।”

তারা রেগে গেল। “তুমি আমাদের ঘৃণা করো কেন?” তারা জিজ্ঞাসা করল।

“আমি তোমাদের পছন্দ করি না,” আমি বললাম। “তোমরা কী করছো, আর আমার ও অন্য মুসলমানদের সঙ্গে কী করেছো, সেটা দেখো। এরপরও তোমরা কী আশা করো?”

তারা ফোলা চোখে, রঙচঙে মুখে আমাকে তাকিয়ে দেখল।

“তুমি কি আবার গুয়ান্তানামোতে ফিরে যেতে চাও?” তারা বলল।

“তোমরা যা করো, সেটা তোমাদের ব্যাপার,” আমি উত্তর দিলাম। “তোমরা আমাকে চার বছর ধরে গুয়ান্তানামোতে আটকে রেখেছিলে, অথচ আমি কোনো অপরাধ করিনি। যদি আবার তাই করতে চাও, তো তোমাদের থামানোর কেউ নেই। কিন্তু যদি এটা স্বাধীনতার প্রশ্ন হয়, তাহলে আমার অধিকার আছে তোমাদের বলার—আমাকে একা থাকতে দাও। আর যদি এটা শক্তির প্রশ্ন হয়, তাহলে তোমরা যা খুশি করো, কারণ শক্তি তো তোমাদের হাতেই। কিন্তু আমি তোমাদের দেখতে চাই না। কাজেই আমাকে আবার জেলে ঢোকাও কিংবা ছেড়ে দাও, এটা তোমাদের ওপর নির্ভর করে।”

তারা চলে গেল।

আমি আল্লাহর কোটি কোটি শুকরিয়া আদায় করি, যে আমি আর কখনও তাদের দেখি নাই। যদিও তারপর থেকেই আমার অবস্থা আরও কঠিন হয়ে গেল, কারণ তারা আর আমার খরচ বহন করত না। তারা এক বছরের জন্য যে বাসার ভাড়া দিত, সেটাও বন্ধ করে দিল। তখন আমি অন্য বন্ধু ও মুসলিমদের কাছ থেকে সাহায্য পেলাম। সরকার আমার দরজার বাইরে নিরাপত্তা সংস্থার সেনা মোতায়েন করল।

আজও, দিনে ২৪ ঘণ্টা, সপ্তাহে ৭ দিন—আমার জীবন অনেক দিক থেকেই সীমাবদ্ধ। ভবিষ্যতে কী আছে, একমাত্র আল্লাহই জানেন।

NO WAR TO WIN

আফগানিস্তানের গল্প এবং আমার নিজের গল্প এখনো শেষ হয়নি। ২০০৬ সালের ১১ জুন গুয়ান্তানামো থেকে খবর এল যে তিনজন বন্দি শহীদ হয়েছেন।

এ ধরনের খবর শুনে হৃদয় ভেঙে যায়। প্রতিদিন আমি এখনও আমার সেই ভাইদের জন্য দোয়া করি, যাদের আমি পেছনে ফেলে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমি দোয়া করি, আল্লাহ যেন তাদের হেদায়েত দেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের রক্ষা করেন, এবং তাদের ও তাদের আত্মীয়দের ধৈর্য ও সহ্যশক্তি দান করেন।

এটাই প্রথমবার নয় যে কোনো মুসলিম ভাই কোনো আমেরিকান কারাগারে মারা গেলেন, কিন্তু এটা ছিল প্রথম ঘটনা যখন এমন কিছু গুয়ান্তানামোতেই ঘটল। তাদের মৃত্যুর পরিস্থিতি পরিষ্কার নয়, এবং তথ্যের একমাত্র উৎস হলো আমেরিকান সরকার বা গুয়ান্তানামোর সৈন্যরা। তারা দাবি করে, বন্দিরা আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু আমি–কমপক্ষে আমি–আমেরিকার মুখ থেকে আসা কোনো কথায় বিশ্বাস করতে পারি না। এটা আমি শিখেছি, যখন তাদের হাতে আমি ছিলাম চার বছরেরও বেশি সময় ধরে। গুয়ান্তানামোতে তারা আমাদের কাছে মিথ্যা বলত। তারা যা বলত, তার কিছুই বিশ্বাসযোগ্য ছিল না–এমনকি দিনের সময়টাও না।

তবুও, যদি ধরে নেই যে তাদের দাবি সত্য, যে মুসলিম বন্দিরা আত্মহত্যা করেছে, তবুও আমাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করা উচিত–কে দায়ী? ক্যাম্পের পরিবেশ এবং আমেরিকান সৈন্যদের আচরণই ছিল সেই কারণ, যার ফলে বন্দিরা–বহু বছর ধরে–তাদের সহ্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল, আশাহীনতায় ডুবে গিয়েছিল এবং ক্রমাগত হুমকির মুখে ছিল। সময় যেন ধীরে ধীরে তাদের আত্ম-মর্যাদা কেড়ে নিয়েছিল, তাদের মানসিকভাবে ভেঙে দিয়েছিল। আমি যে প্রতিটি বন্দিকে চিনতাম, সে-ই গুয়ান্তানামোতে মানসিক সমস্যায় ভুগছিল। ক্যাম্পের সিস্টেমটাই এমনভাবে কাজ করত, যাতে বন্দিরা একসময় তাদের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলত।

অনেক আইন, নিয়ম-কানুন, ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়া আছে–যেগুলো এই অবস্থার জন্য দায়ী। ক্যাম্পে কোনো আইনের শাসন নেই; বন্দিদের প্রতি আচরণ ও শাস্তি সম্পূর্ণ বেআইনি এবং মৌলিক মানবাধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করে; সৈন্যরা প্রায়ই ক্ষমতার অপব্যবহার করে এবং বন্দিদের উপর নির্যাতন চালায়। বছর পার হলেও বন্দিরা জানে না তাদের ভাগ্যে কী আছে–কখন তারা মুক্তি পাবে, আদৌ পাবে কিনা, কিংবা কোথায় স্থানান্তরিত করা হবে। বহু বন্দি বছরের পর বছর বাইরের জগতের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছাড়াই থাকে। পবিত্র কোরআন এবং ইসলাম ধর্মকে অপমান করা হয় এবং বন্দিদের অপমান ও শাস্তি দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। গুয়ান্তানামোতে কোনো তথ্য, বই কিংবা সময় কাটানোর কোনো মাধ্যম থাকে না। ঘুম না দিতে দেওয়াকে একটি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়–সপ্তাহ বা মাসজুড়ে–যার ফলে বহু বন্দি মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। প্রতিটি বন্দিকেই অপমানজনক আচরণের শিকার হতে হয়, যেমন অন্যদের সামনে নগ্ন করে ফেলা। জেরা করার সময় অনেক

সময় বন্দিদের জানানো হয় যে তাদের আত্মীয়দের গ্রেফতার করা হয়েছে–বাবা, ছেলে–অথবা তারা নিহত হয়েছে। অনেক বন্দি সঠিক চিকিৎসা পায় না, এবং পরিবার থেকে আসা চিঠিপত্র ভেঙে খোলা হয় বা বদলানো হয়।

এগুলো হলো সেই কিছু অভিজ্ঞতা, যা প্রতিটি বন্দিকে গুয়ান্তানামোতে সহ্য করতে হয়। এখানে সবকিছুই যেন মিথ্যা, কাউকে বিশ্বাস করা যায় না, আর কোনো কিছুর শেষ নেই। বন্দিরা জানেও না তারা কী বলবে বা কী করবে, যেন এই অবস্থার থেকে মুক্তি পায়। কোনো মানুষ এ ধরনের অবস্থা চিরকাল সহ্য করতে পারে না।

সুতরাং, আমেরিকানরা যদি সত্যিই প্রমাণ করতে পারে যে ওই বন্দিরা আত্মহত্যা করেছিল, তবুও এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে দায় আসলে তাদেরই। এ ক্যাম্প–গুয়ান্তানামো নিজেই–তাদের হত্যা করেছে। এই মৃত্যুর জন্য দায়ী বুশ প্রশাসন, যদিও হয়তো তারা নিজেদের হাতে আত্মহত্যা করেছে। আর আমেরিকান জনগণও এই ঘটনার জন্য দায়ী–তাদের সরকার ও নেতাদের আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আইন ভাঙার সুযোগ দেওয়ার জন্য, এমনকি বুশকে দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করার জন্যও।

*****

আফগানিস্তান হলো প্রতিটি আফগানের নিজভূমি–একটি পারিবারিক ঘর, যেখানে আমাদের সবার থাকার অধিকার রয়েছে। আমরা আমাদের দেশে বৈষম্য ছাড়া এবং আমাদের মূল্যবোধ রক্ষা করে বসবাসের অধিকার রাখি। কেউই আমাদের কাছ থেকে এ অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার অধিকার রাখে না। প্রতিটি আফগান নাগরিকেরই অধিকার আছে তার দেশের সেবা করার–সাংস্কৃতিক বিষয় হোক, জাতীয় নিরাপত্তা, আত্মরক্ষা, নিজস্ব কল্যাণ, ধর্মীয় ঐতিহ্য, অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিংবা সংস্কারমূলক মূল্যবোধ–যেকোনো ক্ষেত্রে। আফগানিস্তানের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ভিত্তি হলো জাতীয় ঐক্য, গোত্রীয় সমঝোতা এবং ধর্মীয় ঐতিহ্য, যা দেশের জনগণকে লালন করতে হবে। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের একটি স্বাধীন আফগানিস্তান গড়তে সাহায্য করেন!

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আফগানিস্তানের সম্মান এবং এর ইসলামী কাঠামো, জাতীয় ঐতিহ্যসহ রক্ষা করা। এ সমস্ত মূল্যবোধ আফগান জাতিকে রক্ষা করেছে, এদের জন্যই আফগানরা রক্ত দিয়েছেন, আর এ মূল্যবোধই তাদের সাহসিকতার উৎস হয়ে উঠেছে–আল্লাহর সাহায্যে তারা বিশ্বের সব বিদেশি আগ্রাসনকারী ও পরাশক্তিকে পরাজিত করেছে। আফগানিস্তান কখনো বন্দী ছিল না এবং হবে না; এটি সর্বদা একটি স্বাধীন দেশ ছিল তার ইতিহাস জুড়ে। আফগান জাতি সব সময় ঐক্যবদ্ধভাবে সব আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের ইতিহাসজুড়ে, প্রতিটি আগ্রাসনকারীই আফগান জাতির হাতে পরাজিত হয়েছে। নির্দিষ্ট করে বললে, বারবার দেশের মানুষ যে জাতীয় আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে, রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেছে ও লড়াই করেছে, তা-ই আফগানিস্তানকে রক্ষা করেছে–শুধু বাইরের সমস্যার হাত থেকে নয়, বরং অনেক সময় নিজের দেশের শাসকদের হাত থেকেও।

আফগান যুবসমাজ সব সমস্যার মোকাবেলায় নিজেদেরকে প্রস্তুত রেখেছে। প্রধান সমস্যা হলো বিশ্বাসের অভাব–বিশ্বাস এক অদৃশ্য শক্তি, আর বিশ্বাসের অভাবই আজ আফগানিস্তানের দুর্বলতার মূল কারণ। সব আফগানকে একত্র হতে হবে এবং একে অপরকে সাহায্য করতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই সব আফগান ইসলামকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে, এবং ইসলামের মাধ্যমেই বর্তমান সংকট ও ভবিষ্যতের দ্বন্দ্বগুলোর সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আজ যে রাজনৈতিক শূন্যতা আমাদের জাতিকে ঘিরে ধরেছে, তা পূরণ করতে হবে। ইসলামই আমাদের পথপ্রদর্শক হতে পারে।

সমস্যার একমাত্র সমাধান হলো ইসলামী মূল্যবোধকে সম্মান করা। অসংখ্য দরিদ্র আফগানকে হত্যা করা হয়েছে নানা উপায়ে–তাদেরকে অতর্কিতে হামলা করে মারা হয়েছে, অপহরণ করা হয়েছে, আটক রাখা হয়েছে; বিদেশিরা তাদের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে, তাদের স্ত্রী-সন্তানদের হত্যা বা আহত করেছে; তাদেরকে দেশছাড়া করা হয়েছে। এসব সমস্যার দিকগুলোকে সমাধানের আওতায় আনতেই হবে। যে কেউ এই সংকটের সমাধান চায়, তাকে অবশ্যই ঐক্যের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে এবং সমস্যার সব দিক বিবেচনায় রেখে সমাধান দিতে হবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনো আশার আলো খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন। এই অবস্থা আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকদের মানসিক ভারসাম্য বিঘ্নিত করেছে এবং বিদেশিদের স্বপ্নকেও ওলটপালট করে দিয়েছে। সবাই এখন ভাবছে এই অচলাবস্থার কোনো না কোনো সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। কেউ কেউ সত্যিই চেষ্টা করছে, কিন্তু অধিকাংশই কেবল নিজেদের স্বার্থেই কাজ করছে।

আমি আফগানিস্তানে ফেরার পর হামিদ কারজাইয়ের আমন্ত্রণে তিন বা চারবার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। আমরা মুখে-মুখে দ্বন্দ্ব করেছি, কিন্তু একসঙ্গে সমাধানের চেষ্টা করেছি। এটা এক রহস্য, এবং কে এই গিঁট খুলতে পারবে, তা বলা কঠিন। তবে একটি সত্য হলো–এই সমস্যার শিকার হলো আফগানরা এবং আফগানিস্তান। কখনো তারা এটা বোঝে, কখনো বোঝে না।

যদিও কারজাই শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিয়ে লাগাতার কথা বলেন, তিনি বাস্তবে তা প্রতিষ্ঠা থেকে অনেক দূরে। মিথ্যা প্রচারণা ও খালি প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে তিনি জনগণের কাছে নিজের অবস্থান ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন। আমি জানি না, তিনি এটা নিজে বোঝেন কিনা। তিনি এমন এক গোষ্ঠীর ঘেরাটোপে বন্দী, যারা তাকে সত্য থেকে দূরে রাখে, এবং তিনি যে তথ্য পান, তা দুর্বল এবং বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কহীন। কিন্তু তিনিই সেই দুর্বল তথ্যের উপর নির্ভর করেন, যার ফলে ভুল সিদ্ধান্ত নেন। কারজাইয়ের পাশে এমন তেমন কোনো বন্ধু নেই, যারা তাকে সহায়তা করতে পারে। কেউ নেই তার সুনাম ধরে রাখার জন্য, বা তার পথকে নিজের করে নেওয়ার জন্য। তার সঙ্গে নেই কেউ, যার সঙ্গে তিনি ভালো-মন্দ ভাগ করে নিতে পারেন। বিদেশি পৃষ্ঠপোষকদের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার ফলে তার অবস্থান শুরু থেকেই দুর্বল ছিল। তার খুব অল্প কিছু বিচক্ষণ পরামর্শদাতা আছেন, যারা তাকে আফগান সংস্কৃতির আলোকে সুস্পষ্ট ও কঠিন নির্দেশনা দিতে পারেন। তিনি নিজেকে এমন অবস্থানে আবিষ্কার করেছেন–যেখানে তিনি যেন বাঘ ও খাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন–প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে বুঝতে

পারেন না কোন দিকে যাবেন। শেষ পর্যন্ত, তিনি বন্ধু আর শত্রুর পার্থক্যও করতে পারেন না, কারণ তিনি ক্ষমতায় এসেছেন সঠিক পথে নয়–না ছিল কঠিন পথ পেরিয়ে ধাপে ধাপে আসা। যদি তিনি সে পথে আসতেন, তবে তিনি প্রকৃত ও বিশ্বস্ত বন্ধু পেতেন। কিন্তু যখন আপনি ক্ষমতায় থাকেন, তখন সবাই আপনার বন্ধু হয়– আর তখন প্রকৃত বন্ধুকে মিথ্যা বন্ধু থেকে আলাদা করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে।

আরও অনেক কারণ আছে, যেগুলো আফগানিস্তানের ভবিষ্যতের জন্য ভালো কোনো প্রভাব ফেলবে না।

আমি যখন দীর্ঘ সময় ধরে কারজাইয়ের সঙ্গে কথা বলি এবং তাকে পর্যবেক্ষণ করি, তখন আমি তাকে মোল্লা মোহাম্মদ ওমর আখুন্দের সঙ্গে তুলনা করতে শুরু করি। প্রথমত, মোল্লা সাহেব প্রত্যেক আগত অতিথিকে তাদের মনের কথা বলার যথেষ্ট সময় দিতেন। তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, ধৈর্য ধরতেন এবং রাগ দেখাতেন না। যে কেউ বলতে পারত, তিনি খুব গভীরভাবে ভাবছেন কথাগুলোর ওপর। কারজাই তার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি শুধু নিজেই কথা বলেন, এবং অতিথিকে বলার সময় খুব কম দেন। বাস্তবতা হলো, শোনার মাধ্যমেই আপনি কোনো বিষয় বুঝতে পারেন, আর যদি আপনি বেশি কথা বলেন, তাহলে হয়তো এমন কিছু বলেও ফেলতে পারেন, যা পরে আফসোসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয়ত, যদি আমীরুল মুমিনীন (মোল্লা মোহাম্মদ ওমর) কোনো কিছু প্রতিশ্রুতি দিতেন, তবে তিনি তা পালন করতেন। তৃতীয়ত, কারজাই নিজেকে জাহির করতে ভালোবাসেন এবং মনে করাতে চান যে তিনি অনেক কিছু জানেন, অথচ আমীরুল মুমিনীনের ক্ষেত্রে আপনি কখনো এমন কিছু অনুভব করতেন না। এমন অনেক দিক ছিল, যেখানে এই দুই ব্যক্তির মধ্যে মিল ও অমিল পাওয়া যায়।

কারজাই এখন একটা সমাধান খুঁজছেন, এবং এটা অনুভব করা যায় যে তিনি নিষ্ঠুর মানুষ নন। কাউকে হত্যা করা বা কারাগারে নিক্ষেপ করা তার স্বভাব নয়। কিন্তু তার অতিথিরা যে নিষ্ঠুরতা করেছে, তার দায়ভার তিনিই বহন করেন। তিনি চাইলে এসব কাজের নিন্দা করতে পারতেন, কিন্তু তিনি রাজনীতির জালে আটকে পড়েছেন। তিনি ক্ষমতাকে ভালোবাসেন এবং এই ক্ষমতার আসনেই থাকতে চান। একই সঙ্গে, তিনি শান্তিও চান।

কিন্তু যাঁরা তাকে এই ক্ষমতায় বসাতে সাহায্য করেছেন, তাঁরাও তার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। দুই বিপরীত শক্তির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন। আমি জানি না তিনি নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে কতটা সচেতন, তবে আমি বুঝতে পারি, এখন তিনি তার পদে এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। কিন্তু আফগানিস্তানের সমস্যাগুলো তার মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে–তিনি যেন প্রধান খেলোয়াড়দের হাতে একটি মাত্র দাবার ঘুঁটি।

তবে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, তার সময় একদিন শেষ হবে। আমি মনে করি, যখন আমেরিকান আগ্রাসন শুরু হলো, তারা কতটা আত্মতুষ্ট ছিল–তারা নিশ্চিত ছিল, কেউই আর কখনো তাদের বিরুদ্ধে হাত

তুলতে পারবে না। তারা গর্বভরে আমাকে বলেছিল, “আমরা আফগানিস্তানে দীর্ঘদিন থাকবো। তালেবান ও আল-কায়েদাকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করবো, এবং এখানে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করবো।”

আমি শুধু হাসলাম। বললাম, “এটা হতে পারে আপনার মতামত, কিন্তু আমি একমত নই।”

তারা তখন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলত, “তাহলে তোমার মতামত কী? কী ঘটবে বলে তুমি মনে করো?”

আমি তখন হাত বাড়িয়ে পাঁচ আঙুল ফাঁক করে বলতাম,
“এই হলো তোমাদের বর্তমান অবস্থা,” আমি বললাম। “কিন্তু তিন বছরের মধ্যে এটি এমন হবে।” আমি হাতের আঙুলগুলোকে ভাঁজ করে একটি নখর বা পাঞ্জার মতো করে দেখালাম। “যদি তোমরা পুরোপুরি বোকা না হও, তবে বোঝার কথা। না হলে, ছয় বছরের মধ্যে এমন হবে।” এবার আমি হাতটি মুষ্টিবদ্ধ করলাম। “এই পর্যায়ে গিয়ে যদি তোমরা বুদ্ধি না খাটাও, তাহলে দশ বছরের মধ্যে সবকিছুই তোমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। তখন তোমাদের জন্য লজ্জাজনক ব্যর্থতা আর আমাদের জন্য বিপর্যয় অপেক্ষা করবে।”

কিন্তু তারা আমার কথাকে শিশুসুলভ বলে উড়িয়ে দিল। তারা বলেছিল আমি কিছুই বুঝি না। কিন্তু আমি তাদের বললাম, “আমি একজন আফগান। আমি এটা জানি।”

*****

আফগানিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত–এ যেন একটি রাজনৈতিক খেলা, যেখানে সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় দেশগুলো এক অশুভ বন্ধনে একত্রিত হয়ে পড়েছে। অবস্থা এতটাই বিশৃঙ্খল যে সামনে-পেছনের পার্থক্য বোঝা যায় না। এই লোকগুলো কেন এখনও আফগানিস্তান থেকে বেরিয়ে যায় না? এই অবস্থাই তো সাময়িক। হয়তো তারা অচিরেই চলে যাবে, কিংবা আরও কিছুদিন থাকবে। কিন্তু একটি বিষয় পরিষ্কার: আফগানিস্তানকে অধিকারের ভিত্তিতে প্রতিরোধ করার অধিকার রয়েছে। আমাদের সম্মান রক্ষার অধিকার আছে। আমাদের রক্ত ঝরানো হয়েছে–আমরা তার প্রতিশোধ নেবার অধিকারও রাখি।

আফগানিস্তান ও আমেরিকার এখন ঘোরতর শত্রুতা– “সন্ত্রাসবাদী” শব্দের উদার ব্যবহারেও এটা ঢেকে রাখা যাচ্ছে না। কিন্তু ইউরোপ বড় ভুল করেছিল আমেরিকার পক্ষ নেওয়ার মাধ্যমে। সেই দেশগুলোও এখন আমেরিকার মতো একই তকমায় দাগ খাচ্ছে। তারা যেন একই পাজামার দুই পা পরার চেষ্টা করছে—এই দৃশ্য পুরনো স্মৃতি ফিরিয়ে আনে, আর এতে আমাদের সংকল্প আরও দৃঢ় হয়।

পৃথিবীকে কিছু নির্বাচিত মানুষ দিয়ে চালানো সম্ভব নয়–এটা যুক্তিসংগত নয়। প্রতিটি শতাব্দীতে আমরা দেখি রক্তক্ষয়ী বিপর্যয়ের নজির, যা বিপুল প্রাণ ও সম্পদের ধ্বংস ডেকে এনেছে।

এই সবই ঘটে যখন বিশ্বের দেশগুলো ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং পক্ষ নেয়। অবশ্যই এমন কিছু নিরপেক্ষ দেশ থাকা উচিত যারা বিরোধমান পক্ষগুলোর মধ্যে দাঁড়াতে পারে। এমন দেশ থাকা দরকার যাদের মধ্যস্থতায় আস্থা রাখা যায়। আজকের মতো নয়, যখন গোটা বিশ্ব এক পক্ষ হয়ে গেছে। যদি এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আনা যায়, তাহলে এর ফলাফল হবে ভয়াবহ। আমরা ইতিমধ্যেই আফগানিস্তান ও ইরাকে এই অবনতি দেখতে পাচ্ছি; অন্যান্য দেশেও সমস্যা ক্রমেই গভীরতর হচ্ছে। এই সকল দুঃখ-কষ্ট থেকে কে লাভবান হচ্ছে, কিংবা এটি ভবিষ্যতে কোথায় ছড়িয়ে পড়বে—বলা কঠিন।

আমেরিকা কেন এখনও রক্তপাত করে চলেছে? কেন তারা মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদের নামে বিল্ডিং ধ্বংস করার এই খেলা চালিয়ে যাচ্ছে? আর কত মানবাধিকার হারিয়ে যাবে আমেরিকার লোভী মুখে? এই দৈত্য কি শেষ পর্যন্ত নিজেকেই গ্রাস করবে? সে কি পুরো পৃথিবীকে ভক্ষণ করবে? সে কি নিরাপত্তা নিয়ে আসবে, নাকি শুরু করবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ? তার ঘোষিত লক্ষ্য কি আদৌ পূরণ হবে—অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদের নির্মূল? না কি বরং তা দ্বিগুণ বা তিনগুণ হয়ে যাবে?

তলোয়ারের উত্তর সালামের মাধ্যমে দেওয়া যায় না। আর রক্তকে পানি দিয়ে ধোয়া যায় না। তলোয়ারের জবাব তলোয়ার দিয়ে দিতে হয়, সালামের জবাব সালাম দিয়ে। কিন্তু এখন মনে হয় আমেরিকা কেবল নিজেকেই সহ্য করতে পারে, আর এটাই হয়তো তাদের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সহনশীলতা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় গুণ—এটাই পারে পৃথিবীকে একত্রিত করে একটি ঘরে পরিণত করতে। কিন্তু এটি অসম্ভব যে কেবল একজন মানুষের ইচ্ছা দিয়ে সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হবে—সে যত অর্থ বা ক্ষমতাই রাখুক না কেন।

এটা এখন বাস্তবতা যে, আমেরিকা তার শান্তিকামী ও মানবতাবাদী ভাবমূর্তি হারিয়ে ফেলেছে। গোটা বিশ্বে এখন আমেরিকাকে দেখা হয় স্বার্থপর, দায়িত্বজ্ঞানহীন ও নিষ্ঠুর হিসেবে। কোনো দেশ যদি স্বৈরাচারী হয়, আমেরিকা সেই দেশটির পাশেই দাঁড়ায়—তারা কাদের বিরুদ্ধে লড়ছে, সেটা তেমন কোনো বিষয়ই নয়।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি অর্থহীন। আফগানিস্তান এখন অতীতের ভুলের ভয়াবহ পরিণতির মুখোমুখি। বিগত কয়েক বছরের দ্রুত পরিবর্তন দেখলে বোঝা যায়, পৃথিবী এক বড় পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এটা শান্তিপূর্ণ হবে না রক্তাক্ত—তা আমরা জানি না। আমরা সবাই শান্তির জন্য প্রার্থনা করি, সেটাই কামনা করি। কিন্তু যদি আরও সহিংসতা আসে, তাহলে আমরা আফগানরাই আবারও তার শিকার হবো। আমাদের মাটি এবং আমাদের প্রতিবেশী দেশের মাটিই সবচেয়ে বেশি দুঃখ বহন করবে।

কিন্তু পৃথিবীর দিক-নির্দেশনা নিয়ে মন্তব্য করার আগে আমাদের নিশ্চিত করতে হবে, আমরা যেন কেবল স্রোতের টানে ভেসে না যাই বা পায়ের নিচে পিষ্ট না হই, পিঁপড়ের মতো। এই সংকটময় সময়ে নিজেদের অভ্যন্তরীণ মতভেদ নিয়ে আলোচনা করা অত্যন্ত বোকামি। তালেবান, গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার ও অন্যান্য প্রতিরোধ সংগঠনগুলোর উচিত এই বিষয়ে গভীরভাবে মনোযোগ দেওয়া। নর্দার্ন অ্যালায়েন্স এবং কারজাই প্রশাসনের সেই সব ব্যক্তিবর্গ, যারা এই দেশে দীর্ঘকাল বসবাস করতে চান, তাদেরও এ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা

উচিত। কিছু মানুষের মন পক্ষপাতের ঘোলাটে জলে ডুবে আছে, তারা নিজেদের স্বার্থে বিভাজন তৈরি করতে চায়। কিন্তু তারা জানা উচিত, আফগানিস্তানে প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর উন্নতি নির্ভর করে ঐক্যের ওপর। আত্মকেন্দ্রিকতা দিয়ে জাতীয় সম্মান রক্ষা করা যায় না।

আর একটি বিষয় হলো, বিদেশি বাহিনী যারা আফগানদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে–তাদের উচিত বাস্তবতা বোঝা। তারা বুঝে নেওয়া উচিত, আফগানিস্তানকে শক্তি দিয়ে দমন করা যায় না। এটা একটি সহনশীল, শ্রদ্ধাশীল ও জির্গাভিত্তিক সমাজ। ক্লাস্টার বোমা, বি-৫২, ক্রুজ মিসাইল, অবমাননা, আর মানুষকে জেলে ভরে রাখলে কেবল শত্রুতা বাড়ে। এই পথে কখনোই শান্তি আসতে পারে না। এর একমাত্র ফল হলো বিদ্বেষ ও ঘৃণার দেয়াল আরও পুরু হওয়া।

আমেরিকান তদন্তকারীরা আমাকে বলত, তালেবান যোদ্ধা কেবল হাজারখানেক। তারা বলত, এই লোকগুলোকে মেরে ফেললেই প্রতিরোধ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু গুয়ান্তানামো থেকে মুক্তি পাওয়ার পর আমি আমেরিকানদের ও তাদের আফগান মিত্রদের রিপোর্ট লক্ষ্য করছিলাম, যারা ২০০৬ সালের মধ্যে দাবি করেছিল যে তারা ২০০১ সাল থেকে ১২,৭০০ তালেবানকে শহীদ করেছে। কিন্তু প্রতিরোধ প্রতিদিন আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। এটা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, মানুষ হত্যা করে বা তাদের জেলে পাঠিয়ে শত্রু নির্মূল করা যায় না। বরং এতে আরও বেশি শত্রু জন্ম নেয়, আরও বেশি ঘৃণায় ভরা হৃদয় তৈরি হয়।

এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া কিছু দেশ কাদা থেকে পা বের করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তারা জানে না কীভাবে তা করতে হবে। অন্য কিছু দেশ বিকল্প কৌশল খুঁজছে পরাজয় ঠেকানোর জন্য, কিন্তু তারা জানেই না কিভাবে এগোতে হবে।

সবই ফাঁকা কথা। প্রতিটি দেশ তাদের নিজস্ব স্বার্থকে অন্যদের কাছে গোপন রেখে সবার ঊর্ধ্বে রাখে। তাদের প্রতিশ্রুতি ও কাজের মধ্যে কোনো সততা নেই। কেবল ভয়ই তাদের এক করেছে এক শয়তানী চুক্তিতে।

হয়তো ভবিষ্যতের ভয়ই তাদের চালিত করছে। এটা এক ধরনের "কাগুজে বাঘ" , যা সিআইএ ও এফবিআই-এর মস্তিষ্কপ্রসূত কল্পনা। আমি তাদের সঙ্গে একমত যারা বিকল্প কৌশলের খোঁজ করছে। কিন্তু তারা যেন মনে রাখে–এই বিকল্প কৌশলের কথা ভাবতে ভাবতেই তারা ইতিমধ্যে একটি পক্ষ বেছে নিয়েছে। তারা সেই পক্ষ নিয়েছে যারা হাজার হাজার আফগানকে হত্যা করেছে। তারা সেই পক্ষ নিয়েছে যারা হাজার হাজার পরিবারকে গৃহহীন করেছে, হাজার হাজার শিশুকে এতিম করেছে, এবং হাজার হাজার মুসলিম নারীকে বিধবা করেছে।

এটা আগ্রাসনের পর অষ্টম শীতকাল, কিন্তু এখনও নিষ্ঠুরতা ও অসম্মান চলছেই। হত্যা, জানাজা, রক্তপাত–এই ধারাবাহিকতা প্রতিদিন আরও তীব্র হচ্ছে। তাহলে তারা কোন কৌশল নিয়ে কাজ করছে? তাদের মস্তিষ্ক যেন খুলি ভেতরে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। আর তারা যাদের কথা শুনছে, তারা কী ধরনের ফাঁপা মস্তিষ্কের, আত্মকেন্দ্রিক আফগান?

ভালো হতো যদি এই দেশগুলো বিকল্প কৌশলের বিষয়টি আফগানদের ওপর ছেড়ে দিত। আমাদের ভবিষ্যত আমাদের নিজেদেরই নির্ধারণ করা উচিত। আমাদেরই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত, আপস করা উচিত, ও আমাদের ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা উচিত। এই দেশগুলো যেন সেই কল্পনা থেকে বেরিয়ে আসে যে, এসব কিছু একটি ফাঁপা রাষ্ট্রপতির একক এখতিয়ার–যে বিদেশি সুরে নাচে। দেশের আইনকে অবহেলা করা হচ্ছে, মন্ত্রীরা নিযুক্ত হচ্ছেন বিদেশিদের ইচ্ছেমতো। বিচার বিভাগ তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত ভুলে যাচ্ছে, বা আগের রায়কে লঙ্ঘন করে নতুন পদক্ষেপ নিচ্ছে। তারা যেন আফগানিস্তানে অর্থনৈতিক আধিপত্য কায়েম করতে না পারে, কিংবা আফগান সম্মানকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করতে না পারে।

তারা গভর্নর ও সংসদ সদস্যদের তাদের নিজস্ব ছাঁকনিতে ফেলে বাছাই করে। আর তাদের কাছে একজন আফগানকে হত্যা করা মানে যেন একটি পাখি মারার মতো ব্যাপার। যদি তারা কোনো আফগানকে হত্যা করে বা আহত করে, তাদের কেউ আদালতে নিতে পারে না; তাদের কোনো জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হয় না।

এই শয়তানসুলভ ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য ও একগুঁয়ে আমেরিকা মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিভেদ আরও বাড়িয়ে তুলবে। তারা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের এক পরিবেশ তৈরি করছে।

এই শয়তানী নীতি অনেক হয়েছে। আফগানদের উচিত এই "কাগুজে বাঘ" -এর ভয়কে ভুলে যাওয়া। তাদের উচিত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করা–এমনভাবে যাতে বিদেশি আগ্রাসীরা আর কোনো অজুহাত খুঁজে না পায়। এটা কি সম্ভব? হয়তো বলার সময় এখনও আসেনি। কিন্তু যদি বর্তমান পরিস্থিতি চলতে থাকে, বিশেষত যখন এই অশুভ জোট আফগান নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একত্র হয়েছে, তাহলে এর ফলাফল আফগানদের জন্যও ভালো হবে না, এবং তাদের প্রতিবেশীদের জন্যও না।

আফগানিস্তান টিকে থাকবে। আমেরিকা জন্ম নেওয়ার অনেক আগেই আফগানিস্তান ছিল, এবং আমেরিকানরা চলে যাওয়ার অনেক পরেও আফগানিস্তান থাকবে। আজ আমাদের জাতি একটি জালে আটকে আছে–যেটা বোনা হয়েছে আমাদের প্রতিবেশী ও বিদেশিদের দ্বারা, কিছু আফগানের সহযোগিতায়। কিন্তু সেই সময় আসবে, যখন আফগান জনগণ নিজের কণ্ঠ ফিরে পাবে এবং আবারও নিজেদের গতিতে ও নিজের পথে এগিয়ে যাবে।

....

....

....

EPILOGUE

AFGHANISTAN TODAY

আফগানিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোন দিকে অগ্রসর হচ্ছে তা এখনও অস্পষ্ট। সাধারণ ধারণা হলো, এটি একটি বৃহত্তর আঞ্চলিক সংকটের অংশ, যা প্রতিদিন আরও জটিল হয়ে উঠছে শক্তির ভারসাম্যহীনতা, সন্দেহের আবহ এবং রাজনৈতিক অবিশ্বাসের কারণে।

আফগানিস্তান আবারও এমন একটি অঙ্গনে পরিণত হয়েছে, যেখানে বিশ্ব শক্তিগুলো পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত। দেশের রাজনৈতিক ও সামরিক শূন্যতা এই দেশকে এক ধরনের সুপার পাওয়ার গবেষণাগারে রূপান্তর করেছে, যেখানে প্রভাব বিস্তার এবং জোট গঠনের পরীক্ষা চলছে।

জর্জ বুশের বিদায় এবং বারাক ওবামার আগমন কিছু আফগানদের মধ্যে আশার সঞ্চার করেছিল, কিন্তু আঞ্চলিক পর্যায়ে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠছে। আমেরিকা আর সেই অবস্থানে নেই যা ২০০১ সালে ছিল, যখন তারা প্রতিশোধের অস্পষ্ট ধারণাকে ভিত্তি করে আফগানিস্তান আক্রমণ করেছিল। এটি আর সেই ২০০৩ সালের অবস্থানে নেই, যখন তারা ইরাক আক্রমণ করেছিল তথাকথিত গণবিধ্বংসী অস্ত্রের অজুহাতে, যার উদ্দেশ্য ছিল দেশটির তেলের সম্পদ দখল।

আজ বিশ্বজুড়ে আমেরিকা একটি আইন ভঙ্গকারী, মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী এবং ঘৃণার উস্কানিদাতা রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত। এমনকি এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে, কিছু আমেরিকান নাগরিক নির্দিষ্ট কিছু দেশে নিজের দেশের পাসপোর্ট দেখাতে লজ্জাবোধ বা ভয় পায়।

অর্থনৈতিকভাবে, আমেরিকা সংকটে রয়েছে: বেকারত্ব প্রতিদিন বাড়ছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং একের পর এক বড় বড় কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে। এখন আমেরিকা রাশিয়া অথবা সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্য এশীয় প্রজাতন্ত্রগুলোর মধ্য দিয়ে বিকল্প সরবরাহ পথ খুঁজছে, আর এই প্রক্রিয়ায় পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের প্রধান সমস্যা ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছে।

পারভেজ মুশাররফের অধীনে পাকিস্তান আমেরিকার জন্য একটি ভালো মিত্র ছিল। তারা মুসলিমদের দমন করেছিল, তাদের মাটি ব্যবহার করতে দিয়েছিল আরেকটি মুসলিম দেশের ধ্বংসের জন্য, নিরীহ আফগান বেসামরিক নাগরিকদের হত্যায় সহায়তা করেছিল, পাকিস্তানের ভেতরে ইসলামী দলগুলোকে দমন করেছিল এবং সরকারের সঙ্গে জনগণের মাঝে ঘৃণার বীজ বপন করেছিল।

এখন মনে হচ্ছে, আমেরিকান 'টাকাওয়ালা গাভীর' দুধ শেষ হয়ে আসছে।

আরব বিশ্বও এখন আমেরিকা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, তাদের মুসলিম-বিরোধী মনোভাবের কারণে। এর বহু কারণ রয়েছে, কিন্তু আমেরিকা যে ইসরাইলকে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে, সেটিই এখানে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আরব নেতারা এই বিষয়টি এড়িয়ে যেতে পারে না।

এছাড়া জর্জিয়া, ইউক্রেন এবং চেক প্রজাতন্ত্রে আমেরিকান প্রতিরক্ষা স্থাপনাগুলোর গুরুত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান শক্তি, চীনের নাটকীয় অগ্রগতি এবং ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের প্রস্তুতি আমেরিকার ক্ষমতাকে আরও চ্যালেঞ্জ করছে।

এই সব চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও, প্রেসিডেন্ট ওবামার রাজনৈতিক কৌশল এখনো এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে যে আমেরিকাই একমাত্র বিশ্ব নেতা। এটি নিজেই একটি বিভ্রান্তিকর সমস্যা এবং নিরাময়যোগ্য নয় এমন এক ধরনের রোগ।

আমেরিকা এখন আফগানিস্তানের জন্য একটি নতুন কৌশল তৈরি করছে এবং হামিদ কারজাইকে সরিয়ে অন্য একজন প্রেসিডেন্টকে বসানোর পরিকল্পনা করছে। এভাবে তারা আফগানদের দেখাতে চায় যে, কীভাবে আমেরিকা তাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে আর আরেকজন হাতের পুতুলকে ক্ষমতায় বসাচ্ছে। এই দিক থেকে ওবামা বুশের চেয়েও বিপজ্জনক হতে পারেন। তিনি হয়তো পরিবর্তন ও শান্তি আনতে চান, কিন্তু গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর চাপ তাকে প্রভাবিত করবে।

অনেক ইঙ্গিত রয়েছে যে আমেরিকানরা আফগানিস্তানে দীর্ঘ সময় থাকার পরিকল্পনা করছে। তারা তাদের ব্যর্থতা ঢাকতে এবং নিজেদের ভাবমূর্তি উন্নত করতে চায়। তারা ইরাক ছেড়ে দিচ্ছে কারণ আরব বিশ্বে প্রতিরোধ বাড়ছে। অর্থনৈতিকভাবে আরব দেশগুলো আমেরিকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমেরিকা চায় না তারা আরবদের দ্বারা পরাজিত হোক, এবং তারা চায় না যে আরব বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক আরও খারাপ হোক। তবে আফগানিস্তান আমেরিকার জন্য তুলনামূলকভাবে সহজ। তারা এমন একটি জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে লড়াই করছে যাদের বিশ্বব্যাপী ব্যাপক প্রভাব বা ভিত্তি নেই। তারা লড়াই চালিয়ে যেতে পারছে এবং বেসামরিক প্রাণহানি বা আফগান জনগণের দুর্ভোগ উপেক্ষা করতেও পারছে, কারণ এতে বিশ্বজুড়ে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে না।

এই অবস্থাটা একেবারেই ভিন্ন হতো যদি তারা ফিলিস্তিনে বা ইরাকে লড়াই চালিয়ে যেত।

আফগান জনগণের সঙ্গে বিদেশি দখলদারদের দূরত্ব দিন দিন বাড়ছে এবং সমস্যাগুলো ক্রমাগত খারাপ থেকে আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। নিপীড়িত আফগানদের ধৈর্য অসাধারণ; দুর্ভাগ্যবশত বিশ্ববাসীরও তাদের দুর্ভোগের প্রতি ধৈর্য আছে–তাদের রক্তপাত নিয়ে যেন কারও কিছু যায় আসে না।

আফগানিস্তান হলো পৃথিবীর সবচেয়ে নিপীড়িত দেশ। আফগানরা নীরবেই প্রতিশোধ নেয়, প্রয়োজনে নিজেদের আত্মত্যাগ করেও। কোনো আফগান, বিশেষ করে কোনো পশতুন, এটা বিশ্বাস করে না যে আমেরিকা কিছু করছে মানুষের কল্যাণে; বরং তারা মনে করে, আমেরিকার কাজই হচ্ছে মানুষ হত্যা করা এবং ঘৃণা ছড়ানো। এই আক্রমণের মূল লক্ষ্যই ছিল আফগানিস্তানকে দুর্বল করে ফেলা; এমনকি যারা প্রথমে আমেরিকার সুরে নাচছিল, তারাও এখন এটা উপলব্ধি করতে শুরু করেছে।

আফগানিস্তানের নিরাপত্তা পরিস্থিতি প্রতিদিন খারাপ হচ্ছে। বিদেশি দখলদার এবং আফগান কর্তৃপক্ষ আগের চেয়েও কম নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। গ্রামাঞ্চল ও জেলা পর্যায়ে সাধারণ মানুষের জীবন হয়ে উঠছে আরও কঠিন, বিশেষ করে ব্যবসায়ী ও গবাদিপশু বা সম্পদের মালিকদের জন্য। মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে এবং তাদের বিনিয়োগ দেশ থেকে সরিয়ে নিচ্ছে।

নিরাপত্তা ও অর্থনীতির মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। নিরাপত্তা পরিস্থিতি যত খারাপ হয়, অর্থনীতি এবং রাজনীতি তত খারাপের দিকে যায়। এখন ওবামা ভাবছেন, আরও ত্রিশ হাজার সৈন্য পাঠানো উচিত এবং অন্য দেশগুলোকে অনুরোধ করছেন তাদের সেনাও বাড়াতে। তারা মনে করেন, এতে নিরাপত্তা বাড়বে। তারা জানে না, আরও সৈন্য মানে আরও রক্তপাত। উপরন্তু, এতে প্রতিবেশীদের সঙ্গে আরও উত্তেজনা বাড়বে। সৈন্য যত বেশি হবে, তাদের সরিয়ে নেওয়া ততই কঠিন হয়ে পড়বে।

ওবামার নতুন কৌশল হয়তো আফগানিস্তানের সমস্যাকে এমন একটি আঞ্চলিক সমস্যায় পরিণত করবে, যার পরিণতি বর্তমান পরিস্থিতির চেয়েও ভয়াবহ।

আমার মতে, সমাধান হলো–আমেরিকার উচিত, তাদের আগের প্রেসিডেন্ট বুশের তৈরি যুদ্ধনীতিকে পুনর্বিবেচনা করা এবং এই সংঘাতের অবসান ঘটানো। যুদ্ধের বদলে তাদের শান্তির জন্য কাজ শুরু করা উচিত। কেবল একটি বড় ধরনের কৌশলগত পরিবর্তনই আফগানিস্তান এবং আমেরিকা উভয়ের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে।

সম্পূর্ণ দক্ষিণাঞ্চল–কান্দাহার, হেলমান্দ, জাবুল, উরুজগান, ফারাহ এবং নিমরোজ–অর্থনৈতিক এবং নিরাপত্তার দিক থেকে একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত। একটি প্রদেশ অন্য প্রদেশকে সরাসরি প্রভাবিত করতে পারে, বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিম, দক্ষিণ-পূর্ব ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলে। তবে দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোর রাজনৈতিক প্রভাব উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলেও পড়ে, এমনকি পাকিস্তানের অভ্যন্তরে অবস্থিত উপজাতীয় এলাকাগুলোর ওপরও।

তবে কিছু লোক আছেন যারা শুধু পশতুন ও দক্ষিণাঞ্চলের মানুষদের দমন করতে চান। তারা এটা সরাসরি করেন, অথবা বিদেশিদের উস্কে দিয়ে করেন। তারা জানেন, একজন আফগানকে নিপীড়ন মানে নিজেদেরই নিপীড়ন করা, তবুও টাকার লোভে তারা এটা করে।

২০০৭ সালে দক্ষিণাঞ্চলের প্রদেশগুলোতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং নিরাপত্তা পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত জটিল। বহু বিদেশি ও আরও বেশি আফগান নিহত হয়েছেন। দক্ষিণাঞ্চলের অনেক গ্রামীণ এলাকায় বিদেশি বাহিনী ও সাধারণ মানুষের সম্পর্ক ঘৃণা থেকে শত্রুতায় রূপ নিয়েছে। আপনি যদি রাস্তায় গিয়ে প্রতিটি আফগানকে জিজ্ঞেস করেন, আমেরিকানরা মানুষদের সঙ্গে কেমন আচরণ করছে, তাহলে ৯৫ শতাংশ বলবে–তারা আফগান জনগণের শত্রু। যারা ভিন্নভাবে উত্তর দেবে, তারা হলো আমেরিকানদের হয়ে কাজ করা লোকেরা–কিন্তু তাদের প্রতি ঘৃণা আমেরিকানদের চেয়েও বেশি।

ব্রিটিশদের ব্যাপারে তো সবাই একমত যে তারা এসেছে তাদের পিতা ও পিতামহদের প্রতিশোধ নিতে।

প্রায়ই ভুলে যাওয়া হয় যে ভোগান্তি পোহাচ্ছে আফগান জনগণই; কৃষক ও দোকানদাররাই ভোগ করছে ভুল নীতির খেসারত। আমাদের পুরুষ ও নারী, বন্ধু ও ভাইদের জীবন ও স্বাধীনতা হারাচ্ছে, আর দেশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তথাকথিত পুনর্গঠনের নামে।

আমাদের হাত-পা কেন বাঁধা? বিদেশিদের আমাদের থেকে কী চাওয়া?

বুশ প্রশাসনের অধীনে সবাই পরাজিত হয়েছে। কেবল আফগান ও আমেরিকানদের শত্রুরাই উপকৃত হয়েছে। কিন্তু আপনি হয়তো বলবেন–প্রেসিডেন্ট ওবামা কি আলাদা? খুব সহজেই দেখা যাচ্ছে, আফগানদের রক্তে তার হাতও রঞ্জিত হবে। তিনি ইতোমধ্যেই আরও সৈন্য পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছেন।

ওবামা বিপুল ব্যবধানে নির্বাচিত হয়েছেন, কিন্তু তার প্রচারণার স্লোগান 'পরিবর্তন–যেটাতে আমরা বিশ্বাস করতে পারি' ছিল অস্পষ্ট ও অনির্ধারিত। ওবামা নিজেও একজন সংখ্যালঘু থেকে এসেছেন–যারা একসময় দাস ছিল–যাদের শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমেরিকায় অধিকার বঞ্চিত করা হয়েছে। এই সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে অবহেলিত ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, ওবামা বুশের চেয়েও বেশি প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হতে পারেন।

আমরা এর সূচনা দেখতে পাচ্ছি–আফগানিস্তানে মার্কিন সেনা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে এবং অন্যান্য দেশকে হুমকি দেওয়ার মাধ্যমে।

যদি ওবামা সত্যিই আমেরিকাকে পতন থেকে রক্ষা করতে চান, যদি তিনি ইসলামি বিশ্ব এবং মুসলমানদের প্রতি বৈরিতার অবসান ঘটাতে চান, তাহলে তার আরও সতর্ক হওয়া উচিত।

আমরা সবাই জানি, আফগানিস্তানে সৈন্য বাড়ানোর পরিকল্পনা ওবামার নিজের ছিল না—এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তিনি নির্বাচিত হওয়ার আগেই।

জ্যেষ্ঠ আমেরিকান উপদেষ্টারা বলেন, সৈন্য সংখ্যা বাড়ালে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসবে।

আমেরিকার উচিত আফগানিস্তানের ইতিহাসের দিকে তাকানো—আমরা বহুবার আগ্রাসনের শিকার হয়েছি। তাদের পূর্বসূরীরা কত সৈন্য নিয়ে এসেছিল? এবং তারা কেন ব্যর্থ হয়েছিল? তাদের উচিত ইরাকের উদাহরণ দেখা। সেখানে ৩ লক্ষ মার্কিন সৈন্যের উপস্থিতিতে ১০ লাখ মানুষের প্রাণ হারিয়েছে, এবং হত্যা আজও অব্যাহত রয়েছে।

আমেরিকানদের জানা উচিত, এখন আর তাদের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জাতি হিসেবে কেউ দেখে না। তারা পুরো পৃথিবীতে ঘৃণার বীজ বপন করেছে। 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ' নাম দিয়ে তারা একটি নতুন যুদ্ধ শুরু করেছে, অথচ 'সন্ত্রাসী' শব্দটিও তারা নিজেরাই সৃষ্টি করেছে। যতদিন না আমেরিকা তার ভুল স্বীকার করে সংশোধনের উদ্যোগ নেয়, ততদিন তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ থামবে না।

সতর্ক হোন, আপনারা আফগানিস্তানের জন্য প্রস্তুত নন!

হ্যাঁ, এখানে ক্ষুধা আছে, দারিদ্র্য আছে; আমাদের দেশ ধ্বংস হয়ে গেছে, অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে। কিন্তু এসবই মূল বিষয় নয়। আফগানিস্তানে আমাদের আদর্শ বিক্রির পণ্য নয়। এখানে সহজ কোনো সমাধান নেই। আর আমেরিকা কখনোই উপজাতি মিলিশিয়া বা 'আর্বাকাই' -এর মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইকে দাঁড় করালে কেবল আরও সংঘাত বাড়বে। এইসব মিলিশিয়া সেনাবাহিনী বা পুলিশের আওতার বাইরে একটি অনিয়ন্ত্রিত শক্তিতে পরিণত হবে। আমেরিকা একটি ঘুমন্ত দানবকে জাগিয়ে তুলবে। এইসব অতীতে ঘটেছে, আমরা দেখেছি, এবং এখনও এর প্রভাব দেখতে পাচ্ছি।

কিছু আমেরিকান এবং পশ্চিমাপন্থী আফগান মনে করেন, আমেরিকার উচিত প্রথমে তাদের সামরিক ও রাজনৈতিক অবস্থান শক্তিশালী করা, তারপর শান্তি আলোচনার পথ প্রশস্ত করা। হয়তো এই কারণেই সৈন্য বাড়ানো হচ্ছে। এটা ইরাকে তাদের পক্ষে কাজ করেছে, কিন্তু আফগানিস্তান ইরাক নয়, পশ্চিম তো নয়ই। আফগানরা কখনো পিছু হটে না। তারা যদি দুর্বল অবস্থায় থাকে, তখন তারা তাদের অধিকার ফিরে পেতে এবং প্রতিশোধ নিতে সচেষ্ট থাকে। এখন আমেরিকা শক্তিশালী অবস্থানে আছে; এই অবস্থানে যদি তারা শক্তি বাড়াতে থাকে, তবে আরও বেশি মানুষ লড়াইয়ে যোগ দেবে।

আমেরিকা আফগানিস্তান আক্রমণ করেছে, দেশের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করেছে, হাজার হাজার মানুষকে কারাবন্দী করেছে, নির্যাতন ও অপমান করেছে এবং লক্ষ লক্ষ আফগান নাগরিককে হত্যা করেছে।

ওবামা এবং আমেরিকার উচিত এই ঘটনার জন্য ক্ষমা চাওয়া, সহিংসতা জারি রাখা নয়। তাদের প্রকৃত শান্তি অর্জনের পথ খুঁজতে হবে। এটা সবার জন্য জরুরি। আমরা সবাই শান্তির কথা বলি, কিন্তু পদ্ধতিগুলো ভিন্ন। হতে পারে আমেরিকাও শান্তি চায়, কিন্তু তা তারা চায় নিজেদের শর্তে। এটা শান্তি নয়; এটা শান্তির নামে যুদ্ধ। আমেরিকার উচিত আফগানিস্তানকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং বুঝে নেওয়া যে তারা এখানে কী অধিকার রাখে। কেবলমাত্র যদি আমেরিকাকে জনসম্মুখে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং যদি একটি স্বাধীন আফগান সরকার তাদের সেসব অধিকার দেয়, তাহলেই আফগান জনগণ তাদের উপস্থিতি মেনে নেবে।

এই মুহূর্তে আমেরিকার লক্ষ্য কী তা স্পষ্ট নয়।

তারা কী চায়? তারা আর কতদিন মানুষ হত্যা করবে এবং এই হত্যাকে "সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ" বলবে?

আমেরিকানরা যখন প্রথম আফগানিস্তানে এসেছিল, তখন তারা ছিল অল্প কয়েকজন। তারপর সংখ্যাটা হলো ৬ হাজার, পরে ১৮ হাজার, তারপর ৩০ হাজার। এখন দেখা যাচ্ছে সেই সংখ্যা ৬৪ হাজারে পৌঁছেছে। হতে পারে আগামী বছর তা ১ লাখ হবে। এর মানে কী?

কে তাদের নিয়ন্ত্রণ করবে? তখন কে বলতে পারবে যে আফগানিস্তান এখনও স্বাধীন?

আমরা এখনও সেনা প্রত্যাহারের জন্য কোনো সময়সূচির কাছাকাছিও পৌঁছাইনি।

যদি আমেরিকানরা বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে জেদ করে চলতে থাকে, তাহলে তারা আফগানিস্তানে নিজেদের ঘাঁটি আরও শক্ত করবে, আরও বিমানঘাঁটি ও অস্ত্রাগার নির্মাণ করবে এবং দীর্ঘ বছরের জন্য মজুদ গড়ে তুলবে। তারা আফগানদের দুর্দশার সুযোগ নিয়ে তাদের কিনে নেবে—আর সেই অর্থ ব্যবহার করা হবে আবার আফগানদের বিরুদ্ধেই।

আফগানদের এক হতে হবে।

তাদের উচিত নয় নিজেদের এবং নিজেদের সন্তানদের আমেরিকানদের হাতে তুলে দেওয়া, যাতে তারা অন্য আফগানদের হত্যা করে এবং নিজেরাও নিহত হয়। তাদের অপেক্ষা করতে হবে এবং বুঝে নিতে হবে কী ঘটছে।

আফগানদের বুঝতে হবে, তাদের মৃত্যু কেবল তাদের নিজেদের ক্ষতি; কেউ তাদের জন্য চোখের জল ফেলবে না—বরং কেউ কেউ হয়তো তাদের মৃত্যুর আনন্দও করবে।

Pakistani Jails

আমেরিকার অমানবিক কারাগারগুলো সারা বিশ্বের মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সমালোচনা ও আপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই জেলগুলো মুসলমানদের ওপর অবৈধ নির্যাতনের জন্য কুখ্যাত। কিন্তু এগুলো এই পৃথিবীর বাস্তবতা। তারা মানুষকে নির্যাতন করে, তাদের মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করে, অন্যায় করে চলেছে। তারা আন্তর্জাতিক আইন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব আইন এবং ১৯৪৬ সালের জেনেভা কনভেনশন লঙ্ঘন করেছে। এই ঘটনা ঘটেছে এবং এখনও ঘটছে—আফগানিস্তান, ইরাক, গুয়ান্তানামো এবং বিশ্বের অজানা বহু স্থানে।

কিন্তু এমন কিছু দেশ আছে যারা আমেরিকার চেয়েও খারাপ কাজ করছে, তবুও কারও নজরে আসছে না।

মিশর, জর্ডান এবং পাকিস্তানের মতো দেশগুলো, যেগুলো যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট, এমন সব কাজ করছে যা কোনো আইনেই—ইসলামি হোক বা অন্য যেকোনো—ন্যায়সঙ্গত নয়।

পাকিস্তানের দিকে তাকান, আমাদের প্রতিবেশী। তারা আফগানদের সাথে কেমন আচরণ করে?

এশিয়ার রাজনৈতিক খেলায় পাকিস্তান একটি মুখ্য ভূমিকায় রয়েছে। তারা এতটাই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য পরিচিত যে বলা হয়, তারা ষাঁড়ের দুধও বের করতে পারে। তাদের এক মুখে দুই জিভ, এক মাথায় দুই মুখ—সবাইকে খুশি রাখার জন্য, সবাইকে ঠকানোর জন্য। তারা আরবদের ঠকায় নিজেদের "ইসলামী পরমাণু শক্তি" হিসেবে দাবি করে, বলছে তারা ইসলাম এবং মুসলিম দেশগুলো রক্ষা করছে। আবার আমেরিকা ও ইউরোপের কাছ

থেকে সন্ত্রাসবিরোধী জোটের নামে সুবিধা নেয়। তারা পাকিস্তানিসহ বিশ্বের অন্যান্য মুসলিমদেরও কাশ্মীরি জিহাদের নামে ধোঁকা দিয়েছে। কিন্তু পর্দার আড়ালে তারা সবার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

তাদের ইসলাম ও জিহাদের অর্থ হলো—অবিশ্বাসীদের সঙ্গে মিলে পাশের একটি মুসলিম রাষ্ট্রকে ধ্বংস করা। তারা নিজেদের বিমানঘাঁটি আমেরিকানদের হাতে তুলে দিয়েছে যেন তারা মুসলিমদের হত্যা করতে পারে এবং একটি ইসলামী দেশকে ধ্বংস করতে পারে। আরবদের প্রতি তাদের আনুগত্য এতটাই যে, তারা কূটনীতিক, সাংবাদিক এবং মুজাহিদিনদের টাকার বিনিময়ে বিক্রি করেছে—পশুর মতো। আল্লাহই ভালো জানেন, তারা কখনো মুসলিমদের রক্ষা করার জন্য তাদের পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করবে কি না। বরং আশঙ্কা আছে, তারা সেই অস্ত্র—অন্যান্য সবকিছুর মতো—মুসলিমদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করবে।

আফগানরা আজ সারা বিশ্বে কারাবন্দী।

প্রতিদিন নতুন নতুন অজুহাতে আমাদের ওপর নির্যাতন ও বন্দিত্ব চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আফগানিস্তান, ইরান, গুয়ান্তানামো এবং আমেরিকান কারাগারগুলোর নির্যাতনের খবর আমরা জানি, কিন্তু পাকিস্তানে আমাদের অবস্থা নিয়ে কেউ খুব একটা জানে না।

পাকিস্তান নতুন নতুন মিথ্যা অভিযোগ তৈরি করে—রাজনৈতিক বা অপরাধমূলক—আর আফগানদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে।

অপরাধমূলক মামলায় আটকরা সাধারণত রাজনৈতিক বন্দিদের তুলনায় সহজে পার পায়। অপরাধমূলক অভিযোগে অভিযুক্তরা অন্তত বিচার পায়, ঘুষ দিয়ে ছাড়া পেয়ে যায়। এমনকি তারা কারাগারে কিছুটা হলেও স্বাধীনতা পায়, যা রাজনৈতিক বন্দিদের ভাগ্যে জোটে না।

পাকিস্তানি কারাগারে অপরাধীরা ঘুষের বিনিময়ে স্বজনদের সাথে দেখা করতে পারে, যদিও অনেক সময় তারা বছরের পর বছর মামলা ছাড়াই বন্দি থাকে; তাদের আইনজীবী নিয়োগের অধিকার দেওয়া হয় না; জোর করে স্বীকারোক্তি নেওয়া হয়; আর তাদের কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়।

কিন্তু রাজনৈতিক বন্দিদের জীবন আরও ভয়াবহ, বিশেষ করে এখনকার 'সন্ত্রাসবাদ' নামের বিশ্বাসঘাতক খেলায়।

এই মরণখেলার প্রধান শিকার আফগানরাই। আফগান বন্দিদের অবস্থা পাকিস্তানিদের চেয়ে অনেক ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ, পাকিস্তানি বন্দিরা সহজে যোগাযোগ করতে পারে। এমনকি রাজনীতিবিদরা তাদের জন্য সাহায্যও করতে পারে। কিন্তু আফগানদের পাকিস্তানি পুলিশ দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে দেখে। একবার তারা আফগানদের ধরে ফেললে, যা ইচ্ছা তাই করে।

বেশিরভাগ রাজনৈতিক বন্দিকে ধরে রাখে আইএসআই।

তাদেরকে একা করে রাখা হয়; তাদের অবস্থানের জায়গাগুলোতে কোনো আইন চলে না।

অনেক আফগান রয়েছেন যারা গত পাঁচ বা ছয় বছর ধরে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থার গোপন কারাগারে বন্দি অবস্থায় আছেন। আরও অনেকে রয়েছেন যারা দুই বা তিন বছর ধরে কারাবন্দি, তাদের ভবিষ্যৎ অজানা, আশাও নেই। তাদের আত্মীয়স্বজন জানেন না তারা কোথায়, কী অভিযোগে তাদের ধরা হয়েছে বা তাদের কী পরিণতি হবে। তারা এটা পর্যন্ত জানতে পারেন না যে তাদের ছেলে, ভাই বা বাবা বেঁচে আছেন কি না, অসুস্থ না সুস্থ, কোথায় আছেন। তারা বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে একেবারেই বিচ্ছিন্ন—না রেড ক্রস, না চিঠি, না ফোন, না ভিডিও—কোনো যোগাযোগ নেই।

তারা যেন মৃত মানুষের মতো বন্দি সেলে বসে কেয়ামতের দিনের অপেক্ষা করছেন।

আল্লাহ যেন এই বন্দিদের পাকিস্তানি জেল থেকে মুক্ত করেন। আত্মীয়দের জন্য জীবন কঠিন, কিন্তু বন্দিদের জন্য তা আরও করুণ। তাদের কারাগারে সময় কাটে নিদারুণ দুর্ভোগে। তাদের সব সম্মান কেড়ে নেওয়া হয়। যখন পাকিস্তানি আইএসআই কাউকে গ্রেপ্তার করতে যায়, তারা পুরো বাড়ি তছনছ করে দেয়, ঠিক যেমন আমেরিকানরা আফগানিস্তানে করে। পরিবারের অন্য সদস্যদের তারা বেঁধে ফেলে এবং মাথায় কালো বস্তা পরিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে তারা পরিবারের অন্য সদস্যদেরও ধরে নিয়ে যায়, এমনকি অতিথিরাও রেহাই পায় না। তারা বন্দিদের গালি দিতে দিতে নির্যাতন কেন্দ্রে নিয়ে যায়। তারা বন্দিদের অমানবিক ও ইসলামবিরোধী আচরণে অত্যাচার করে।

জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাদের নির্যাতন করা হয় এবং প্রায়ই ঘুম থেকে বঞ্চিত করা হয়। তারা দিনে মাত্র একবার টয়লেট ব্যবহার করতে পারে। পরস্পরের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি নেই। শুধু অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারে। কেউ কথা বললে কঠোর শাস্তি পেতে হয়।

একজন বন্দি তার অভিজ্ঞতা জানিয়েছিলেন: "যখন পাকিস্তানি গোয়েন্দারা আমাকে গ্রেপ্তার করল," তিনি বলেন, "তারা আমাকে এক ভয়ঙ্কর জায়গায় নিয়ে গেল। এটি ছিল একটি ছোট, সংকীর্ণ ঘর; ছাদ, মেঝে, দেয়াল, দরজা–সবকিছুই কালো রঙে রঙ করা ছিল। রাত-দিনের তফাৎ বোঝা যেত না। কেবলমাত্র যখন তারা আমাদের জেরা কক্ষে নিয়ে যেত, তখন একটা ছোট বাতি জ্বালানো হতো।

"ঘরে ঢোকার প্রথম দিনেই আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল, রক্তচাপ বেড়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, আমাকে যেন কবরের মধ্যে ফেলে রাখা হয়েছে। আমি চিৎকার করতে লাগলাম, কিন্তু জবাবে গালি শুনলাম। কিছুক্ষণ চিৎকার করার পর, একটি নরম কণ্ঠ আমার কানে আসে, বলে, 'হে নতুন বন্দি, যতই চিৎকার করো, কেউ তোমার দুঃখ শুনবে না। চুপ করে থাকো, আল্লাহর সাহায্য চাও।' এরপর আমি কিছুটা শান্ত হই।

"যখন পাকিস্তানি সৈন্যরা আমার সেলে এসে আলো জ্বালালো, তখন আমি বুঝতে পারলাম দেয়াল আর ছাদ কতটা কালো। খুব ভয় লাগছিল। আমি জীবনে এমন জায়গা দেখিনি। দেয়ালে পেরেক বসানো ছিল, যেখানে বন্দিদের হাত-পা বেঁধে রাখা হতো। এমনকি গলায় দড়ি বেঁধে পঞ্চম রিংয়ে বেঁধে রাখা হতো। নির্যাতনের সময় বন্দিদের রক্তে দেয়াল রঞ্জিত হয়ে যেত। পাকিস্তানি সৈন্যদের চোখ ছাড়া কিছুই দেখা যেত না। এরপর আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। পরে তারা আমাকে জাগায়, মাথায় কালো বস্তা পরিয়ে অন্য ঘরে নিয়ে যায়। সেখানে আমি কেবল আমেরিকান উচ্চারণে ইংরেজি কথা শুনি। একজন প্রশ্ন করত, আর একজন তার অনুবাদ করত এবং আমার উত্তরও অনুবাদ করত।

"এইভাবে এক মাস চলল। সপ্তাহে একবার আমেরিকানরা এবং দুই-তিনবার পাকিস্তানিরা আমাকে জেরা করত। তারপর পরিস্থিতি বদলাল। আমাকে তিনজন আফগান বন্দির সঙ্গে আরেকটি ছোট ঘরে রাখা হলো। সেখানে আলো ছিল, এবং আমরা দিনে দুবার টয়লেটে যেতে পারতাম।"

এই বন্দি এক বছর তিন মাস ঐ গোপন কারাগারে ছিলেন, সারা সময় পরিবার তাঁর কোনো খোঁজ পায়নি। তাঁরা জানতেই পারেননি তিনি কোথায় আছেন।

"যখন পাকিস্তানি গোয়েন্দা ও আমেরিকান জেরাকারীরা বুঝল আমি একজন সাধারণ আফগান, কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নই, এবং আমার কাছে আল-কায়েদা বা তালেবানের কোনো তথ্য নেই, তখন তারা আমাকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। গভীর রাতে তারা আমার হাত ও পা বেঁধে, মাথায় কালো বস্তা পরিয়ে

গাড়িতে তুলে নেয়। তিন ঘণ্টা গাড়ি চালানোর পর তারা আমাকে নামিয়ে চুপচাপ মাটিতে ফেলে দেয়, হাত-পা খুলে বস্তা খুলে দেয়। তখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছিল। পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাকে বলে: 'তুমি এখন মুক্ত, কিন্তু তোমাকে দুটি কাজ করতে হবে। প্রথমত, ১৫ মিনিট কোনোভাবেই নড়বে না, যতক্ষণ না আমরা দূরে চলে যাই। দ্বিতীয়ত, তুমি কখনো কারো কাছে তোমার অভিজ্ঞতার কথা বলবে না। বললে, এর চেয়ে ভয়াবহ পরিণতির শিকার হতে হবে। জেনে রেখো, তুমি আমাদের হাত থেকে কখনোই নিরাপদ থাকবে না।' ”

অনেকে আরও খারাপ অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছে। যারা পাকিস্তানি গোয়েন্দা নির্যাতনের পর আমেরিকান বা আফগান সরকারের হাতে হস্তান্তরিত হয়েছে, তারা নিজেকে মুক্ত মনে করত।

আমি অনেক বন্দিকে এই প্রশ্ন করেছি: “পাকিস্তানি জেল আর আফগান বা আমেরিকান জেলের মধ্যে পার্থক্য কী?” প্রতিবারই উত্তর এক ছিল: আফগান এবং আমেরিকান জেল পাকিস্তানি জেলের চেয়ে অনেক ভালো।

সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আকবর আঘা, ডক্টর ইয়াসার, মুফতি আবদুল হাকিমসহ শত শত বন্দি নির্যাতন ও মারধরের কারণে শারীরিকভাবে পঙ্গু হয়ে গেছেন। তাদের কেউ কেউ চিরতরে কর্মক্ষমতা হারিয়েছেন।

আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি যেন মানবাধিকার সংগঠনগুলো ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় পাকিস্তানি ভূখণ্ডে আমেরিকান ও পাকিস্তানিরা যে কারাগারগুলো আফগানদের জন্য তৈরি করেছে সেগুলো পরিদর্শন করে এবং বন্দিদের সহায়তা করে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এমনকি আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটিও (ICRC) অনুমতি পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে—যাতে তারা বন্দিদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করাতে পারে এবং এসব কারাগার পরিদর্শন করতে পারে।

অনেক মানবাধিকার সংস্থা আমেরিকা, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানকে মানবাধিকার রক্ষার জন্য আহ্বান জানালেও এখনো কিছুই পরিবর্তন হয়নি। কেবল আল্লাহ জানেন সামনে কী ঘটতে চলেছে।

যুক্তরাষ্ট্র কেন ব্যর্থ হচ্ছে

যদিও যুক্তরাষ্ট্র এবং তার ন্যাটো মিত্ররা এখনও সাফল্যের দাবি করে, প্রকৃতপক্ষে তারা তাদের দেশের জনগণের চোখে ধুলো ছুঁড়ছে এবং বলছে যে তারা আফগানিস্তানে অনেক কিছু অর্জন করেছে।

তারা কখনই “ব্যর্থতা” বা “পরাজয়” শব্দগুলো ব্যবহার করে না, যতই সমস্যার সম্মুখীন হোক না কেন। কিন্তু সত্য হলো, ওই অঞ্চলে আট বছর কাটানোর পর, অগণিত সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, রক্তপাত চলছে, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব শীর্ষে পৌঁছেছে এবং অর্থনীতির শিকড় শুকিয়ে যাচ্ছে। নিরাপত্তা সীমাবদ্ধ শুধু শহর ও নগরে। দুই পক্ষের মধ্যে ঘৃণা বাড়ছে এমন মাত্রায় যে এখন আমেরিকা ও ন্যাটো সৈন্যরাও নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারছে না — আফগান জনগণের নিরাপত্তার কথা তো দূরের কথা।

তারা নিজেরাই বন্দুক ও ট্যাঙ্ক তুলে নিচ্ছে নির্যাতিত জনগণের ওপর, নাকি যাকে তারা শত্রু বলে বলে থাকেন তার ওপর?

এই পুরো যুদ্ধের কাহিনী ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পর খুব শীঘ্রই নির্ধারিত হয়েছিল। আমেরিকার রক্ত তখনকার আগেই ফুটন্ত অবস্থায় ছিল; তারা শুধু একটা অজুহাত খুঁজছিল। ১১ সেপ্টেম্বরের পর আমেরিকাকে বুদ্ধিমত্তা ও যুক্তি ব্যবহার করা উচিত ছিল; তারা উচিত ছিল তদন্ত করা। তাদের অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া ছিল তাদের অহংকার।

যুদ্ধটা নিজেই ছিল তাদের সবচেয়ে বড় ভুল: ১১ সেপ্টেম্বরের পর আফগানিস্তানে আক্রমণ করা ছিল ভুল পদক্ষেপ। বন সম্মেলন, যা আমেরিকান ধারণা চাপিয়ে দিয়েছিল এবং কিছু আফগানকে আফগান জনগণের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল, ছিল তাদের দ্বিতীয় ভুল। তারা যাদের সঙ্গে জোট গঠন করেছিল, পরিচিত যুদ্ধবাজ ও যুদ্ধ অপরাধীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল এবং যাদের পুনরায় ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেছিল, যারা আগে দেশের ক্ষতি করেছে ও জনগণকে রক্তাক্ত করেছে — এসবই ছিল নীতিগত ব্যর্থতা। আফগানিস্তানকে এই ভুলের মূল্য দিতে হবে। তালেবান শিকার করার জন্য বিশেষ অভিযান চালানো বর্তমান সময়ের দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলের পরিস্থিতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত।

আফগানিস্তানে আরোপিত অনেক নিয়ম ও আইন তার সংস্কৃতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক, যা বিদেশি আগ্রাসী ও আফগান শাসকদের দ্বারা বারবার করা হয়েছে। ধর্মীয় মূল্যবোধের অবমাননা এবং বন্দীদের ওপর চাপ দেওয়ার জন্য ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহার, এ দুটো মিলিয়ে ধর্মীয় মাদ্রাসাগুলোর প্রতি ঘৃণা ও পক্ষপাতের নীতি তৈরি হয়েছে, যা গ্রামীণ জনসাধারণকে বিচ্ছিন্ন করেছে। প্রধান মুসলিম নেতাদের মাথায় পুরস্কার ঘোষণা, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ও লোয়া জিরগায় হস্তক্ষেপ, এসব সরাসরি নতুন সরকারের বৈধতা ছিনিয়ে নিয়েছে। এবং শেষ পর্যন্ত কারাগারগুলো, সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘন করার সিদ্ধান্ত, আফগানদের আইনের বাইরে রাখার ব্যবস্থা, আমেরিকা ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নীরবতা ও অংশীদারিত্ব আফগান জনগণের সম্মান ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে।

বিশ্বাস ছাড়া শান্তি আসবে না।

তবুও অনেকেই বিশ্বাস করে যে তারা রাজনৈতিক সমস্যার সামরিক সমাধান খুঁজে পেতে পারবে, যা ইতিহাসের সব পাঠ উপেক্ষা করা।

আফগানিস্তানে আক্রমণ চালানো এবং তার জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত একটি ভুল ছিল, কারণ এতে আমেরিকা এবং আফগানিস্তান দু' পক্ষই কুঠুরির ফাঁদে পড়ে গেছে। আলোচনা ও সমঝোতার জন্য দরজা পুরোপুরি খোলা ছিল; এমন একটি পথ ছিল যা অনেক প্রাণ বাঁচাতে পারত। কিন্তু আমেরিকা নিশ্চিত ছিল যে তারা সহজেই যুদ্ধ জিতবে। আফগান পুতুলরা তাদের আশ্বাস দিয়েছিল যে আফগানরা আমেরিকানদের স্বাগত জানাবে এবং মানুষ তালেবানের কিছু আইনের প্রতি অসন্তুষ্ট। নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের নেতারাও সবুজ সংকেত দিয়েছিল। মূলত, জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা এবং আমাদের সরকারের প্রতি স্বীকৃতির অভাব আমাদের অর্থনীতিকে ধ্বংস করেছে এবং আমাদের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সময় কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু আমেরিকা প্রতিশোধমূলক ও অতি তাড়াহুড়ো করে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, নিরপরাধ আফগান ভূখণ্ডে আক্রমণ চালিয়েছে। এটা ছিল একটি ভুল। তাদের শান্তি ও আলোচনার পথ অনুসন্ধান করা উচিত ছিল।

বন সম্মেলন, যার মাধ্যমে আমেরিকা নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে আফগানিস্তানের এক ছোট দলকে একত্রিত করেছিল এবং যেটাকে অনেক সময় "একটা যুগান্তকারী মুহূর্ত" হিসেবে ধরা হয়, আসলে এটি আফগানিস্তানের স্বাধীনতার চেয়ে বড় এক লঙ্ঘন ছিল, এমনকি আমেরিকার সামরিক আগ্রাসনের চেয়ে বেশি। মূলত বন সম্মেলনের দুটি বড় সমস্যা ছিল; আমেরিকা নিজের অবস্থান মজবুত করতে নর্দান অ্যালায়েন্সকে ক্ষমতা দিয়েছে, এবং পশতুনদের দমন করেছে ও তাদের "তালেবান" বলে ডাকেছে। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপেক্ষিত হয়েছে–বনে আসলে আফগানদের প্রকৃত প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিল না, বা অন্তত তাদের সুযোগ দেওয়া হয়নি আসল আফগান ইচ্ছার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে। সেই সিদ্ধান্তগুলো কোনোভাবেই বৈধ ছিল না।

আমেরিকার আগ্রাসন এবং বন সম্মেলনের ক্ষতিকর সিদ্ধান্তের কারণে কিছু লোক–যাদের নির্মম তরবারি আফগান জনগণের ওপর বারবার ব্যবহার হয়ে কুঁচকে গেছে–ক্ষমতায় ফিরে এসেছে। কমিউনিস্ট শাসকদের অপরাধীরা এবং স্বার্থপর লুটেরা যারা নিজেদের "মুজাহিদীন" বলে ডাকে, তারা অতীতের ধ্বংসযজ্ঞ এবং দূর্যোগের জন্য দায়ী। তারা আবার ক্ষমতা নিতে চায় মানুষের জীবন দিয়ে ব্যবসা করতে এবং তাদের আতঙ্ক ও লুটতরাজ ফিরিয়ে আনতে। তারা এমনকি সোভিয়েতের অপরাধগুলোকেও ছাপিয়ে গেছে। তারা আমেরিকাকে এক কুঠুরির ফাঁদে ফেলেছে এবং বহু সমস্যার জন্ম দিয়েছে। এই গোষ্ঠীগুলো আসল মুজাহিদ্দীন এবং তালেবানের শত্রু।

আমেরিকা আফগানিস্তানে মানুষদের নৈতিক বিনিময়ে বেশ সফল হয়েছে। তারা নর্দান অ্যালায়েন্সকে, বিশেষ করে পাঞ্জশির থেকে শুরু করে, টাকা দেওয়া শুরু করেছিল যাতে তারা তালেবানের বিরুদ্ধে নিজের স্থল বাহিনী ব্যবহার করে। তালেবান পতনের সময় আমেরিকার সেনারা নামার পর তারা ঘুষ দেওয়ার প্রক্রিয়া দ্রুত করেছে এবং আজও চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমেরিকা তার টাকা অন্য কাজে ব্যবহার করেছে, আফগানদের মধ্যে পুতুল গুপ্তচর নিয়োগ করে নিজের অবস্থান মজবুত করার জন্য, এবং তালেবান ও আল-কায়দার নেতাদের মাথার দাম নির্ধারণ করেছিল। তারা আফগানদের দরিদ্রতাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে শোষণ করেছে। এই লোভী গুপ্তচরদের কথায়, নিরীহ মানুষ শহীদ হয়েছে, ঘৃণা বেড়েছে, আর জনগণ ও সরকারের মধ্যকার ফারাক বেড়েছে। আফগানিস্তানের স্বাধীনতা সমাধিস্থ হয়ে গেছে। এর পাশাপাশি আমেরিকার খ্যাতিতেও কালিমা পড়েছে।

আফগান সংস্কৃতি ও ইসলামী মূল্যবোধের উপর আক্রমণ দিয়ে আমেরিকানদের আসল চেহারা বিশ্ববাসীর সামনে প্রকাশ পেয়ে গেছে। "সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" নামে তাদের ইসলাম ও মুসলিমদের বিরোধিতা স্পষ্ট। উদাহরণ অনেক: প্রথম যখন আমেরিকানরা আফগানিস্তানে এসেছিল, তারা ভেবেছিল কোনো প্রতিরোধ পাবেনা। তারা তাদের পুতুলদের সাহায্যে সব ধর্মীয় মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়েছিল; মসজিদেও শুধু ছোট ছেলেদের প্রবেশ অনুমতি ছিল। মসজিদে শিক্ষার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই পরিকল্পনা প্রধানত কান্দাহার, যাবুল, উরুজগান ও অন্যান্য প্রদেশে বাস্তবায়িত হয়েছিল। যদিও এটি পুরোপুরি সফল হয়নি। দ্বিতীয়ত, স্কুলের পাঠ্যক্রম থেকে "জিহাদ" শব্দটি বাদ দেওয়া এবং অন্যান্য বিষয় থেকে বাদ দেওয়া খুবই উদ্বেগজনক ছিল। জিহাদ ইসলামের একটি মূল ধারণা এবং প্রতিটি মুসলিমের জন্য এটি বোঝা অপরিহার্য। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক আইনের নামে পুরুষ ও মহিলাদের সমঅধিকার দেওয়া, মিলে-মিশে পড়াশোনা করার পথ সুগম করা, এবং নারীদের হিজাব খুলতে দেওয়া ছিল আরেকটি পরিকল্পনা। তারা বিশ্বব্যাপী সকল ইসলামী সংগঠনের সাথে শত্রুতা শুরু করেছে, বিশেষ করে জিহাদী সংগঠনগুলোর। উদাহরণস্বরূপ, তারা ইসরায়েলের পক্ষে রয়েছে এবং নির্বাচিত ফিলিস্তিনি সরকারের ধ্বংসের পক্ষে সমর্থন দিয়েছে।

আফগান সংস্কৃতির উপর আমেরিকানদের আক্রমণ এখন স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে উঠেছে। দেশব্যাপী বিভিন্ন আড়ালে বা মুখোশে এই ঘটনা ঘটে। যেমন: যখন আমেরিকান আগ্রাসীরা তাদের পুতুল গুপ্তচরদের তথ্য অনুযায়ী কাউকে শত্রু মনে করে, তারা প্রথমে তার গ্রামের বাড়ির অবস্থান চিহ্নিত করে। তারপর গভীর রাতে হেলিকপ্টার নিয়ে এসে তাদের ঘর তল্লাশি করে। তারা ঘরের দরজায় না দাঁড়িয়ে গেট উড়িয়ে দেয়, লক্ষ্যণীয় ব্যক্তিকে তার স্ত্রী ও পরিবারের সামনে নগ্ন করে, মহিলাদের তল্লাশি করে এবং তালা খোলার বদলে বাক্স ভেঙে ফেলে। তারপর ঐ ব্যক্তিকে বন্য পশুর মতো আটকায় বা স্ত্রী ও সন্তানদের সামনে গুলি কিংবা ছুরি মেরে হত্যা করে, তার নিজের বাড়িতে। এই এক উদাহরণেই কতগুলো আইন লঙ্ঘিত হয়েছে: অনুমতি ছাড়াই ঘরে প্রবেশ, মহিলাদের তল্লাশি, পরিবারের সামনে নগ্ন করা। এদের করা সমস্ত অত্যাচার ও অপরাধের বই লেখা যায়।

আমেরিকারা অনেকের মাথার দাম নির্ধারণ করেছে, ব্ল্যাকলিস্টে রেখেছে, তাদের অধিকার কেড়ে নিয়েছে। তারা আত্মরক্ষার নামে লড়াই করতে মানুষকে উসকে দিয়েছে। এটা শান্তির জন্য ভালো নয়। তাহলে যখন আফগান প্রশাসন হেকমতিয়ার সাথে শান্তি আলোচনা করার চেষ্টা করছে বলে দাবি করে, তখন আমেরিকান প্রশাসন কেন তাকে খুঁজে বের করার জন্য কোটি কোটি টাকা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়?

আমেরিকান সরকার এখনও ইসলামী মাদ্রাসাগুলোর প্রতি গভীর বিদ্বেষ ধারণ করে। অনেক সময় মনে হয় তারা সন্ত্রাসী প্রশিক্ষণ শিবির এবং ধর্মীয় স্কুলের মধ্যে কোনো পার্থক্যই দেখেন না, যা মুসলিম বিশ্বের সাথে তাদের সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকর। মাদ্রাসাগুলোকে বোঝার অভাবে, আমেরিকা অনেকদিন ধরেই পাকিস্তান, সৌদি আরব ও অন্যান্য মুসলিম দেশকে তাদের পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের জন্য চাপ দিচ্ছে এবং জিহাদের বিষয় নিয়ে প্রচার করা উলামাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে। ইসলামী বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া গুজব অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে কয়েকজন উলামাকে হত্যাও করা হয়েছে।

লয়া জিরগা ছিল এক ধরনের প্রহসন: আমেরিকা প্রতিনিধিদের নিয়োগ-অপসারণ নিয়ে চাপ দিত; কর্মসূচি আগে থেকে ঠিক করা হতো; ইউএনএমএ (UNAMA) লোকজনকে চাপ দিত; ঘুষ ও পেছনের দরজা চুক্তি ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার; কিছু প্রতিনিধিকেও হুমকি দেওয়া হতো এবং তাদের গুয়ান্তানামোতে নেয়া হতো। লয়া জিরগা এবং এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো আফগানিস্তানের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং সমস্যার সমাধানের ঐতিহ্যবাহী উপায়। ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবহার করলে আফগানিস্তানের অনেক সমস্যা সমাধান করা সম্ভব, কিন্তু এগুলোকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করলে তা উল্টো ক্ষতি করবে, বিশেষ করে যখন এগুলোকে ভালোভাবে বোঝা হয় না।

আমেরিকা আফগানিস্তানের সাথে তাদের অতীত সম্পর্ক উপেক্ষা করে বন্ধু নির্বাচনে একটি অপরিবর্তনীয় ভুল করেছে। তাদের পছন্দের আফগান মিত্ররা প্রায়ই যুদ্ধবাজ ওয়ারলর্ড ছিল যারা যুদ্ধের পর আফগানিস্তানে ফিরে এসেছে, আমেরিকাকে ব্যবহার করে এবং নতুন আফগানিস্তানের ভিত্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আরেকটি কৌশলগত ভুল ছিল গ্রেট ব্রিটেনকে দক্ষিণ আফগানিস্তানে, বা সাধারণভাবে আফগানিস্তানে ফিরে আসার অনুমতি দেয়া। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আফগানিস্তানের সঙ্গে তিনটি যুদ্ধ করেছিল, প্রধানত দক্ষিণ আফগানিস্তানের পশতুন উপজাতিদের সাথে। তারা উপজাতি জমিগুলোকে ভাগ করে দিয়েছিল, যার ফলশ্রুতিতে ডুরান্ড লাইন প্রতিষ্ঠিত হয়। বাস্তবতা যাই হোক, ব্রিটিশ সেনারা বিশেষত হেলমান্দ, তাদের বর্তমান কাজের জন্য নয় বরং তাদের অতীত যুদ্ধের জন্য বিচারিত হবে। স্থানীয় মানুষ তা ভুলেনি, এবং অনেকেই বিশ্বাস করে ব্রিটিশরাও ভুলে নাই। অনেক গ্রাম যেখানে আজ তীব্র লড়াই ও হতাহতের ঘটনা ঘটছে, সেগুলোই প্রায় নব্বই বছর আগে একইরকম পরিস্থিতির শিকার হয়েছিল

আফগান সরকারের গঠনেও মৌলিক ত্রুটি রয়েছে যা আফগানিস্তান ও তার জনগণকে বোঝার অভাব প্রমাণ করে। শুরু থেকেই পশতুনরা যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব পায়নি, যদিও প্রেসিডেন্ট কারজাই পশতুন; এটি একটি অন্তর্নিহিত দুর্বলতা। তদুপরি, সরকারী ব্যবস্থাপনা ও তার মেকানিজম আফগানিস্তানের জন্য অত্যন্ত জটিল। বিভাগ ও মন্ত্রণালয়গুলোতে নিয়ন্ত্রণের অভাব রয়েছে, নীচের দফতর ও পদস্থরা তাদের ঊর্ধ্বতনদের আদেশ মানে কিনা তা নিশ্চিত করার উপায় কম। সরকারের কিছু অংশ বিদেশিদের নিয়ন্ত্রণে বলে মনে হয়, প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী বা মন্ত্রিসভা নয়। সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাদের প্রতি জনগণের বিশ্বাস নেই। সরকারের গঠন, সেনাবাহিনী, মন্ত্রিসভা ও অন্যান্য শাখার বিভাজন বিদেশিরা ঠিক করেছে।

যেকোনো সংঘর্ষে তথ্যই হলো চাবিকাঠি। আফগানিস্তানে বিদেশী সৈন্যদের গোয়েন্দা তথ্য দুর্বল, এবং তারা প্রায়ই তাদেরকে ভুল তথ্য দেয় এমন ব্যক্তিদের কথা শুনে ফেলে, যারা নিজেদের লক্ষ্য পূরণের জন্য বিদেশীদের ব্যবহার করে ও তাদের শত্রুদের লক্ষ্যবস্তু করে। আমেরিকা অনেক সময় ভুল স্বীকার করে, কিন্তু সাধারণ মানুষ কখনো শুনে না যে ভুল তথ্য দেয় এমন তথ্যদাতাকে শাস্তি দেয়া হয়েছে বা তার কর্মকান্ডের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। যতক্ষণ এমন অবস্থা থাকবে, আমরা ধরতে বাধ্য হব আমেরিকা তাদের সঙ্গে যোগসাজশ করছে, আর ভুল তথ্যের ওপর ভিত্তি করে চালানো সামরিক অভিযান আসলে পরিকল্পিত অন্য কোনো উদ্দেশ্যের জন্য এবং তা ভুল নয়।

যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা শুধুমাত্র বলপ্রয়োগের ওপর নির্ভরশীল, এমনকি তথাকথিত শান্তি আলোচনা পর্যন্ত হুমকির সঙ্গেই করা হয়। আশ্চর্যের বিষয়, আট বছর ধরে হাজার হাজার সৈন্য, যুদ্ধবিমান, সরঞ্জাম ও বিশাল জাতীয় সেনাবাহিনী নিয়ে, প্রায় দশ হাজার বিদ্রোহীর মুখোমুখি, দেশের দুই-তৃতীয়াংশই অনিরাপদ রেখে, বিদেশী সরকাররা এখনও বিশ্বাস করে যে জোরপূর্বক বল প্রয়োগ করলেই সংকট সমাধান হবে। তারা এখনও নতুন সৈন্য পাঠাচ্ছে। চলমান সংঘাত একটি রাজনৈতিক সংঘাত এবং অস্ত্র দিয়ে এর সমাধান সম্ভব নয়।

এ পর্যন্ত আমেরিকার নীতিনির্ধারকদের সবচেয়ে বড় ভুল হতে পারে তাদের শত্রুকে গভীরভাবে না বোঝা। যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে প্রবল শক্তি নিয়ে আসে। তারা একটি শক্তিশালী যুদ্ধ যন্ত্র নিয়ে এসেছে, হাতুড়ি দিয়ে মশা মারার চেষ্টা করার মত, আফগানিস্তানের অল্প যতটুকুই আছে তা ধ্বংস করছে এবং তাদের অভিযানে অগণিত প্রাণহানি ঘটেছে, তারা যত না শত্রু দমন করেছে, তার চেয়েও বেশি ধ্বংস ডেকে এনেছে। আজও তারা তাদের অজ্ঞতা ও নিজস্ব পক্ষপাতিত্বের সঙ্গেই লড়াই করছে।

নতুন ওবামা প্রশাসনও তাদের পূর্বসূরীদের মতোই অনেক ভুল করছে বলে মনে হচ্ছে। এমন একটি বিশেষ দূত পাঠানোর সিদ্ধান্ত, যার মাধ্যমে আফগান কর্মকর্তাদের ক্ষমতা কমে যাবে, এবং জেনারেল ম্যাকক্রিস্টালের নিয়োগ–যিনি আগে গোপন অপারেশনের দায়িত্বে ছিলেন–এগুলো দুটোই ভুল দিকের পদক্ষেপ। বাড়তে থাকা বেসামরিক হতাহতের সংখ্যা এবং হত্যাকাণ্ড ঢাকার চেষ্টা নিঃসন্দেহে আফগান জনগণের মধ্যে আরও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করবে। এখন আমেরিকা সোভিয়েত ইউনিয়নের পথ অনুসরণ করার ঝুঁকিতে আছে। যদি আমেরিকা তার নিজের আত্মঘোষিত সর্বশক্তিমানতার মোহ থেকে জাগ্রত না হয়, তাহলে আফগানিস্তানই তার ধ্বংসের কারণ হবে।

আমেরিকা আফগানিস্তান আক্রমণ করার পর থেকে তারা বহু মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে, এবং প্রায় প্রতিবারই তারা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা অপরিচিত ভূখণ্ডে, আফগানিস্তান সম্পর্কে খুব কম জানে। আজ আমার জন্মভূমি কান্দাহারের পরিস্থিতি এমন এক অনাকাঙ্খিত মিশ্রণ যা রুশ যুগের খারাপ সময় এবং পরবর্তী গৃহযুদ্ধের মতো। আবারও আফগানরা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, আর প্রেসিডেন্ট ওবামা, যার কাছে নতুন পথ নেওয়ার সুযোগ ছিল, তার সিদ্ধান্তে মনে হচ্ছ আবারও বিদেশী সৈন্যরা বিশাল সংখ্যায় আসবে এবং সেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে যার অংশ তারা।

কতদিন বিদেশীরা, যারা আফগানিস্তান ও তার সংস্কৃতিকে বুঝতে ব্যর্থ, আফগান জাতির জন্য সিদ্ধান্ত নিবে? কতদিন আফগান জনগণ অপেক্ষা করবে ও সহ্য করবে? শুধু আল্লাহই জানেন।

আবারও আমি শান্তির জন্য দোয়া করি। আবারও আমি আমার দেশ আফগানিস্তানের জন্য দোয়া করি।

মোল্লা আব্দুল সালাম জাইফ

কাবুল, জুন ২০০৯

---সমাপ্ত---